সাহিত্য অঙ্গন

(साहित्य आंगन // Sahitya Angan)

ISSN : 2394 4889 Vol : VII, Issue : XVI   30 June 2022

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

প্রযত্নে ঃ বি. এন. ঘোষ

শিমূল ডিহি, তেলিপাড়া, হীরাপুর,

ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual

Peer-reviewed Journal

ISSN : 2394 4889 Vol. VII, Issue : XVI, 30 June 2022

Chief Editor :

Dr. Jaygopal Mandal

© Publisher

Cover Design :

Shidhartha Basu

Type Setting :

Manik Sahu

Mob : 9830950380 / 9433157172

Printing and Binding :

Ekush Satak

Price : 200.00

Published By :

Dr. Jaygopal Mandal

Abhishek Tower, Block-A.

4th Floor, Flat-2, Kalakushma

P.S. Saraidhela, Dhanbad-828127

Phone : 09830633202 / 09570217070

E-mail : joygopalvbu@gmail.com,

sahityaangan@gmail.com

Website : www.sahityaangan.com

Advisory Board :

Prof. Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam
Prof. (Dr.) Suranjan Middey, Department of Bengali, R.U. Kolkata
Prof (Dr) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U.P.
Amar Mitra, (Katha Sahityik: Bankim & Ananda Awarded)
Nalini Bera (Katha Sahityik. Bankim & Ananda Awarded)
Professor (Dr.) Bikash Chandra Paul, Dept. of Bengali, University
Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata
Tapas Roy (Poet & Kathasahityik), Kasba, Kolkata

Members from the other Countries :

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, Bangladesh) Afroza Shoma (Dhaka, Bangladesh)
Md. Majid Mahmud, (Writer), Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka

Assistant Editor :

Dr. Samaresh Bhowmik, Associate Professor, Dept. of Bengali, Yogmaya Devi College, Kolkata
Dr. Mausumi Saha, Dept. of Bengali, Chakdaha College, Nadia
Dr. Kutub Uddin Molla, Dept. of Bengali, Singur Govt. College, W.B.

Working Editorial Board :

Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata
Dr. Soma Bhadra Roy, Associate Professor, West Bengal State University, West Bengal
Dr. Sampa Basu, Associate Professor, Dept. of Bengali, Mahishadal College, Midnapure
Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W.B.
Dr. Nabanita Basu, Assistant professor, Singur Govt. College, West Bengal
Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata-84
Dipankar Arosh, Dept. of Bengali, B. C. College, Asansol
Panchanan Naskar, Scholar, Binod Bihari Mahto Koyalanchal University, Dhanbad
Swapan Kumar Paramanik, SACT, Magrahat College, Bankura

সূচি

প্রবন্ধ

চলে গেলেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শেষ হলো একটা অধ্যায় — সৌমিত বসু ১১
দীর্ঘ কবিতা চর্চার একটি নাম পবিত্র মুখোপাধ্যায়—অঞ্জনা দেব রায় ১৩
প্রজ্ঞা দীপ্ত মহাকাল ও পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতা—সুরজিৎ প্রামানিক ১৮
মহাকবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়—ফাল্গুনী ঘোষ ২৭

কবিতা : প্রবীণ-স্বর

চলো বন্ধু চলো—কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় ৩৪
মৃত্যু তো রয়েছে কাছে—অনন্ত দাশ ৩৪
আজবদেশের কল্পকথা—গণেশ বসু ৩৫
প্রেমিক কোথায় আছে?—কৃষ্ণা বসু ৩৬
স্বাধীনতা—মধুশ্রী সেন সান্যাল ৩৬
জবা—দেবাশিস মজুমদার ৩৬
বসন্ত—উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬
অতিমারি—বীথি চট্টোপাধ্যায় ৩৭
ঘাতক—সুমন গুণ ৩৭
খুলে রেখো পানসি তোমার—অমল কর ৩৭
প্রতীতি—আনসার উল হক ৩৮
ভেঙে ফেলতে পারি—সুশীল মন্ডল ৩৮
প্রবেশ দ্বার—ভবেশ বসু ৩৯
মারীচ সংবাদ (২)—শঙ্কর ঘোষ ৪০
সংক্রমণ—তাপস মিত্র ৪০
পলায়নের মন্ত্রগুপ্তিটি পেতেই—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ৪১
সময়—দুর্গাদাস মিদ্যা ৪১
স্টেরয়েড—ফটিক চৌধুরী ৪২
প্রথম সন্ত্রাস—মৃণালকান্তি সাহা ৪২
নিঃশব্দ সেতারের সূর্য প্রদক্ষিণ—অরবিন্দ সরকার ৪৩

বিশ্বাস—ত্রিদিবেশ চৌধুরী ৪৩
পাঁচমিশেলে—দিলীপ দে ৪৩
ঘুম—সুবীর মজুমদার ৪৪
ত্রিশ সেকেন্ড—যশোধরা রায়চৌধুরী ৪৪
এক দুই—অভিরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪
চটি—কালিদাস ভদ্র ৪৫
ব্যক্তিগত—উদয়ন ভট্টাচার্য ৪৫
বিপদ আসে যায়—অমরেশ বিশ্বাস ৪৫
অভিসার—খগেশ্বর দাস ৪৬
শালগ্রাম শিলা—সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬

গল্প

হারানো নাকফুল—নলিনী বেরা ৪৭
আকন্দকেশরী—তাপস রায় ৫৪
সামনে আড়াল—দেবাঞ্জন চক্রবর্তী ৬৬
বিবর্তন—গৌতম দে ৭২
দুই মোড়লের কাহিনী—উৎপলেন্দু মণ্ডল ৭৭
মন্ত্রীর ফিতে কাটা—সৌমিত্র চৌধুরী ৮৫
হীরের আংটি—নিখিল মণ্ডল ৯০
একটি তথ্যচিত্রের খসড়া—চন্দন চক্রবর্তী ৯৬

প্রবন্ধ

গল্পকার শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় : একটি প্রাতিস্বিক বীক্ষণ—অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় ১০১
তিন বিন্দু জল থেকে এক বিন্দু জল, গল্পকার শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় —পলাশ দাস। ১১২
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে বিশ শতকের নগর কলকাতার চালচিত্র—টুম্পা নস্কর ১১৮
বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা : "আরেক মুঠো অথৈ আকাশ" —প্রীতম চক্রবর্তী ১২৭
শেলির যাপন ও কাব্যে স্ববিরোধ : মৃত্যুর দুশো বছরে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা — জয়দীপ চক্রবর্তী ১৩৯
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : স্রষ্টা-আলোচক যখন সম্পাদক —অনির্বাণ মান্না ১৪৭

কবিতা : নবীন-স্বর

চিত্রগুপ্তের ডায়েরি থেকে—সুস্মেলী দত্ত ১৫৮
প্রেমে প্রতিবাদে —মন্দাক্রান্তা সেন ১৫৮
ভূমিকাতো শেষ হল—বেবী সাউ ১৫৮
আমি—মঞ্জুশ্রী সরকার ১৫৯
সুর—খেয়া সরকার ১৫৯
বাইশ গজ— শর্বরী চৌধুরী ১৫৯
ঝরা বকুল—শিবানী বাগচী ১৫৯
বিভ্রম—পাপড়ি দাস সরকার ১৬০
তথাগত মন ও পুনর্বসু কথা—মনোরঞ্জন সরদার ১৬০
যখন আমাকে খুঁজি—সুচরিতা চক্রবর্তী ১৬০
গড়িয়াহাট মোড়, রোববারের সকাল—সায়ন্তনী ভট্টাচার্য ১৬১
মায়া—শিল্পী গঙ্গোপাধ্যায় ১৬১
আতঙ্ক—ইন্দ্রাণী বিশ্বাস মণ্ডল ১৬২
পাঞ্চজন্য —শম্পা হালদার ১৬২
দরিদ্র আলো—দিশা চট্টোপাধ্যায় ১৬২
অতীত —মৌসুমী সাহা ১৬৩
জানলা খুলে দাও—তনুজা চক্রবর্তী ১৬৩
আখ্যান—শুভ কুমার পাত্র ১৬৩
একদিন তুমিও—অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় ১৬৪
দু'টি কান্না—স্বপন শর্মা ১৬৪
রাধা—সুদীপ্ত মাজি ১৬৪
এই অস্থিরতা—রাজীব কর ১৬৫
মৃত্যু—জয়ন্ত মিস্ত্রী ১৬৫
অবমানবের পটভূমি—সুব্রত মিত্র ১৬৫
জেগে আছে ভোর—পার্থ সরকার ১৬৬
খাক—ধ্রুব দে ১৬৬
হেরে যাওয়া মানুষ—ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য ১৬৬
ক্ষত-বিক্ষত—অজিত ভড় ১৬৬
আবার ফুটেছে গোলাপ —নির্মল সামন্ত ১৬৬
অঙ্কুরিত ছোলা—নবকুমার পাড়ুই ১৬৭
হাঁটতে হাঁটতে—সৌরভ চট্টোপাধ্যায় ১৬৭
ঘুমের গভীরে—স্নেহাংশু বিকাশ দাস ১৬৮
আর্শীবাদ—বিমান কুমার দত্ত ১৬৮
গালাগাল—নীহার জয়ধর ১৬৮
কবিতার জন্য—নির্মল করণ ১৬৯
শুভম—তাপস কুমার কোলে ১৭০
নদীর কাছে—স্বপন নন্দী ১৭০
জন্মঋণ—সৌগত প্রধান ১৭০
চাইনি এমন—তপন কোলে ১৭০
তিনি চৈতন্য -১৭—সুনেন্দু পাত্র ১৭১
ব্রহ্মধ্বনি—তাজিমুর রহমান ১৭১
মেঘদূতের বদলে—অংশুমান কর ১৭২
তাই তোমার আনন্দ—শুভম চক্রবর্তী ১৭২
সম্পৃক্ত—হাসি বসু ১৭২

গল্প

উন্মুখ—অনিন্দিতা গোস্বামী ১৭৩
খাদির চাদর—রবীন বসু ১৭৯
সেম সাইড—জয়গোপাল মন্ডল ১৮২
একটা কঠিন অঙ্ক—অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ১৮৪
সুফিয়া বলেছিল—বিশ্বজিৎ সরদার ১৯৬
সুইচ অফ—দীপঙ্কর আরশ ১৯৮
মোহনা—সন্ধ্যা দাস ২০২

একটি পুস্তক সমালোচনা

'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' : সোনার জলে আঁকা জল-জঙ্গলের জীবন—উজ্জ্বল প্রামানিক ২০৪

প্রসঙ্গ : লোকদেখানো পার্বণ (শিশুর শবযাত্রা)

পাড়ায় পাড়ায় মেঘ ঘুরে বেড়ায়, বৃষ্টি নেই। কাছে — দূরে বাড়িগুলো ধোঁয়া ধোঁয়া। মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি দেয় সূর্য, যেই একটু বাড়ায় মুখ—অমনি লাঠির ঘা, আবার লুকিয়ে পড়ে, নাকি বৃষ্টিহীন মেঘে ঢেকে যায়? যাঁরা বেরিয়েছিল দশকের পর দশক—কৃষক আন্দোলন—খাদ্য আন্দোলন—নকশাল আন্দোলন, তাঁরা কোথাও কি দেহরক্ষী নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন? গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার কথা ছিল, সব কেমন যেন এক একটা দ্বীপের বাসিন্দা, শ্মশানচুল্লীর ধোঁয়া বিকোচ্ছে চড়াদামে, চোরেদের রমরমা, গ্রাম ঘিরে ফেলেছে অগণিত উল্লুক—তারা পাল্টে ফেলেছে নিজের মানে, সব জমিজমা জমা তাদের জিম্মায়। কেউ কিচ্ছুটি করতে পারছে না। তারাই এখন গরিষ্ঠ! এও কি ইতিহাস? তাদের একফোঁটাও ভয় নেই, ক্ষমতার মহিষ সহায়। এ দুর্বিপাকে শিক্ষা হয় না শিক্ষিতের। এ দেশ, এ মেয়ে— হয়তো নয় কারো। কবিরা তাবিজ বেঁধে ঘুরছে(যারা পুরস্কার জুটিয়েছে)। তা ব'লে ভাষাশহীদ প্রেমিকদের কথাও ভুলে গেছে! সেই সকাল থেকে রাত রাত থেকে সকাল মৃতদেহ বহন করে চলেছে বাংলা, রাজনৈতিক মঞ্চে ভালো কাটছে 'ধনধান্যে পুষ্প ভরা'—স্বদেশি গান, চোর-জোচ্চোর গায় বুক চিতিয়ে। গোধূলিরঙে বিবেক অস্তাচলে। গোমূর্খের রাজত্ব—মানুষ একা, অন্ধ বাউলও গায় না গান, তন্বীর খপ্পরে প্রৌঢ় নাকি প্রৌঢ়ের নিশানায় তন্বী! 'গোমূর্খের সঙ্গে এক পাখির বিবাহ'?—জানি না। জানি না ক্রমাগত মৃত্যুর সাথে ঘর করতে করতে উঁচুতলা হারিয়ে গেছে কোন অতলে! নাকি আমরা সবাই অপরাধকে শিরোপা করে "মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকি / যেন ওভাবে মরলেই কালোত্তীর্ণ শহীদ হওয়া যাবে।" সব কবিতায় খুঁজি হোমাগ্নি, কী যে হলো একাল শেষে—'মৈত্রেয় বুদ্ধের দেশে"? সব কবিতার পাঠক কে বা হতে পারে—যা পেয়েছি, কোথাও যেন কোনো উষ্মা নেই, কোথাও ফুটফাট দেখি না। শুধু চক্রাকারে ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ভুত-প্রেত—আত্মমগ্ন জীবনের ক্লেদ বয়ে যাওয়া। কেবল দু'একজন শিরদাঁড়া খুঁজে ফেরে, আর দু'একজন বৃদ্ধ কবি(কমিউনিস্ট) হাতের লাঠিটাকে উঁচিয়ে তেড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে; আর কীইবা করতে পারেন? চারিদিকে কবরের কারখানা—চিন্তার কবর —মননের সমাধি। মৃত শহরে চোরের উল্লাস, শোনে না ধর্মের কাহিনী। নিচুতলা বস্তিতে উঁচু উঁচু পেল্লাই বাড়ি, কেউ জানে না কীসের হাতযশ। সাংবাদিকদের চিলচিৎকার—বোঝা যাচ্ছে না কতটা সত্য কতটা মিথ্যে, মানুষ বোকা বাঁদর যেন—দড়ির

টানে নাচছে কেবল। এ নিপুণ অঙ্কের কারিগর কে কেউ জানে না? গোয়েন্দা পাঠে কি গলদ? মুখে তর্জনী রেখে বুদ্ধিবৃত্তিরা সেতু নির্মাণের গল্প লেখে। প্রতিবাদহীন মুখর মানুষ নিস্তরঙ্গ যুক্তি দিয়ে খোঁজে নতুন সংবাদ। হাঁসুয়ায় নিঃশব্দে একের পর এক হত্যা করে চলেছে তোতাকবি, যদি একটা নির্বিরোধ সংকলন করা যায় কোনো নান্দনিক মৃত্যু ছাড়াই। তারপর বিভীষণ পুরস্কার, যারা তাদের স্ত্রৈণ বলে, তারাও কি কখনো বসবে দুরন্ত ঘোড়ার পিঠে—সামনাসামনি দাঁড়াবে বাঘের (শাসক) সামনে?

একা একা কেঁদে ঘর ভাসাতে লজ্জা করছে আমারও। মানুষ একা : সেই সুভাষ-সুকান্ত বীরেন্দ্র — শক্তির কাল থেকে, নাকি চিরকাল—যুগযুগান্তর! ক্ষত্রিয় হওয়ার সাধ ঘুচে গেছে এ পৃথিবীতে "কেশর খুইয়ে অশ্বমেধের ঘোড়া ফিরে যায়, পরাজয়ের ফাটল মাটিতে ধরিয়ে।" চৌদিকে কীর্তনীয়া মৃদঙ্গ কত্তাল সহযোগে হরিনাম গায়, পথে পথে অচল পয়সা ছড়িয়ে শ্মশান পর্যন্ত—এটুকুই মনুষ্যত্ব বেঁচে। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি জেগে থাকি জনপদ জাগরণের, কবি ও বিপ্লবীর মিলন কবে হবে!

৩০ জুন, ২০২২ জয়গোপাল মণ্ডল

প্রবন্ধ

চলে গেলেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শেষ হলো একটা অধ্যায়

সৌমিত বসু

পবিত্রদাকে প্রথম কবে দেখেছিলাম আজ আর মনে পড়ে না। তবে কুড়ি বছরের এক তরুণকে কবিতার পথ ধরে সস্নেহে চৌকাঠ থেকে ঘরে তুলে এনেছিলেন, এক অভিভাবক সুলভ সম্পর্ক দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে রচনা করেছিলেন যে যোগসূত্র এতদিন পর প্রায় ৩০ বছর পেরিয়ে আসার পর আজ তা মলিন, কিন্তু আজও সেই শ্রদ্ধাবোধ সমান উজ্জ্বল।

শিষ্য বলতে যদি আমরা কিছু বুঝে থাকি তাহলে সেই বয়সেই আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম তাঁর কাছ থেকে এবং তা সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র পবিত্রদার চরিত্রের আশ্চর্য গুণ আমাদের কাছে আমাদের মত করে নেমে আসার মধ্য দিয়ে। আমার সামান্য জীবনে কত এলসিএম কত সভাপতিকে দেখলাম বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছুঁড়ে ফেলে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে, কত রাজনৈতিক সহযোদ্ধাকে দেখেছি মন্ত্রী হয়ে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াতে। অথচ রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন মানুষকে গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একই ভাষায় কথা বলতে দেখি, একই অশালীন হাসিঠাট্টার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে কখনো হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় না।

পবিত্রদা মানে পবিত্রদা। সমস্ত প্রচলিত ধ্যান ধারণার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অশ্রুসজল আদ্যন্ত কবি, যে বাইশবার পড়ে গিয়েও তেইশ বার উঠে দাঁড়িয়েছে। পবিত্রদা যদি আমায় সস্নেহে গ্রহণ না করতেন, যদি বীজমন্ত্রের মতো কবিতা কথনের ভেতর আমার দশটি বছর বয়ে না নিয়ে যেতেন, তাহলে মাথা উঁচু করে কবিতা লেখার প্রবণতা আমরা কবেই হারিয়ে ফেলতাম। প্রথম জীবনে যে অহংবোধ ও মর্য্যাদাবোধ পবিত্রদা আমাদের আটের দশকের কয়েকজন বন্ধুর ভেতর চারিত করেছিলেন তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা আজও কবিতাকে নিয়ে মরণবাঁচন সংগ্রামে বেঁচে আছি, বেঁচে আছি কোন কিছুকে পরোয়া না করেই।

সে সময় প্রতিদিন সকাল পাঁচটায় আমাকে ঘুম থেকে তুলে হাঁটতে বেরোতেন। আমাদের কালী লেনের গলি থেকে শুরু করে লেকের রাস্তা দিয়ে ঘুরে সে হাঁটা শেষ হতো প্রতাপাদিত্য রোডে। পথে একবার জিলিপি খাওয়া আর অজস্র কবিতা কথন। নিজস্ব কাব্যভাষা তৈরি করতে চেষ্টা, কবিতায় ধ্রুবপদ রচনা করা, তাড়াহুড়ো নয় এ খেলা জীবনভর ইত্যাদি বিভিন্ন চেতনা যা আমি চিরটাকাল বুকে বয়ে বেড়িয়েছি তা পবিত্রদার কাছ থেকে শেখা। পবিত্রদার প্রভাবে জীবনের অসংখ্য দিন আমাদের কেটেছে যেখানে সারাদিন কবিতা ছাড়া কোনও কথা আমরা উচ্চারণ করিনি। গ্রাম থেকে শহরে পড়তে আসা আমি ও আমার ভাই (সৌমেন বসু)-এর কাছে পবিত্রদাই ছিলেন অভিভাবক। পবিত্রদাই আমাকে হাত ধরে কবিতা পড়াতে নিয়ে গিয়েছেন আকাশবাণীতে, প্রতিক্ষণে, অমিতাভ দাশগুপ্তের পরিচয় অফিসে। আমাকে

নিয়ে অন্তত কুড়িটি গদ্য লিখেছেন, কানের কাছে নিরন্তর সাহস যুগিয়ে বলে এসেছেন "তোমার হচ্ছে"। ভরসা করে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন 'কবিপত্র' এর সম্পাদনার ভার। এ প্রশ্রয় যাটের অন্য কবিদের কাছ থেকে পাওয়া আমাদের কাছে ছিলো অপ্রত্যাশিত। এক মঞ্জুষদা ছাড়া।

জীবনানন্দ পরবর্তী কবিদের মধ্যে সবচেয়ে সংবেদনশীল এবং দরদী কবি নিঃসন্দেহে পবিত্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর কবিতায় যেমন সময়ের চাকায় চূর্ণ মানবজাতির অসহায় আর্তস্বর শুনতে পাই আবার অন্যদিকে পাই অনন্ত আশার আশ্বাস। শবযাত্রা, ইবলিশের আত্মদর্শন কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়কে একজন প্রকৃত কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিলেও ব্যক্তিগতভাবে আমি তার সনেটের অত্যন্ত ভক্ত। 'অসীমার প্রতি সনেটগুচ্ছ' একটা সময় আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো। কবিতার অজস্র খুঁটিনাটি ব্যাকরণ আমি ও আমার বন্ধুরা তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি। মেধা ও মননকে কিভাবে ঋদ্ধ করতে হয় সেই পাঠ তাঁর কাছ থেকেই নেওয়া। দীর্ঘজীবন পেরোতে পেরোতে জেনেছি কিছু কিছু ঋণ যা চেষ্টা করেও শোধ করা সম্ভব নয়। তেমনি পবিত্রদার মতো কিছু মানুষ যার কাছে আমার আমৃত্যু ঋণ থাকার মধ্যে এক অলৌকিক আনন্দ রয়েছে। আমি এই আনন্দের রেশটুকু নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় এর 'মহাকবিতা' এক অনন্য সৃষ্টি। মাইকেল মধুসূদন এর পর এই অন্যতম নতুন লিখনভঙ্গিমা বাংলা সাহিত্যে স্বকীয়তার দাবি রাখে। ইতিহাস, পুরাণ ও মিথের সার্থক ব্যবহার সমসময়ের ভেতর দিয়ে চালিত করার দক্ষতা অনির্বচনীয়। পবিত্রদার রচনা, আঙ্গিক এবং আবহনির্মাণ অত্যন্ত অনুভূতি গ্রাহ্য এবং পরস্পরের পরিপূরক। অস্তিত্বহীনতার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি কখনো ছায়া নির্মাণ করেননি বরং দর্শনের বিমুর্ততাকে তিনি কাব্যে মূর্ত করে তুলেছেন। দর্শনের জ্ঞানগর্ভতা তাঁর কাব্যে কখনোই প্রধান হয়ে ওঠে নি।

পরিণত বয়সে তাই আগুন সন্ন্যাসী এই মানুষটি প্রসন্ন কৌতুকে গ্রহণ করতে পারেন জীবনের সকল সফলতা ও স্খলন। তিনি বলেন,

'কবির বার্ধক্য নেই, জীর্ণ তাকে করে না সময়,
বয়স ক্রমশ প্রাজ্ঞ ক'রে তোলে, স্বচ্ছ ও নির্ভার
হতে থাকে দৃষ্টি ও শরীর তার, অর্থহীন জয় পরাজয়
বুঝে নিয়ে, ভারমুক্ত জ্বলন্ত আত্মার
আলোয় সে পথ ক'রে নেয়, যেতে হবে বহুদূর।'

আজ তিনি চলে যাওয়ার পর বুঝতে পারি কত মানুষ প্রতীক্ষা করেছিল তাঁর কবিতায় তাকে তো পৌঁছতেই হবে মগ্ন পথিকের সেই অভিযাত্রায়। আমাদের মতো রেখে যাওয়া অসংখ্য গুণমুগ্ধরা সেই অভিযাত্রার দিকে সানন্দে চেয়ে থাকবো বাকিজীবন।

আজও যখন শনিবার রাতে কফি হাউজ থেকে সেন্ট্রাল স্টেশন এর পথে কিংবা রোববার সকালে সাদার্ন অ্যাভেনিউতে অন্য বন্ধুদের সাথে থাকি তখন নিরন্তর মাথার মধ্যে বেজে ওঠে তাঁর গভীরতর সমস্ত কবিতাকথা যা নিরন্তর নিজের বোধবিন্দুকে আলোড়িত করে এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে লেখার টেবিলের সামনে এনে দাঁড় করায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই এমন একজন মানুষকে আমার জীবনের সাথে জুড়ে দেবার জন্য।

দীর্ঘ কবিতা চর্চার একটি নাম পবিত্র মুখোপাধ্যায়।

অঞ্জনা দেব রায়

আমি স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট বর্ণহীন ব্যাথিত গোলাপ
অশান্ত অতৃপ্ত এক দেবশিশু পরম সুন্দর
কোথায় এলাম

অর্থাৎ এই জগৎকে সুন্দরের এবং জীবনের পরিপন্থী হিসেবে ঘোষণা করে। এই পৃথিবীকে অমল আত্মার পতন স্থান বলে ধরে নিয়ে এবং বাইরে জীবনের উপযোগী সুন্দরকে অন্বেষণ করাই পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের অনুসন্ধানের শর্ত। এই শর্তাধীন কবি যে মৌলিক শিল্পীর জগৎকে তুলে ধরেন তা আমরা পাই অসামান্য উপহার হিসেবে। দীর্ঘ কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখে যে ঝংকার, যে আবেগের তীব্রতা শবযাত্রা কাব্যগ্রন্থটিতে আমরা তা পাই। এর ঝংকারই সার্থক কাব্য হিসেবে বেঁচে থাকার শর্ত। পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের শবযাত্রা গ্রন্থটিতে একটি ব্যক্তিগত এলেজির পরিশেষ দারুন সার্থকতায় আভাসিত হয়েছে। এই দীর্ঘ কাব্যগ্রন্থটি দুটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম 'শবযাত্রা' খন্ডের পাঁচটি স্বর্গ যথাক্রমে পতন, আর্তনাদ, শবযাত্রা, সহমরণ ও প্রার্থনা এবং দ্বিতীয় 'ভাসান' খণ্ডের পাঁচটি সর্গ যথাক্রমে ভাসান, মৃত্যুরূপ দর্শন, জীবন, ঝড় ও সম্মিলন।

দ্বিতীয় খণ্ডের আগে কবি বলেছেন 'শবযাত্রায় যে অন্তহীন অন্বেষনের সূত্রপাত ভাসানে তার পরিসমাপ্তি। শবযাত্রার নারকী প্রেমিক স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু দীর্ঘ পরিক্রমা অন্তে উপনীত হল চিরসুন্দরের দেশে। শিয়রে সদাজাগ্রত বেহুলা মিলিয়ে গেল অখণ্ড প্রকৃতিতে, লখিন্দরের হৃদয় বেদনায় আলোকিত হল'। উক্তিটি বুঝিয়ে দেয় কোন তাৎপর্যে প্রথম খন্ডে 'বলো সুন্দর আছে কোন উপকূলে'। এবং দ্বিতীয় খন্ডে 'সুন্দর! তোমার স্পর্শে হবো না কি পুনরুজ্জীবিত?'—জিজ্ঞাসা দুটি উপসর্গপত্রে সংস্থাপিত হয়েছে। পবিত্র মুখোপাধ্যায় জীবন ও জগৎকে যে প্রতিজ্ঞা থেকে দেখেছেন সেই প্রতিজ্ঞা রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের মৌল প্রতিজ্ঞা।

কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। কিন্তু খুব ছোটবেলায় মায়ের মৃত্যু হওয়ায় মাসীর সাথে ১৯৪৮ সালে কলকাতায় চলে আসেন। নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা করে স্নাতক হন। কিছুদিন চেতলা বয়েজ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বিদ্যানগর কলেজে অধ্যাপনা করেন। ভবানীপুর সাউথ সাবারবান স্কুলে পড়ার সময় থেকেই কবিতা লেখা শুরু। ১৯৫৭ সালে সাহিত্য পিপাসু কবিবন্ধুদের সহায়তায় তিনি প্রকাশ করেন 'কবিপত্র' নামে কবিতা বিষয়ক পত্রিকা। তাঁর প্রথম কবিতার বই "দর্পণে অনেক মুখ" বহুবার পুরস্কৃত হয়েছে। ২০০৯সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার পান। তাঁর রচিত 'শবযাত্রা' (১৯৬১), 'হেমন্তের সনেট' (১৯৬১), 'আগুনের বাসিন্দা' (১৯৬৭),

'ইবলিশের আত্মদর্শন' (১৯৬৯), 'অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত' (১৯৭০), 'বিযুক্তির স্বেদরাজ' (১৯৭২), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭৬), 'দ্রোহহীন আমার দিনগুলি' (১৯৮২), 'অলকের উপাখ্যান'(১৯৮২), 'পশুপক্ষী সিরিজ'(১৯৮২), 'ভারবাহীদের গান' (১৯৮৩), 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি'(১৯৮৫), 'আছি প্রেমে বিপ্লবে বিষাদে'(১৯৮৭) ইত্যাদি দীর্ঘ কবিতাগুলি পাঠকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে।

হাঁড়িকাঠে মাথা পেতে খচ্চরের বাচ্চা শুয়ে আছি
তুই তো প্রভুর পায়ে মাথা ঠুকে হাঁপাচ্ছিস গর্ভ থেকে নেমে
আমাকে ইবলিস বলে সিজদা করিনি অবিশ্বাসী !

এই বাক্যবন্ধের শৈলী শুধু নয় বিষয়বস্তুও প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসে এক বিপুল অভিঘাত তোলে। এমন স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর নিয়ে ষাটের দশকের শুরুতেই তুমুল আলোড়ন ফেলেছিলেন কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ইবলিসের আত্মদর্শন-এর মূলকথাই হতাশা, নৈরাশ্যজনিত এক জীবন যন্ত্রণা। ইবলিসের আত্মদর্শন বাংলা কবিতার এক পালাবদল। এই আধুনিক মহাকাব্য তার বিষয়বস্তু গ্রহণ করে পুরাণ, বীরগাথা, লোকগাথা বা প্রসিদ্ধ ইতিহাস থেকে কিন্তু সেই প্রাচীন উপাদান আধুনিক কবির মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন হয়ে ওঠে। কবি কাহিনির মধ্যে আবিষ্কার করেন সমগ্র জাতির সুপ্ত চেতনাকে।

আদি মহাকাব্যের মধ্যে আদিম সারল্য ছিল কিন্তু আধুনিক মহাকাব্যে তার পরিবর্তে এল জটিলতা, বা বলা যায় চেতন, অবচেতন আর অর্ধচেতনের জটিল ঘূর্ণাবর্ত। সেই আবর্তের মধ্যে তাঁর সংবেদনশীল উচ্চারণ—

গন্ডারের মতো তীক্ষ্ণ খড়্গ দিয়ে ছিঁড়ে দেব সভ্যতার ভুঁড়ি
বণিকী সভ্যতা শলা ডলারের বেশ্যার চাতুরি।
আমার হৃদয় স্মৃতি স্বর্গ ফর্গ সম্ভাবনা যন্ত্রণার মুখে
পচামাংস ছুঁড়ে ওরা অপদার্থ খোজা করে দেবে ?
আমি কি কেঁচোর মতো ঠান্ডারক্ত মেরুদন্ডহীন
পাছায় প্রচন্ড লাথি ঝেড়ে দিতে পারি না অক্লেশে ?

এই ক্রোধ, ঘৃণা আসলে সময়ের ভাষা। এই কাব্যগ্রন্থে ইবলিস যখন নৈরাশ্যে, হতাশায়, ক্ষোভে ফেটে পড়েছে তখন একরকম তার উচ্চারণ আবার যখন অসহায়তা তাকে দুর্বল করছে কিংবা নিজের ভিতরে লুকিয়ে রাখা জগৎকে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে তখন তাঁরই কণ্ঠে একটি অন্যরকম ভাষা। অন্যরকম উচ্চারণ ঃ

প্রভুর মাহাত্য বোঝে মূর্খের কী সাধ্য আছে মার্জনা করুন
আপনার সাম্রাজ্যের চৌদ্দপুরুষের খাস প্রজা — সুখে আছি

ভেতরের ক্ষোভ, ঘৃণা প্রকাশ করতে কবি ইবলিসের মুখ দিয়ে তার নিজের কথাই

বলেছেন। আধুনিক মহাকাব্যের এটা একটা বড়ো লক্ষণ। আধুনিক মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকাংশই পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের আটটি সর্গে বিভক্ত 'ইবলিসের আত্মদর্শন 'এ-পাওয়া যায়।

বুকের ভিতরে কোনো স্বর্গীয় উদ্যান নেই বলে
নতুন কুর্দন করি ঈশ্বরের মুখ মনে করতেই পারি না
ঈশ্বরের মুখ ভাবলে চিন্তা বা অনুভবে অক্ষত যোনির
ছবি ভাসে। (প্রথম সর্গ)

এখানে বিষয় বৈচিত্র্যও যেন নতুনভাবে আমাদের পাওয়া। মাইকেল মধুসূদন তাঁর রচনায় যেমন রাম লক্ষ্মণকে অবজ্ঞা করেছেন, পবিত্র মুখোপাধ্যায় এখানে ঈশ্বরকে অনেক ক্ষেত্রে তেমনি অবজ্ঞা দেখিয়েছেন। এখানেও আধুনিক মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শব যাত্রায় যেখানে তিনি শোকগাথা লিখে চলেছেন সেই কবি 'ইবলিসের আত্মদর্শনে' সম্পূর্ণ প্রতিবাদী এক চরিত্র। এ চরিত্র প্রতীকী অর্থে যে কোনো যুগের। এভাবে পুরাকাল ও সমকালকে তিনি ধরেছেন নিপুণ দক্ষতায়। মেঘনাদবধ কাব্যে উনিশ শতকের যুগচিন্তার যেমন প্রতিফলন ঘটেছিল তেমন ইবলিসের আত্মদর্শনে সাম্প্রতিক যুগের চিন্তা চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। নায়ক ইবলিসের সংগ্রামের মধ্যে যেন কবি আবিষ্কার করতে চাইছেন এক চিরন্তন সত্যকে। এই দর্শনই এই সত্যই এই রচনার বিশালতা।

'দর্পণে অনেক মুখ' কাব্যগ্রন্থটিতে তাঁর বিক্ষত বাল্যের দিকে মুখ ফেরানো ছিল। 'শবযাত্রা' কাব্যগ্রন্থে' তিনি মৃত্যুর উপরে শিল্পের বিজয়-চিহ্নিত করেছিলেন। 'হেমন্তের সনেটে' কবি সময়ের আপাত হতাশার কেন্দ্রে জীবন প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। 'হেমন্তের সনেট' এবং 'আগুনের বাসিন্দা'র অংশীভূত 'অসীমার প্রতি সনেটে' তিনি আত্মসংযম , চিত্রকল্প রচনার দক্ষতা, শব্দকে নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত করে এবং অবলীলায় ছন্দ ব্যবহারের কুশলতা দেখিয়েছেন।

আমি তো পিশাচসিদ্ধ, শ্মশানের সতর্ক প্রহরী—
ঘৃণা বায়সের কণ্ঠ, চতুর শৃগাল বন্ধুবর
নিয়ত পরমসঙ্গী, নির্জনতা নিত্য সহচরী,
আমরা উন্মাদ বিংশশতকের অন্ধ সহচর।
এইমাত্র যে যুবক শুয়েছিল চন্দনচিতায়
ফুলে ফুলে ঢাকা তার অপরূপ অনিন্দিত দেহ-
তাকে ভেবে হাসি, ব্যঙ্গ ঠোঁটে তাই দীপ্ত চমকায়
আহা কী করুণ সন্ধি — মৃত্যুর অবাধ্য নয় কেহ।

এটি 'হেমন্তের সনেট' —এর অন্তর্গত। পবিত্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কাব্যসংগ্রহ' —এর প্রথম

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

খন্ডের ভূমিকায় বলেছেন 'হেমন্তের সনেট-এ ধ্রুপদি আঙ্গিকটি আমার স্বভাবের অনুকূল ছিল, আমি নিজের চরিত্রসংগত ধ্রুপদি শৈলীর দ্বারস্থ হয়েছিলাম পঞ্চাশের অতিরিক্ত ব্যক্তিসর্বস্ব কবিতার স্বেচ্ছাচার থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতেও হয়তো; তবে তা বাইরের তাড়না'।

'আগুনের বাসিন্দা' পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থটির উৎসর্গ অংশটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন, 'প্রতিটি কবিতার জন্মের আগে আমি মরে যাই, ভূমিষ্ঠ হলে নতুন করে বেঁচে উঠি। পৃথিবীর রক্তাক্ত বুকের আর্তনাদ শুনি—স্নায়ুতন্ত্র অসাড় হয়ে যায়, সেই নির্জন কান্না ধরে রাখি, অনাদি শূন্যতার সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করি, মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত খুনি আসামীর মতো নির্দিষ্ট মৃত্যুর অপেক্ষায় রত থাকাকালে যে অব্যক্ত অনুভব নাভিকুণ্ডল থেকে ব্রহ্মতালুতে উঠে আসে তাকে ধরে রাখি। অতলশায়ী অন্ধকার সমুদ্রের বুকে প্রেততাড়িত জাহাজের মতো বিপর্যস্ত বিভ্রান্ত আমার কবিতা শূন্যভেদী আর্তনাদ করে'। এই উৎসর্গ আবেশে কবির চেতনার প্রকাশ রয়েছে। কবির কাছে বাস্তব জগৎ বধ্যভূমি বলে মনে হয়েছে। তাঁর কাছে পৃথিবীর আর্তনাদ যেমন প্রতিরোধের প্রতিভা জাগিয়ে তোলে, তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্বের বিপুলতায় ব্যক্তিকে উপলব্ধি করার দর্শনগত মানস প্রস্থানে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বিপুলতায় ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিলীন করতে আগ্রহী। পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতা যেন সময়ের সমস্ত অপরাধের দায়ভাগী হয়ে শূন্যতাকে ভেদ করে জ্যোতির্ময় লোকযাত্রায় স্বপ্নাচ্ছন্ন ও সংগ্রামী হয়ে ওঠে। প্রকৃতির স্বতঃশ্চল নিয়মের বাইরের বিধ্বংসী ও অমানবিক মানুষের তৈরি লোভ হিংসার জতুগৃহে কবি নতুন করে জীবনকে চিনলেন তাঁর 'আগুনের বাসিন্দায়'।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় পেত্রার্কীয় রীতি (৮ + ৬) ও শেক্সপিয়রীয় রীতি(৪ + ৪ + ৪ + ২) দুই রীতিতেই প্রচুর সনেট রচনা করেছেন, যদিও পেত্রার্কীয় ও শেক্সপিয়রীয় সনেটের অন্ত্যমিল তিনি খুব একটা অনুসরণ করেননি। কুড়ি বছর বয়সে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দর্পণে অনেক মুখ' —এর প্রথম কবিতাই একটি সনেট, যার প্রথম লাইন 'দেয়ালে অজস্র মুখ, মা-র মুখ মনেই পড়ে না'। শেক্সপিয়রীয় রীতিতে রচিত।

'হেমন্তের সনেট' বা 'অসীমার প্রতি সনেটগুচ্ছ' যেমন সাবজেকটিভ, 'পশুপক্ষী সিরিজ' তেমনই আবার অবজেকটিভ, পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'বাইরের জগতের দিকে মুখ ফেরানো'। অনেক সময় তিনি আট-ছয় পঙক্তিকে সীমিত না করে রেখে ক্রমাগত চারমাত্রা বাড়িয়ে এক মহাপয়ার নির্মাণ করেছেন এবং এমনকি বিয়াল্লিশ মাত্রার চরণও নির্মাণ করেছেন। যেমন ঃ

যাবেই সর্বস্ব তার চুরি, আহাম্মক! ধর্ম অবতার রাজপথে হাওয়া
খেতে চলেছেন,— প্রাণপণে গাড়িজুড়ি। —এটি 'গাধা' কবিতার শেষ পঙক্তি।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় অপার আনন্দে বা গভীর দুঃখে বা সাহিত্য রসপানে গদ্যভাষায়

দীর্ঘ কবিতা চর্চার একটি নাম পবিত্র মুখোপাধ্যায়।

আপনার উপলব্ধির কথা স্বাধীনভাবে লিখে যান। তিনি বিষয়নিষ্ঠতা ও আত্মনিষ্ঠতা একত্রীকরণ করে প্রবন্ধের রূপ ও স্বরুপ নির্মাণ করেন। তাঁর দৃষ্টির শক্তি, মননের বিশ্লেষণ প্রবন্ধ সাহিত্যকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল-'বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন' (১৯৭৪), 'কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮১), 'সূর্যকরোজ্জ্বল কবি জীবনানন্দ' (১৯৯৯), 'সত্তার সাম্রাজ্য ও কবিতা' (২০০০), 'কবিতার স্বভুমি' (২০০৩), 'কবির দেশ কবিতার দেশ' (২০০৭), ও দ্রোহীপুরুষ' (২০০৯)।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় যা কিছু লিখেছেন শরীর ও মন নিংড়ে লিখেছেন। তিনি রক্ত দিয়ে গোলাপ ফোটাবার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন কবি গভীর আত্মার উন্মোচনের ভাষ্যকার। আর স্বাধীন দ্রোহী সত্তাই শিল্প সৃষ্টির অধিকারী। তাই তাঁর গদ্যের ভাষা তাঁর লেখনীতে হয়ে উঠেছে প্রাণস্পর্শী — ষাটের দশকের সূচনাপর্ব থেকেই পবিত্র মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখনীতে এক গভীর পরিবর্তনের আর্তি অনুভব করেছেন, বাংলা কবিতায় তাঁর এই উপলব্ধির পদচারণা নিঃশব্দ বেদনাবোধের অনুকল্প ছাড়িয়ে যেন এক স্বাবলম্বী ঘরানা এনে দিয়েছে। এই ঘরনাতেই ক্রমশ দীর্ঘকবিতা বা মহাকবিতার রচনায় পবিত্র মুখোপাধ্যায় আত্মস্থ থেকেছেন।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের মহাকবিতা তাঁর জীবনের এক উদ্ভাসিত এলিজি যেন রঙিন বর্ণালী দিতে পেরে প্রতীকে নিরিখে সদা ভাস্বর। জীবনের বিভিন্ন অনুসন্ধানই তাঁর মহাকবিতায় বারবার ফিরে এসেছে। আসলে ছোটো কবিতায় চরিত্র একটি মুহূর্ত দাবি করে, ছবি তৈরি করে, কিন্তু পবিত্র মুখোপাধ্যায় চেয়েছেন জীবনের বিভিন্ন অনুচিন্তা, জটিল, বিক্ষুব্ধ সময়। কুটিল অশান্তি সবই যেন এক চারিত্রিক আবহাওয়া দিয়ে তৈরি যা তিনি আখ্যানে ক্রমশ পরিণতি এনে এক মহাকাব্যে রূপান্তরিত করেছেন। আজ আমাদের মধ্যে পবিত্র মুখোপাধ্যায় নেই কিন্তু ষাটের দশকের কবিতায় তাঁর আখ্যানধর্মী মহাকবিতা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দ্যুতিতে উজ্জ্বলতা নিয়ে থাকবে—তাঁর মহাকবিতা হবে কবিতার এক অনন্য ঐশ্বর্য-যে ঐশ্বর্য বাংলা কবিতার পাঠকের কাছে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে সূর্যরশ্মির উজ্জল আলোর মতো।

প্রজ্ঞা দীপ্ত মহাকাল ও পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

সুরজিৎ প্রামাণিক

আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ষাটের দশকের অবস্থান তার স্বমহিমায় চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এই দশকওয়াড়ি বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে আমরা দেখি, প্রতিটি দশকই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এক অভিনব ছাপ রেখেছে। সেই প্রসঙ্গেই আমাদের পরিলক্ষিত হয় ষাটের দশকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় (১৯৪০ - ২০২১) তাঁর অবিস্মরণীয় দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য-সমালোচক উজ্জ্বল কুমার মজুমদার পবিত্র মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর একটি মূল্যায়নে বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন, ---

'...পবিত্র'র কবিতায় গভীর আত্মনিগ্রহের যে নরক যন্ত্রণা, ইঁদুররূপী মৃত্যুর অসংখ্য আনাগোনার যে অনিবার্যতা, নিরন্তর ঐশ্বরিক বেদনার কাছে যে আত্মসমর্পণ বারবার চোখে পড়ে, তা মহাকাব্যের অন্তিম পর্বের শেষ সূর্যাস্তরশ্মির বিরাট অবসান- বেদনাকেই যেন নিজস্ব জগতে ধরে রাখার চেষ্টা বলে মনে হয়।'

ষাটের অন্যতম কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ও কবিমানস প্রসঙ্গে প্রাজ্ঞ সমালোচকের এই মন্তব্য অভ্রান্ত ও যথাযথ এ কথা বলাই যায়। তাঁর কবিতায় বর্ণিত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যদি এক ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে তুলনীয় হয়, তবে সেই ঝড়ের কেন্দ্রটির স্বরূপ নির্ণয় করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন কোন সে সংকট বিন্দু থেকে উদ্ভূত হয়েছে এই প্রবল প্রচন্ড বিধ্বংসী ঝড়। আত্মা, বোধ, সময়, দেবদূত, প্রভু, মৃত্যু, ইত্যাদি শব্দগুলি তাঁর কবিতা পড়তে গেলে বারবার আমাদের আলোড়িত ও মোহিত করে। এর কারণ হিসাবে আমরা বলতে পারি আজীবন তাঁর কবিতার মূল বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে শুভ- অশুভের দ্বন্দ্ব। আমৃত্যু অশুভ শক্তিকে তিনি প্রকটভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে মানবতার স্বরকে আহ্বান করে গেছেন, আর মানবিক অনুভূতিকে সাবলীলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪০ সালের ১২ ই ডিসেম্বর আমতলী, বরিশাল, বাংলাদেশে। কর্মসূত্রে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ দঃ ২৪ পরগনার বিদ্যানগর কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কবি, সম্পাদনা করেছেন বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত 'কবিপত্র' পত্রিকাটি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'দর্পণে অনেক মুখ' (১৯৬০) সিগনেট প্রেস থেকে। এরপর যথাক্রমে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে --- 'শবযাত্রা'(১৯৬১, কবিপত্র), 'হেমন্তের সনেট'(১৯৬১, টিচার্স বুক স্টল), 'আগুনের বাসিন্দা'(১৯৬৭, কবিপত্র), 'ইবলিশের আত্মদর্শন'(১৯৬৯, কবিপত্র),'অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত' (১৯৭০, কবিপত্র), 'বিযুক্তির

স্বেদরক্ত'(১৯৭২, ভারবি), 'শবযাত্রা ও ভাসান'(১৯৭৩, ভারবি), ' ভারবাহীদের গান' (১৯৮৩, শতভিসা), 'আছি তোমাদের সঙ্গে আছি'(১৯৮৫, অর্কিড), 'আমি এখন'(১৯৯৪, অর্কিড), 'আরোগ্য ভূমির দিকে' (১৯৯৪, কবিতা ক্যাম্পাস), 'পরশুরাম পর্ব' (১৯৯৪, কবিতা প্রাক্ষিক), 'বিষ নয় উঠেছে অমৃত'(১৯৯৯, ইসক্রা), 'নির্বাচিত কবিতা' (১৯৯৯, প্যাপিরাস), 'সন্ধিক্ষণে আছি' (২০০১, বিন্দুবিসর্গ), 'দুই শতকের আমি' (২০০১, সৃষ্টি), 'শোনো স্বপ্নভুক শোনো' (২০০৫, প্যাপিরাস), 'আমি ভূতগ্রস্ত কবি' (২০০৭, পত্রলেখা), 'নির্বাচিত কবিতা ২' (২০০৮, প্যাপিরাস), 'আগুন সন্ন্যাসে আছি' (২০০৮, কবিপত্র), 'চেনা পথ অন্ধকার' (২০১০, ইসক্রা), 'মহাকবিতা সংগ্রহ' (২০১১, প্যাপিরাস) ইত্যাদি।

তাঁর কবিতা অনুশীলন করলেই, পাঠক বুঝতে পারেন, কবির কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে তাঁরই ভাষায় "বোধের নরক"। যেখানে বোধের আগুনে পুড়তে পুড়তে জীবনের অশুভ দিকগুলি পরিশুদ্ধ ও মানবতার যোগ্য হয়ে উঠতে চাইছে। মানবতার জন্য আর্তি ও বিদ্রোহ রয়েছে কবির যাবতীয় অস্থিরতার মূলে। তিনি নিজেই লিখেছেন— 'আমার স্বপ্নের জগৎ থেকে আমি নির্বাসিত'। এই স্বপ্নের জগত থেকে নির্বাসিত হওয়ার পাশাপাশি আবহমান কাল-স্রোতের সঙ্গে তাঁর জীবনের ধারা মিশে গেছে অবিরত। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই দেশ-কাল-সমাজ- এর প্রেক্ষিতে যখন আকাশ- বাতাস ধ্বনিত হতে থাকে তখন মানব মনের গভীরতম প্রদেশে সুতীব্র আবেগ ও উন্মাদনার সৃষ্টি হয়, দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত এক তরুণ কবির কণ্ঠে। এ প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেন,—

'আমি তখন দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত তরুণ। অভিভাবকহীন, চালচুলোহীন, পরভৃত্য। কালীঘাটের রাস্তার উপরে একটা জীর্ণ কক্ষে আমি থাকি। একটি ছাত্রের পিতা মাঝে মাঝে আসেন আমার কাছে। বয়সে দুজনেই অনেক দূরের। তাঁর হলো অকস্মাৎ মৃত্যু। আমি ব্যথিত হলাম। দুটি নাবালক ও তাঁর স্ত্রী জলে ভাসলো, আমার মন হাহাকার করে উঠলো।'

—(সত্তা সাম্রাজ্য ও কবিতা।)

ফলে জীবনের খুব নিকটতম স্থান থেকে প্রত্যক্ষজাত অভিজ্ঞতায় তিনি বাংলা কবিতার পথ অন্যদিকে ঘোরাবেন এটা স্বাভাবিক বিষয়। তাই বলা যায়, তিরিশ, চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশের দশকের কবিতায় নাগরিকতার যে চিত্র ব্যাপকভাবে বাংলা কবিতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেখান থেকে কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতার গতিমুখ ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন অন্যদিকে। অথচ কবির 'আমি' অর্থাৎ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি স্বপ্নের জগত থেকে কোনো এক বোধিহীনতার কালে নির্বাসিত। আর এই নির্বাসনের অবগাহন বড়ো ভয়ঙ্কর। সেই নির্বাসনের যন্ত্রণা সভ্যতায় অঙ্গীভূত প্রায় প্রতিটি প্রাণের মধ্যেই ধারিত। কারণ সময়ের উত্তাল প্রবাহে এখন এমন কোন বৃক্ষের দেখা মেলে না যে স্বর্গীয় পুষ্প সমাহারে অবনতমুখী। ঠিক যেভাবে কুরুক্ষেত্রের অতৃপ্ত

লক্ষ লক্ষ আত্মা সর্বত্র মাথার উপর দিয়ে কিংবা খুব নিকটে রক্তের ঘৃণার দ্বীপে নির্বাসিত। কবিও সেই মৃত্যুর ছায়াময় উপত্যকার মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেন অগণিত স্মৃতিস্তম্ভে প্রজ্ঞার বোধিকে ঢেকে। এভাবেই পারাপারহীন চলার গল্প বুকে নিয়ে প্রবাহমান স্রোতে গড়িয়ে পড়ে এক- একটি শতাব্দী। আর তাই কবির ব্যক্তিজীবন কবিকে নিস্পৃহ হতে শেখায় নিরাভরণ সব উচ্চারণের মধ্য দিয়ে, —

'সুখ দুঃখ ফেলে এসেছি পথের উপর
তারা রোদে জলে শীতে নিভে যায়
যাবার কিছু নেই হারাবার কিছু নেই জেনে
ফেরার কথা ভুলে যাই, ফিরে ফিরে দেখার কথা মনে থাকে না।'

---(সুখ-দুঃখ ফেলে এসেছি / সঙ্গ নিঃসঙ্গতার দিনলিপি)

সুখ-দুঃখ পথের উপর ফেলে এলেও, কবি কিন্তু নিস্তব্ধ হয়ে যান না। মানে যেতে পারেন না। কারণ তার চোখের মণিতে নিষ্পলক প্রজ্ঞার জ্বালাময় বিদ্যুৎ খেলা করে। কবিকে ঘিরে থাকে সমবেত আত্মজ্ঞান। তাই তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, ---

'সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বহমান ধ্বংসের প্রবাহ
নদ-নদী গিরি মালাধৃত মাটি বনরাজি নীলা
সমুদ্র- প্রান্তর- মেঘ- ঝড়- বৃষ্টি- রাত্রি দিবালোক
সবই ধূর্ত বিষাদের প্রতিমূর্তি, সবই ছায়ারূপী'—(শবযাত্রা।)

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে প্রবল ধ্বংসের আয়োজন। যুদ্ধ-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর আলোড়নে অস্তিত্ব-নিরস্তিত্বের গভীরতম উপলব্ধিটি কবি লীন করে দেন একটি বিন্দুতে। আধুনিক সভ্যতার নাটকীয় মোড়কে বিবেক বিপন্নতায় ঢাকা পড়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে সমাজ- সংসারে কেউ কাছে নেই। অন্ধকারকে একমাত্র সত্য পরিণাম জেনে তিনি অন্ধকার পান করে, অসীম শূন্যে পানপাত্র তুলে ধরেন। এই অন্ধকারই যেন আজকের যুগের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির অন্তর্দাহ। তবে কেবলই শিল্পচর্চায় মেতে কবি তাঁর সামাজিক কিংবা মানবিক দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে যেতে চাননি। নিজেই অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে প্রকাশ করেন, ---

'লোকটা মরছে
পার্কের নরম ঠান্ডা ঘাসের উপর
হাতলভাঙা মগ এনামেলের থালা;
আধখাওয়া বাসি রুটি; উড়ছে
মাছি, উড়ছে কাক, ঝরছে
শিরীষ ফুলের পাপড়ি, হাওয়ায়

শীতের আমেজ'—(লোকটা মরছে / আছি প্রেমে বিষাদে বিপ্লবে)

মানুষ তার জয়েও একা। পরাজয়েও একা। অনিশ্চয়তা তার নিত্যসঙ্গী। কোষে কোষে শিকড়ের মতো গজায় দুরারোগ্য অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই পারাপারহীন পথ চলার প্রবাহমান স্রোত। কবি দেখছেন লোকটা মরছে একটু একটু করে একা একা। আর আমরা দেখেও দেখতে চাইছি না। এটাই মানব জীবনের নিষ্ঠুরতম ট্রাজেডি। এই শূন্যতা, প্রশ্ন, বিষাদ, নিঃসঙ্গতা, আর নির্বোধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের হাসি- কান্না, আনন্দ- বেদনা আমাদের মনে রৌদ্রের উজ্জ্বলতা কিংবা বৃষ্টির ছাঁট এনে দেয়। কোনো অপ্রাকৃত দৃশ্য নয় প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক নিষ্ঠুর বিপর্যয় তার বর্ণনায় অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে,—

'পায়রার জলে কুয়াশার কানাৎ ছিঁড়ে টুকরো জ্যোৎস্না পড়ছিলো ছড়িয়ে
অস্তগামী সূর্যের অসহ্য সুন্দর শরীর থেকে ঠিকরে পড়ছিলো গোলাপি আভা
পাখিগুলো ফিরে এলো বাসায়, দেখলো ---
গাছটা পড়ে আছে মুখ থুবড়ে জলের উপর
বাস্তুহারা পাখিদের সেই কান্না, মৃত ছানাদের চারপাশে
ঘুরতে ঘুরতে উড়তে থাকে'—(দিকভ্রান্ত নাবিক আমি)

কলকাতার গভীর, গভীরতর অসুখে ছিন্নমূল কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের মনের পরতে পরতে সঞ্চারিত, জাগরিত হয়েছিল প্রাণ ধারণের সেই অপরিসীম গ্লানি। কিন্তু কখনও তিনি পলায়নপর মনোবৃত্তির ভাগীদার হননি। হননি বলেই, খুব সংগত কারণেই বাংলা কবিতার সমৃদ্ধি তাঁর কাব্য কীর্তির কাছে অংশত হলেও ঋণী। 'দর্পণে অনেক মুখ' কাব্যে তিনি ধারণ করেছেন শৈশবে মাকে হারানোর প্রবল যন্ত্রণা, ---

'কে তোকে যৌবন দেবে, মা তোর শৈশবে পলাতকা
ছেলেবেলাকার স্মৃতি মনেই পড়ে না, তাই তুমি নিরাকার স্মৃতি হলে কেমন অনায়াসে!'

প্রসঙ্গত আমাদের শঙ্খ ঘোষের 'বর্ম' কবিতার সেই দুর্লঙ্ঘ্য পংক্তির কথা মনে আসে, --- 'এত যদি বূহ্যচক্র তীর তীরন্দাজ, তবে কেন / শরীর দিয়েছো শুধু বর্মখানি ভুলে গেছ দিতে!' কেবলই প্রাণ ধারণের গ্লানি নিয়ে কবি যেন ঘুরে বেড়িয়েছেন এক দরজা থেকে অপর আরেক দরজায়, মাথার উপরে একটি ছাদ ও পেট ভরার জন্য দু'মুঠো ভাতের সন্ধানে। ইতি ও নেতির টানে গড়াতে গড়াতে সূর্য হেলে গেছে পশ্চিম দিগন্তে। স্বান্তনা নেই, নোঙর করে পড়ে আছে জেরুজালেমের আস্তাবলে। অথচ সেকাল- একালের মধ্যে কোনো সেতুও নেই নির্মিত। কেবলই মিথ আর মিথস্ক্রিয়া অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধ রচনা করে চলেছে। অতীতের নির্যাস নিয়েও তো বর্তমানের সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, যুক্ত করা যায় সমকালের

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

সমস্যার সাথে। এই পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রেই সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মতো পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতার 'আমি' সত্তা ব্যক্তিগত ক্যানভাসে আটকে থাকে না। সেই আমির বোধ ব্যক্তিগত ক্যানভাসের অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে হয়ে উঠেছে সভ্যতার প্রগাঢ় আমি। তাই কবি বলেন, ---

'অতীতের তাবৎ ঐতিহ্য যা মানুষের শ্রম, স্বেদ, বেদনার নির্মাণ, এইসব পাঠ আর প্রত্যক্ষভাবে জানার অভিজ্ঞতাও দেখা। এর মধ্য দিয়ে অর্জিত হতে থাকে অভিজ্ঞতা। আর মন্থিত বিশ্লেষিত অভিজ্ঞতা থেকে জন্মায় প্রজ্ঞা। যদি তা পাণ্ডিত্যের অভিমানী প্রকাশকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে সহমর্মিতায় রক্তোজ্জ্বল, অনুভূতির সুক্ষতর মিশ্রণ সমন্বিত করতে পারে, তবেই শিল্পীর দায় উপযুক্ত ভাবে পালিত হয়।'

তিনি আরও বলেন,—

'ঐতিহ্যের স্বীকরণ, ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার বিশেষ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করতে দেখি উত্তীর্ণ শিল্পীমাত্রকেই। তার জন্মের পূর্ববর্তী ইতিহাসময় অগণন পিতৃ পিতামহের পদচারণার সাফল্য, অসাফল্য, জ্ঞানে, নির্জ্ঞানে তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত। এরই নাম হয়তো ইতিহাসবোধ। ঐতিহ্য। অন্য অর্থে দেশকাল।'

এই ঐতিহ্যের স্বীকরণ, ব্যবহার ইত্যাদির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নিজেকে অবিরত জাগিয়ে রেখে অন্তর্গত অভিঘাতের ভেতর প্রবল রক্তক্ষরণের অপেক্ষা করেছেন কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়। তাই সময়ের উপর দিয়ে, মহাসময়ের ওপর দিয়ে হলুদ পাতার মতো ভেসে যায় তাঁর দীর্ঘশ্বাস-কাব্যভাষা। আত্মমগ্নতার একক অভিমুখী কবিতার বিরুদ্ধাচরণ করেন তিনি। তাই অতিরিক্ত রোমান্টিকতা, অতিরিক্ত সুরিয়ালিজম বা চিত্রকল্পের ব্যবহার তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে খানিকটা ষাটের দশকের অন্যতম সক্রিয় ও স্বতন্ত্র ভাবনার কবি শামশের আনোয়ারের কথাও আমাদের স্মরণে এসে যায়। কবি শামশের আনোয়ারও সুরিয়ালিজম বা চিত্রকল্পের স্নিগ্ধ আধিক্য থেকে নিজেকে বিরত রেখে অত্যন্ত ধারালো কুঠারের মতো বাস্তবিক অনুভূতিগুলোকে কবিতার একের পর এক পংক্তিমালায় সাজিয়ে উপস্থাপন করেছিলেন। তাই শামশের আনোয়ারের কবিতায় তাঁর ইতিহাসের পৃষ্ঠাটিকে তিনি অত্যন্ত মলিন বা ক্রুর রূপে প্রকাশ করেন। যে নারী তাঁকে পথে বসাতে পারে, ইতিহাসের পাতায় তারই ক্রুর হাসির ছাপ লেগে থাকে। কবি জানেন তাঁর 'ইতিহাসের কোন অর্থ নেই মূঢ়তা ও ভ্রান্তি ছাড়া / ... আমি জানি মানুষের কোন উত্তরণ ক্লিওর আঁচলে বাঁধা নেই'—(কবি শামসের আনোয়ার)। কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ও অতিরিক্ত রোমান্টিসিজম বা চিত্রকল্পের ব্যবহার প্রসঙ্গে নিজের অভিমত প্রকাশ করেন,

'অতিরিক্ত রোমান্টিকতা বা চিত্রকল্পকে নিয়ে অতিরিক্ত ভাবনা চিন্তা আমাদের অনেককেই তখন তৃপ্ত করতে পারছিল না, বরং ক্লান্ত করে তুলেছিল। আর ঠিক তখনই আমার মনে ঘটলো

একটা অনাস্বাদিত বিস্ফোরণ। আর তা থেকেই বেরিয়ে এলো অ্যান্টিরোমান্টিক একটা ভাষা, অব্যবহৃত চিত্রকল্প, বিদ্রুপাত্মক শব্দাবলী; এলো কখনো বক্তব্যের স্পষ্টতায়, কখনো তির্যকতা পেল প্রাধান্য।'

কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির নামকরণের ক্ষেত্রেও একইভাবে দ্রোহ ও বিষাদ, নিঃসঙ্গতা ও বিযুক্তির ছাপ পরিস্ফুট করেছেন। কাজেই দেশ, কাল ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর বহুল প্রতিফলন সেখানে স্পষ্ট। কবি নিজেই সেই দুঃসময়ের বর্ণনা করেন, ---

'... চারপাশের বৈরিতা, প্রতিকূলতা ও মানুষের অনশন, নির্যাতনের অংশী হতে হয়েছে আমাকে; দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ও আত্মপীড়ন এই ছিল আমার প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী।'

—(কবিতার কালপুরুষ / ডলি দাশগুপ্ত)

তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ 'ইবলিশের আত্মদর্শন' (১৯৬৯) কাব্যে সকল অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির আত্মপ্রকাশ ও আত্ম- অনুসন্ধান করেছেন তিনি। ছবি এঁকেছেন জৈব কামনাতুর ঘাত- প্রতিঘাতগ্রস্ত এক মানুষের। যার মনে হয় বেঁচে থাকাটা—"অন্নধ্বংস প্রজনন হা-হুতাশ ছাড়া" আর কিছু নয়। তাই "গোড়ালি কঠিনতর হতে হতে খুর হয়ে গেছে"। ফলে "ছাপমারা ভেড়া" হয়ে লাভ নেই কোনো। চতুর ধান্দাবাজেরা মানুষকে ভোলায়, স্বর্গের লোভ দেখায়। আর এখানেই খুব সংগত কারণেই বোধের ভেতর নরকের ছায়া ফুটে উঠতে থাকে। কবি যেতে চান "বোধের নরকে"। কারণ কবি জানেন "বোধেই অনন্ত দুঃখ, বোধ যেন বিষাক্ত ছুরির ফলা"-র মতো। তবুও নির্বোধের স্বর্গ অপেক্ষা বোধের নরক তো ঢের ভালো। আর সেই বোধ থেকেই উত্থিত হয়, চাওয়া না চাওয়া আজকের অস্থির মানুষের। কাজেই ইবলিশও কোন এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে যাওয়ার পরেই সেখান থেকে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আর্তনাদ চকিতে ফিরে আসে, ---

'স্বপ্নের শৃঙ্খল পরে উর্ধবাহু ছুঁতে চাই স্বপ্নের উদ্যান
স্বপ্নই ঢেলেছে রক্ত ইতিহাসে হামেশাই
ঈশ্বরের ভগ্ন জানু মানুষের নামে
হৃদয় চৈতন্যে মুক্তি ভেসে গেছে ইতিহাস তারই ফলশ্রুতি'

স্বপ্নের উদ্যান ছুঁতে চাইলে স্বপ্নের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তে হয়। ইতিহাস যে ফলশ্রুতি ধারণ করে থাকে, সেখানে হৃদয় চৈতন্যের মুক্তি রক্তের স্রোতে ভেসে যায় ক্রমাগত। জীবন-যাপনের এই অস্থির চোরাস্রোতের মুখে দাঁড়িয়েই কবি বলতে পারেন, ---

'নিদ্রায় নিশ্চিত সুখ জাগরণে অনন্ত বিষাদ
জাগরণে ক্ষয়ে যাই'

আসলে জড়- জাগতিক পৃথিবীর জরাজীর্ণ ব্যাধি কবিকে বিষণ্ণ করে। এমন হওয়াটাই

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

স্বাভাবিক। কারণ পৃথিবীর কোনো সৃষ্টিশীল মানুষ অসুস্থ সভ্যতার জঘন্য প্রলাপকে কোনো কালেই মেনে নিতে পারেন না। যদিও "অসুস্থ সভ্যতার" শব্দবন্ধটি এক্ষেত্রে প্রবল ব্যঞ্জনা দ্যোতক। দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক ভাঙন, মানবিক মূল্যবোধের বিপন্নতা, এবং সর্বোপরি মানুষের দৈনন্দিন জীবন- যাপনের সংকট কবিকে বিক্ষুব্ধ- আলোড়িত করেছে। তাই এই কদর্য পৃথিবীর কালিমালিপ্ত সভ্যতায় কবি মানবিক চেতনার সংকট উপলব্ধি করেন। কাজেই অগ্রজ কবি শঙ্খ ঘোষ যখন বলেন, --- 'পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল / আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।' ---("বাবরের প্রার্থনা", শঙ্খ ঘোষ)। অস্থির উন্মত্ত সভ্যতার প্রেক্ষিতে কোন কিছুতেই যেন শান্তি নেই মানুষের। প্রার্থনায় হাত জড়ো করে বিধাতার কাছে মুক্তির প্রত্যাশা জানালে, দু'হাত শূন্যতায় ভরে যায়। ঠিক যেভাবে জীবনানন্দ বলেন,—'সব কাজ তুচ্ছ হয়, পণ্ড মনে হয়, / সব চিন্তা - প্রার্থনা সকল সময় শূন্য মনে হয়, / শূন্য মনে হয়।' —('বোধ', জীবনানন্দ দাশ)। মানুষের চেতনায় মড়ক লেগেছে। বসন্তের প্রশাখায় কবির প্রাণময় সত্তাকে কুরে খায় আত্মার গোপন ক্ষয়। পাপের বীজাণু ভরে যাওয়া বাতাসে মানুষের মুক্তি হবে কীভাবে ! কবি পরিত্রাণ খোঁজেন, আর নিজের কাছেই নিজে অসহায় বোধ করেন অবিরত। সেখান থেকেই মহাকালের উদ্দেশ্যে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয় ভবিষ্যতের কি পরিত্রাণ নেই কোনো ! মানুষের বর্বর জয়ের উল্লাসে মৃত্যু এসে হানা দেয় তার নিজেরই ঘরে। প্রাসাদের তীক্ষ্ণ আলোয় পুড়ে যায় হৃদয়। অজান্তেই আমাদের শরীরের ভিতরে বাসা বাঁধে নির্বোধ পতঙ্গেরা। আমাদেরকে ছিন্ন - বিচ্ছিন্ন করে। তাই কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের চোখে পৃথিবীর সবুজ শ্যামলিমার পরিবর্তে ধরা পড়ে, অসহায় মুমূর্ষু মানুষের ক্ষুধার্ত রূপরেখা। মহাকাশে বা সৌরজগতে আলোর রোশনাই থাকলেও, কবির আকাশ ভরে ওঠে কুৎসিত অন্ধকারে। তৃষ্ণা নিবারণের জল থাকলেও, যে জল দূষিত হয়ে গেছে সুবিধাবাদী মানুষের বিষাক্ত লালসায়, সেই জলে কবির তৃষ্ণা মেটার পরিবর্তে গলা ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে, ---

'এত শ্যামলিমা তবুও আমার পৃথিবী কেন ক্ষুধার্ত সিনয় ?
এত আলো মহাকাশে আমার আকাশে কেন সূর্যোদয় নেই ?
এত প্রাণদায়ী জল আমার তৃষ্ণার তাপে কেন গলা ছিঁড়ে রক্ত ঝরে ?
এত হাওয়া পৃথিবীতে আমার পৃথিবী কেন হলো রুদ্ধ হিমঘর ?
আমার পৃথিবী রক্তে আগুনে বিষাদে কক্ষচ্যুত আর্তনাদ !'

---(কাব্যগ্রন্থ- ইবলিশের আত্মদর্শন)

কবির রুদ্ধ হিমঘরে ভরে ওঠা পৃথিবী আর অন্য কিছু নয়, তা আদতে মানুষের মানবিক আত্মার বাকরুদ্ধ পরিণতি আর মানবিক অনুভূতিলব্ধ চেতনার নিথর হয়ে যাওয়া। তাই কবি এ অবক্ষয় জর্জরিত সভ্যতার বুকে দাঁড়িয়ে প্রগাঢ় আর্তনাদ করেন, হিংসার রক্ত, ক্রোধের

আগুন, আর অবনমনের বিষাদে কক্ষচ্যুত পৃথিবীর অসুখে। কাজেই কবির কাব্যিক বোধের পাতায় অন্ধকার- বিষণ্ণতা, একাকীত্ব- অবিশ্বাস, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর প্রকাণ্ড অনুভূতিটি অনুরণিত হয়। পাশ্চাত্য সমালোচকের কথায় স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করলে যে ধ্বনি অনুরণিত হয় সেই ধ্বনিটির প্রতিধ্বনি থেকেই কবিতার জন্ম হতে থাকে। সুতরাং কবি নিজেকে ভাঙেন, নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলেন। জীবনের এই ভাঙা গড়ার মাঝখানে কবির চেতনা থেকে উত্থিত কবিতাটি সেতুবন্ধের কাজ করে। ফলে যে সময়ের মধ্য দিয়ে কবির কাব্যিক অবগাহন চলে, খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় কবির বোধের সীমাটিতে রূপ নিতে থাকে। তাই ষাট-সত্তরের সামাজিক ভাঙন, দুঃসময়- অসময়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতাতেও রূপায়িত হয়। তবে তা একটু অন্য ভাবে, ---

‘এরকম দুঃসময় আসে নাই মানবেতিহাসে
মানুষের ইতিহাস এতো রক্ত দেখেনি কখনো
এতো অন্ধকার এতো প্রেতের দৌরাত্ম্য মৃত - স্বপ্নের পাহাড়
এতো বিনাশের প্রস্তুতি দেশে দেশে
এরকম অন্ধকার আত্মার অতলে।’—(ইবলিশের আত্মদর্শন কাব্যগ্রন্থ)

কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় ‘ইবলিশের আত্মদর্শন’ কাব্যে পৃথিবীর আদিম মানবের সাথে ইবলিশের ব্যক্তিগত জীবন পরিমণ্ডলের ঈর্ষা ইত্যাদি দেখিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আদতেই তিনি দেখাতে চাইলেন মানুষের সেই ইতিহাস যে ইতিহাস তাজা রক্তের হাড় হিম করা স্রোতে জঘন্য কদর্যতা লিপ্ত। তাই কবি, মানুষের আত্মার গভীরে পুঞ্জিভূত অন্ধকারকে চিহ্নিত করেন যুদ্ধ আর প্রতিহিংসা- পরায়ণতায় মত্ত হওয়া পৃথিবীর কথা বলতে বলতে। যেভাবে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় আমরা পাই,— ‘পৃথিবীর উপকূলে লুব্ধতার লালা ঝরে, / বর্বর রাক্ষস হাঁকে এ পৃথিবীতে আমিই শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে বড় / উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ' ---(“রবীন্দ্রনাথের প্রতি”, বুদ্ধদেব বসু) কিন্তু এখানেই তো শেষ নয় লুব্ধতা বা হিংস্র উন্মাদনার মধ্য দিয়ে তো অগ্রগতি হতে পারে না সভ্যতার। কারণ কবি তো ব্রহ্মার সমান। তাই তিনি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন কবিতার আলোয়। কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ও একইভাবে আলোর সন্ধানে মগ্ন হতে পারেন। উপনিষদের কথায় যেমন আমরা পাই, --- ‘তমসো মা জ্যোতির্গময়’ ঠিক সেভাবেই কবিও জ্যোতির্ময় সত্তার অন্বেষণ করতে পারেন, তাঁর বোধিচিত্তের আলোয়---

‘খুঁজে ফিরছি হে আনন্দ
বুকের তলায় কোন অক্ষত সাম্রাজ্য আছে কিনা
তোমার সাম্রাজ্য ছিলো জনশ্রুতি ইতিহাস বলে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

তোমার সাম্রাজ্য আমি খুঁজে ফিরছি রক্তস্রোতে অন্দরমহলে’
—(কাব্যগ্রন্থ- ইবলিশের আত্মদর্শন)

“অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো”-র মতোই কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় মানবিকতার চূড়ান্ত অবক্ষয়ের কালে দাঁড়িয়েও আনন্দের অনুসন্ধিৎসু প্রবণতা জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন তাঁর কবিতায়। এভাবেই ইবলিশ তাঁর আত্মদর্শনের দিকে এগিয়ে গেছে বুকের মোহনা জুড়ে, বালিয়াড়ি ধূ-ধূ বালিয়াড়ির দিকে। যাঁর ফুসফুসে সঞ্চিত থাকে পর্বতপ্রমাণ আগুনের স্ফুলিঙ্গ। কবির এ হেন আত্মোপলব্ধির মহাযাত্রায় সমকাল তার সীমানা ছাড়িয়ে নিশ্চিতভাবেই মহাকালের দিকে যাত্রা চালায়। সেখানে তাঁর সমবেত আত্মজ্ঞান বাধ্যভূমির দম্ভে বা বাধায় আটকে থাকে না। কাজেই কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতিটি মহৎ কবিতার মধ্যেই তাঁর কাব্যচেতনার আঙ্গিক আমাদের বিস্মিত করে। জীবনের অনুভূতিতে যে স্পন্দন ওঠে, আর যুগ পরিবেশের অন্তর্দীপ্তিতে যে ধ্বনি উদ্ভাসিত হয়, তার উৎসের আবেগে বিমোহিত হতে হয় পাঠককে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এটা বলাই যায়।

তথ্যসূত্র :

১। নির্বাচিত কবিতা, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, প্যাপিরাস প্রকাশনী, কলকাতা।
২। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, সম্পাদনা- দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৩। শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, শঙ্খ ঘোষ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৪। শামশের আনোয়ারের শ্রেষ্ঠ কবিতা, শামশের আনোয়ার, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৫। আধুনিক কবিতার ইতিহাস, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৬। বাংলা কবিতার কালপঞ্জি, সন্দীপ দত্ত, রাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।
৭। আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, ড. অশোক কুমার মিশ্র, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা।
৮। বাংলা কবিতা অনেক আকাশ, তরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা।
৯। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দীপ্তি ত্রিপাঠী, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।
১০। আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা।

পত্রপত্রিকা :

১। বনানী, এপ্রিল- সেপ্টেম্বর ২০১১ সংখ্যা, সম্পাদক- অধীর কৃষ্ণ মন্ডল।
২। বোদলেয়ার, এপ্রিল ২০১২, সম্পাদক- দেবাশীষ দত্ত।
৩। সাহিত্য আকাশ, ৯ম বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা ১৪০৪, সম্পাদক- বিপুল আচার্য।
৪। কবিতা কাঞ্চন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০০, সম্পাদক- অশোক কুমার রায়।
৫। ইন্দ্রানী, পূজা ২০০২ বইমেলা ২০০৩ যুগ্ম সংখ্যা, সম্পাদক- নির্মল বসাক।

মহাকবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়

ফাল্গুনী ঘোষ

জুলাই ২০১৩ থেকে ৯ এপ্রিল ২০২১ এই আট বছর ধরে আমি পবিত্রদার ছায়াসঙ্গী। ওনার কবিতার আমি ভক্ত ও অনুরাগী এবং এটা সম্ভব হয়েছে ওনার কবিতার পড়ে। জুলাই মাসেই ২০১৩ তে আমি ওনার 'কবিতা-সংগ্রহ' প্রথম খণ্ড বইটি সংগ্রহ করি—পড়তে থাকি—এক অপার বিমুগ্ধতা, আমি ধীরে ধীরে কবি পবিত্রদার ফ্যান হয়ে পড়ি। ওই সময়েই একদিন বাংলা আকাদেমি ক্যাম্পাসে কোনো এক বুধবার সন্ধেবেলা পবিত্রদার সাথে আমার পরিচয় এবং পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি, সাথে সাথে বলি যে ষাট দশকে লিখতে আসা তথাকথিত বিরাট বিরাট কবিদের চেয়ে আপনার কবিতা অনেক মহৎ ও ঋদ্ধ। হয়তো উনি আমাকে সেদিন মনে মনে গ্রহণ করেছিলেন। তারপর ইতিহাস।

২০১৩-র শীতের এক সন্ধ্যায় ওনার ইতিহাস খণ্ডিত ২২বি প্রতাপাদিত্য রোডের ভাড়া বাড়িতে তিনতলায় প্রথমবার গিয়ে উপস্থিত হলাম। পুরোনো ভাঙা বাড়ি, একটু ছাদ, সাধারণ সাদামাঠা, দুটি ঘরে একটি কবির বইয়ে ঠাসা। বসার চেয়ার ও সোফা, ছোটো একটা খাট, একটি লেখার টেবিল, একটি ছোটো রঙিন টিভি। অনেকগুলি বইয়ের র‍্যাক, আলমারি। দেয়ালের গায়ে ঝুলছে অনেকগুলি সম্মান—তার মধ্যে রাজ্য সরকারের সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান ২০০৯ সালে পাওয়া রবীন্দ্রপুরস্কারও বর্তমান।

আমার সাথে কবিতার বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক কথা হল—উনি বললেন—"এই যে এই ঘরে আমি ১৯৬৯ সাল থেকে আছি। এখানে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সুনীলদা, শঙ্খদা, আলোকরঞ্জন সবাই এসেছেন।"

আমার মুগ্ধতা আরো বাড়তে লাগলো কৌতুহলী শিশুর মতো। সেদিন উনি আমাকে ব্যাগ ভর্তি করে প্রায় দশটির মতো বই দিয়েছিলেন— আমি উন্মাদনা ও আবেগে কম্পমান। তারপর কতোবার কতোবার আমরা দুজনে সময় কাটিয়েছি গত আটবছরে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। প্রতিদিনই প্রথা—একবার করে ফোনে খবর নিতেন আমার—বলতেন, "তোমার ভালো থাকাটা আমাদের বাংলা কবিতার জন্য খুব জরুরী।"

যাইহোক, আজ তিনি অন্যপাড়ে অনন্ত আত্মায় বিলীন। ১৯৪৮ সালে কবি পবিত্র বালক অবস্থায় (৮বছর) মাসীর হাত ধরে দেশভাগের পর কোলকাতায় চলে আসেন তৎকালীন পূর্ব বাংলার বরিশাল থেকে। তাঁর মা মারা গেছেন—পবিত্রদা তখন সাত বছরের বালক মাত্র। খড়কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে কোলকাতায় একটি অনাথ শিশু আশ্রমে, শিয়ালদহ স্টেশনে গবাদি পশুর মতো পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে মাসীর সাথে হাজির। অনেকবার উদ্বাস্তু ছিন্নমূল আরো অনেকের মতোই নিরুপায় হয়ে বাসার খোঁজে এখানে

ওখানে—কী অপরিমেয় এক যন্ত্রণা, দুর্বিষহ কষ্ট আর অসীম ধৈর্যকে সঙ্গী ও পাথেয় করে বালক পবিত্রের দিনাতিপাত ও রাত গুজরান।

সাউথ সুবারবার্ণ স্কুলে পড়ার সুযোগই পবিত্রকে কবি হতে প্রাথমিকভাবে সাহায্য করেছিলো। যে স্কুলে অনেক নামকরা ছাত্রেরা পড়াশুনা করেছিলেন—স্কুলটি ছিলো তখন ঐতিহ্যমণ্ডিত ও সংস্কৃতিচেতনা সমৃদ্ধ। কবি পবিত্রর জন্ম হচ্ছে ১২ ডিসেম্বর ১৯৪০ খ্রীঃ বরিশালের আমতলীতে—বাবা রোহিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ও মা যোগমায়া দেবী। প্রসঙ্গক্রমে পবিত্র-র বাবা ছিলেন পূজারী ব্রাহ্মণ এবং জমিদারের অফিসে কাজও করতেন— অভাব খুব একটা ছিলো না আবার খুব স্বাচ্ছন্দ্যও যে ছিলো তা নয়।

প্রাথমিকভাবে পবিত্র ছাত্র হিসেবে ভালোই ছিলো, বুদ্ধিমান ছিলো। বারো বৎসর বয়সে একটা ইংরেজি কবিতা লিখেছিলো যা স্কুল ম্যালাজিনে প্রকাশ পায়। ১৫-১৬ বছর বয়স থেকে তাঁর কবিতা লেখা শুরু হয়। স্কুল ম্যাগাজিনের দায়িত্ব তিনি সামলে ছিলেন একবার। অতঃপর ১৯৫৭ খ্রীঃ-র ২৫শে বৈশাখ প্রথম প্রকাশ করছেন 'কবিপত্র' পত্রিকা, যা বাংলা কবিতার লিটল ম্যাগাজিনের আন্দোলনের ইতিহাসে নেতৃত্ব দেওয়া তিনটি প্রথম-সারির পত্রিকার একটি—যা এখনও ৬৪ বছর ধরে প্রকাশ পাচ্ছে। 'কবিপত্র' শুধুমাত্র কবিতা পত্রিকা হিসাবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এতো বছর ধরে নিরন্তর হাজার হাজার লেখকের লেখা প্রকাশ করেছে। কতো কতো তরুণ কবিও লেখকের আশ্রয়স্থল হিসেবে বটবৃক্ষের মতো এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় দ্রোহের কবি, বিষাদের কবি, প্রতিবাদের কবি, সমাজভাবনার কবি ও সর্বোপরি একজন মানবতাবাদী প্রাণসত্তার কবি। প্রেম কবিতায় ধরা দিয়েছে বেদনাও বিচ্ছেদ ও বিরহের অন্তরালে। পবিত্র কবিতা বিষাদাত্মার মর্মারিত ধ্বনি যা ধ্রুপদি বাংলার ভাষ্যে আন্দোলিত ঃ—"বিগত বসন্তে তুমি স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডের মতো কত সত্য ছিলে! /আজ অস্তিত্বের শেষতম চূড়া নিমজ্জিত কালগর্ভে। /আমি জাগি অনিদ্র সতত, তোমার বিচ্ছেদে তাই/ পৃথিবী শোকার্ত, ব্যথাতুরা অথবা যেমন ছিল /সেইমতো সুস্থির জগৎ, আমিই বিষয়কে মগ্ন, /অন্তরাত্মা বিষন্ন মলিন। দেখি সমাসন্ন শীতরাত্রি, /দেখি চন্দ্রিমাশরৎ ভাষায় পৃথিবী—যার বুকে তৃষ্ণা ক্ষণিক বিলীন।" ('অসীমার প্রতি সনেট গুচ্ছ' ১৯৬১-৬২)

কবি পবিত্রর জীবনে প্রেম এসেছিলো একবারই, কুড়ি বছরে বয়সকালে অসীমার প্রতি। অসীমা ছিলেন— কবি বন্ধু মৃণাল দত্ত-র বোন। প্রেম ছিলো-একতরফা। প্রত্যাগত প্রেম কবিকে ডুবিয়ে দিলো বিষাদ সাগরে, অসুস্থ শরীর ও ভাঙা মন নিয়ে তিনি লিখলেন ঃ—

"আমার কপোল আজও রক্ত-রাঙা তোমার চুম্বনে, /যেমন বসন্তে মত্ত কৃষ্ণচূড়া

জ্বলন্ত আকাশে, না বন্ধু, /তোমার স্পর্শ কুলষিত নয় বিস্মরণে, /অনাবিল স্বচ্ছতায় বেদনার বার্তা নিয়ে আসে; / আজও যেন বয়সের বিবিধ তরঙ্গে দোলায়িত/ অনায়াস উজ্জ্বলতা কেড়ে নিতে পারেনি সংসার, /এখনও তোমার কণ্ঠ অজেয় অশার উদ্দীপিত; /মনে হয়! তুমি চাও জীবনের অন্তিম উদ্ধার।' ("অসীমার প্রতি সনেটগুচ্ছ")

কবি পবিত্র-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ—"দর্পণে অনেক মুখ", যেটি প্রকাশ পায় ১৯৬০ সালে—কবি তখন বিশ বছরের কলেজ পড়ুয়া। 'মায়ের মুখ' কবিতাটি খুবই উল্লেখযোগ্য, আসুন পড়ে নিই ঃ—

"দেয়ালে অজস্র মুখ, মা-র মনেই পড়ে না। / কত ঝড় বৃষ্টি এল ভেঙে চুরে স্মৃতির প্রান্তর। / উদ্ধত ফলক নেই, গোলাপের পাপড়িও ঝরে না বিস্তৃত শ্যামলে; শুধু নিরন্তর পাতার মর্মর। মা, তুমি হারিয়ে গেছ বহুদীর্ঘ মুখের মিছিলে। ওই তো সুদপা লিলি সুকুমার ইলাদি সবাই কেমন সুস্পষ্ট মুখ, / স্পষ্ট চিহ্ন—আঁকা যেন নীলে উজ্জ্বল শুভ্রতা দিয়ে/ সেখানে তোমারই চিহ্ন নাই।"

ছেলেবেলাকার ছবি মনেই পড়ে না, / তাই তুমি নিরাকার স্মৃতি হলে কেমন সহজে অনায়াসে! / ইলাদি সুতপা লিলি সুকুমার শ্যামলী ও রুণি / ওরা তো এখনও ঠিক কথা কয়, কাঁদে আর হাসে।

দেয়ালে অজস্র মুখ, শুধু নেই তোমার তোমার স্নেহার্ত সুন্দর ছবি। /চতুর্দিকে মগ্ন অন্ধকার।'

কবিতাটি পড়লে কি এক নষ্ট্যালজিক বিষাদ আমাদের তাড়া করে; মায়ের জন্য এক সদ্য উত্তীর্ণ কিশোরের আর্তি ও হাহাকার আমাদের চোখ ভিজিয়ে দেয়, মনকে বিষণ্ণ করে। একটি কবিতার অমেয় ভাষা কিভাবে আমাদের বোধের ঘরে ভাবনার সম্ভার করে মর্মের গভীরে তারই উজ্জ্বল প্রকাশ এটি।

খুব অল্প বয়সেই পবিত্র জেনে গেছেন জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে যে একচিলতে ফারাক সেই অনিবার্য ও অমোঘ সত্যকে। রবীন্দ্রনাথের "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন" এই আপ্তবাক্যটি কবি পবিত্র হৃদয়ঙ্গম করেছেন কৈশোরের দিনগুলোতেই, তাইতো তিনি লিখতে পারেন কুড়ি বছর বয়সেই ঃ—

"কাকে যে প্রেমিক বলি, জীবনকে অথবা মৃত্যুকে? /এই দুই প্রতিবেশী সময়ের রসমান বয়সি—অবিরল কাছে টানছে। /কাকে সন্তর্পণে রাখি বুকে? কার প্রণয়িনী হয়ে সগৌরবে বামপার্শ্বে বসি?

অথচ নিশ্চিত জানি—এই যুগ্ম প্রণয়ীর হাতে খেলা করছে ত্রিজগৎ—স্বরাজ্যে স্বরাট যাদুকর। কার কণ্ঠে মালা দেব? কে যে নায়সঙ্গী হবে রাতে? দুজনই আমার প্রিয়, জন্ম হতে পরম নির্ভর।

জীবনকে ভালোবেসে নিরন্তর ক্ষয়ে যেতে পারি নির্ভার শান্তিতে গেঁথে আলোকিত মুহূর্তের মালা, অথচ মৃত্যুর প্রেমে আকৃষ্ঠ নিমগ্ন এক নারী, অকুণ্ঠ আশ্রয়ে যাঁর অপসৃত সব দুঃখ জ্বালা। কাকে যে প্রেমিক বলি, জীবনকে অথবা মৃত্যুকে! স্বৈরিণী জীবন তাই নাটকীয় সংঘাত-মুখের; অতএব হে সময়। তোমার সর্বজ্ঞ শান্ত বুকে মাথা রেখে শান্তি চাই। তুমি হও তৃতীয় ঈশ্বর। ("দর্পণে অনেক মুখ")

কবিতা এমন এক শিল্প যার কোনো তথাকথিত শুরু হয় না—এটি গুরুমুখী শিল্প-নয়। কবি জন্মায়—কিন্তু সেই কবিসত্তাকে অধ্যাবসায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয় নিরন্তর। তবুও যাঁকে দেখে আমরা প্রাণিত হই, লেখাকে আরো আরো সমৃদ্ধ করতে পারি, তিনি দেবদূতের মতো অন্ধকারে আলো দেখান তিনিই আমাদের গুরু। অনেকের মতো আমারও কাব্যগুরু করি পবিত্র। কবিতার প্রতি তাঁর নিমগ্ন ও নিবিষ্ট দায়বদ্ধতার তাঁর হাত থেকে জন্ম দেয় সেই প্রমাদিত পংক্তি ঃ—

"যে কোনো শিল্পই হবে রক্ত দিয়ে ফোটানো গোলাপ" এই পংক্তিটি কবিপত্র' পত্রিকার প্রচ্ছদপটে নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে। কবিতাটিতে আসুন একটু চোখ বোলাই যা "হেমন্তের সনেট" (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ঃ—

"যে কোনো শিল্পই হবে রক্ত দিয়ে ফোটানো গোলাপ। বিশেষত, কবিতার প্রতিশব্দ, প্রতি উচ্চারণে ঘাতকের মর্মজ্বালা চান পায় অন্তিম প্রকাশ; যেন আমি ক্ষুধার্ত কুকুর যার অতৃপ্ত রসনা পরম বিবেক বুদ্ধি নীতিমালা ছিন্ন করে যায়.... পরম মুহূর্তে যেন বিন্দু বিন্দু রক্তের প্রবল পেষণে সমাজ প্রেম রুচি মুখ চূর্ণ হয়ে ঝরে.....কবিতার পাদমূলে দিতে হয় সকলই অঞ্জলি।'

যে কোনো শব্দই যেন উঠে আসে প্রণয়ী ঘাতক, বুকে হিংস্র জ্বালা, তার গলায় ঘৃণার বনমালা, হাতে তার বিষপাত্র, পদক্ষেপে কাঁপায় পৃথিবী, বিষাক্ত ক্ষতের পরে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে অনায়াসে পোড়ায় তোমার ঘর; উদ্দীপিত করো তার ক্ষুধা; তাহলে শিল্পও হবে রক্ত দিয়ে ফোটানো গোলাপ।'

মহাকবিতার কবি, মহাকবিতার জনক কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কলম বারবার ঝলসে উঠেছে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় ও প্রতিষ্ঠানের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে—তা সে প্রশাসনিক হোক, বাণিজ্যিক বাজারী পত্রিকাই হোক।

তাঁর ৯টি মহাকবিতার প্রথমটি "শবযাত্রা" (১৯৬১) মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ" মহাকাব্যের (১৮৬১) ঠিক একশো বছর পরে প্রকাশ পাচ্ছে। একটি ২০ বছরের ছেলে, কলেজ ছাত্র, ধ্রুপদি বাংলায় দক্ষ কবিতা— যা পড়ে কবি বিষ্ণু দে বলেছিলেন—তিনি তিনরাত ঘুমোতে পারেন নি। সেই মহাকবিতাটির কয়েকটি স্তবক আপনাদের জন্য রাখবো ঃ—

"আমি স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট বর্ণহীন ব্যথিত গোলাপ অশান্ত অতৃপ্ত এক দেবশিশু পরম সুন্দর; কোথায় এলাম? এই শাপাদগ্ধ প্রাচীন প্রান্তরে? ভ্রষ্ট আদমের মতো আর্তনাদ অমল আত্মার।" একটু এগিয়ে গিয়ে ঃ—

"এরা কতকাল ধরে পরিচিত, অথচ বিস্মৃতি ঘিরেছে শৈবালদাম আমার চেতন সরোবরে; অথচ চেনেনা কেউ, কিংবা কৃষ্ণপক্ষের ছায়ায় আতঙ্কিত সূচ, মূঢ়জেগে আছে প্রস্তরের প্রায়।" (শবযাত্রা ঃ প্রথম সন্ম্যস)

অধিকন্তু, "কে তুমি ভয়ার্ত কণ্ঠ নরকের নব আগন্তুক, নিঃসঙ্গ প্রহরী, জেগে অবিচ্ছিন্ন সময়ের দ্বারে? ত্রিপদে ত্রিকাল ধৃত, ত্রিনয়নে অভিজ্ঞ-চেতনা, স্বর্গভ্রষ্ট, দেবতাত্মা, হেথা এলে অনন্ত প্রবাহ? (শবযাত্রা ঃ পপ্রথমসর্গ)

মহাকবিতাটির পঞ্চম সর্গে গিয়ে পড়ে ফেলছি ঃ—

"আমার হাত ধরো শুষ্ক হাত ধরো, মাংসহীন এই কঠিন চিবুকে ঝুলে আছে নগ্ন-শূন্যতা এবং ভয়াবহ মাড়ির হাড়, দাঁত, শব্দ নেই কোনো শব্দ নেই—এক কুটিল স্তব্ধতা জানায় মুখের গহ্বরে মৃত্যু খেলা করে। আহা কী মৃত্যুর কঠিন রূপ।"

"শবযাত্রা' মহাকবিতাটি এক ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যু নিয়ে লেখা। কবি পবিত্র তখন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র—একটি স্কুল ছাত্রকে উনি পড়াতে যান তার বাড়িতে—হঠাৎ করে সেই ছাত্রের বাবার অকালমৃত্যুতে কবি নিদারুণ আবেগ তাড়িত ও চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন এবং তিনি যেনো সেই ব্যক্তির প্রেতাত্মার সাথে রাতে বসে কথা বলছেন। কবিতার আত্মা ভর করছে, তিনি লিখে ফেলছেন অমোঘ ও তুলনারহিত লাইন ঃ—

" আমার চারদিকে চূর্ণ অনুরাগ যেন বা লীলাভূমি প্রেতাত্মার, আমার চারদিকে ঘৃণার কুণ্ডলী—মুক্তি নেই আহা! মুক্তি নেই!

এখনও কতকাল নরক নির্জনে খুঁড়ব মস্তক দীর্ঘশ্বাস? দিন ও রাত্রির মিলিত শান্তির ওপরে আমি একা প্রতীক্ষায়।" ("শবযাত্রা' ঃ পঞ্চম সর্গ।")

আমাদের প্রিয় কবি পবিত্রদা কর্মজীবনে প্রথমে চেতলা বয়েজে কিছুদিন পড়িয়েছিলেন তারপর বিদ্যানগর কলেজে প্রায় ৩০ বছরের অধিক সময় ধরে বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন— কলেজটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার—ডায়মণ্ডহারবার রোড়ে বেহালা পেরিয়ে অবস্থিত। ওই কলেজে আমাদের রাষ্ট্রপতিও কংগ্রেস রাজনীতিবিদ শ্রী প্রণব মুখার্জী রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াতেন—। রাষ্ট্রপতির সহকর্মী ছিলেন পবিত্রদা।

২০০০ সালে পবিত্রদা অবসর নেন কলেজ থেকে। তারপর শুরু হয় তাঁর কবিতার জীবনের আরও এক অধ্যায়। সর্বদা তরুণ কবিদের পিঠে হাত রেখে হাঁটতে ভালোবাসতেন এই পাঁচফুট চার ইঞ্চি উচ্চতার মোটামুটি খর্বকায় মানুষটি। মনের উচ্চতায় তিনি বিরাট আকাশের মতো, মানবিকতায় তিনি সমুদ্রগভীর। ১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

নেতৃত্ব দিয়েছিলেন "ধ্বংসকালীন আন্দোলন' এবং ১৯৮০) র দশকে 'থার্ড লিটেরেচার কার্য্য ও সাহিত্য আন্দোলনের এই প্রবাদ প্রতীম কবিসত্তা। তিনি স্বঘোষিত বাজারী পত্রিকা বিরোধী কবি—র্তার স্বাভিমান, স্বাধীনতা প্রিয়তা, বাণিজ্যিক পত্র পত্রিকার দাসত্বের বিরুদ্ধে সদা সংগ্রাম তাঁকে এক অনন্য দ্রষ্টা ও তখন কবিদের মনে আগুন জ্বালাতে সহায়তা করে। এ এক অনন্য প্রাণ, দ্রোহীসত্তা, কবিতার কালপুরুষ, বিষাদমগ্ন কাব্যসাধক, যাঁর কলম বারে বারে বুঝিয়ে দেয় মানুষের অবস্থান ও তাঁর স্বাধীন সত্তাকে—মাথা না নোয়ানোর জেদ। কবি পবিত্রর "ইবলিসের আত্মদর্শন" জ্বালিয়ে দিয়েছিলো সেই আগুন (১৯৬৯)। এক আঠাশ বছরের তরুণের জীবন ও পৃথিবীদর্শন, অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে অনন্ত জেহাদ ঃ—

" হাড়িকাঠে মাথা পেতে খচ্চরের বাচ্চা শুয়ে আছি তুইতো প্রভুর পায়ে মাথা ঠুকে হাঁপাচ্ছিস সর্ব থেকে নেমে আমাকে ইব্‌লিস বলে সিজ্‌দা করিনি অবিশ্বাসী।" (প্রথম সর্গ)

আরো এগিয়ে গিয়ে পড়ি—

"আঠাশ বছর ধরে বুঝেছি বাঁচার কোনো মানে হয় না অন্য ধ্বংস প্রজনন হা-হুতাশ ছাড়া! নিরেট মাংসের স্তূপে ঢেকে গেছে মাস্তিষ্ক করোটি ছাপমারা ভেড়া আমি সিজ্‌দা করিনি অবিশ্বাসী।" (প্রথম সর্গ)

মহাকবিতার শ্রেষ্ঠ ধন এই "ইবলিসের আত্মদর্শন", যেটি পবিত্রকে মহাকবিত্বের তক্‌মায় উন্নীত করেছে। বাংলা কবিতা সাহিত্যে এইরকম কড়াধাতের ও ঋজু শিকদারাকে কবিতা আর কটি? তাই আমাদের পড়ে নিতে হয় ঃ—

"আনাচে কানাচে ঘুরি নরম ঠ্যাঙের ফাঁকে মাথা পেতে আঠাশ বছর/ চৌদ্দ পুরুষের পাপে বেঁচে আছি বুকের চামড়ার নীচেই/ কিলবিল করছে কৃষ্টি কীট তেলতেলে ধূসর হারামির বাচ্চা,/ শালা বেজন্মা নাহলে মৃত্যুকে বুকের খাঁচায় পুরে মেতে উঠি.... সভ্যতার স্বর্ণশীর্ষে বসে আছি রক্তের আশায়/ বর্ষার ফলায় গেঁথে নিতে চাই শিবদাঁড়া হৃদপিণ্ড করোটি।' (প্রথম সর্গ)

কি প্রবল আত্মবিশ্বাস আর অস্মিতার উদাহরণ পাচ্ছি পবিত্রর ছত্রে ছত্রে ঃ—

"হাতের চেটোয় মৃত্যু এবং জীবন খেলছে বুজরুকের মতো /আমার নকর ধান্দা আমি যে ইব্‌লিস পাপী সিজ্‌দা করিনি/ সিজ্‌দা করব না সুতো ধরে টানব জীবন-মৃত্যুর/ ওরা তো আমার ধান্দা প্রভু না কেউ।"

এইসব লাইন পড়লে রক্ত গরম হ'য়ে কাঠ, তীব্র ভিশুভিয়াসের মতো মনের আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত হ'তে পারে গরম আগুনস্রোত। তাই কি অনিবার্য ও অমোঘ লাইনগুলি কাল থেকে আমাদের পৌঁছে দেয় কালান্তরে, তিনি তো কালান্তরের কার্য ঃ— যা খুবই প্রাসঙ্গিক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতেও ঃ—

"কে ভাবে কাহার কথা? দেশনেতার গলাবাজি প্রতিশ্রুতি ঢের শুনেছি / মসনদ নিয়ে ঘৃণ্য কাড়াকাড়ি সর্ব্বত্র শকুনি ওড়ে আকাশে/ মাটিতে উপদেশ প্রতিশ্রুতি কুম্ভীকাশ্রু-বিসর্জন শেষ হয়ে গেলে/ ইহজীবনের প্রভু কোমল উরুর যূপকাষ্ঠে মাথা রাখে" (প্রথম সর্গ)

পবিত্র কবিতার সত্তা ও ভীষণ তেজ মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রকটিত গণগণে আঁচের মতো—এ যেনে হিটওয়েভ আত্মাকে ঝলসে দিতে চায়, ভয়ানক জীবন-অভিজ্ঞতার তীব্র অভিঘাতে ঃ—

"আমার হাসির তলে রক্তপায়ী হায়ানার হাসি আমাকে চেনো না? /আমি ইব্‌লিস, কেবল তোমাদের / সাজানো নধর দেহ চতুর ছেনালিপনা বেশ্যার দালালি/ জেনেছি দেখেছি ধরে দীর্ঘদিন দীর্ঘ পর্যটনে জেনেছি / দিনের চেয়ে রাত্রি সত্য অন্ধকার বাদুড়ের মতো পুরোনো/বুকের কড়িবরগা ধরে ঝুলতে থাকে মরণ অবধি রাহুগ্রস্ত সূর্য সূর্য দীর্ঘকাল ভুগে ভুগে অস্তাচলগামী আঁধারই/আশ্রয় রাত্রি বর্তমান শতকের অনন্য নিয়তি।"

মহাকবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় মিথের ব্যবহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ও এই বিষয়ে—তিনি পথ প্রদর্শক। অন্যান্য মহাকবিতাগুলিতে তিনি চাইবেন, মহাভারত থেকে যথেচ্ছ মিথ অর্থাৎ পুরাণের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। তাঁর "বিযুক্তির স্বেদরক্ত" মহাকবিতার বাইবেলকে প্রাসঙ্গিকতায় ব্যবহার করেছেন।

মহাকবিতা "অলর্কের উপাখ্যান" এবং "পরশুরামপর্ব" মহাভারতের পুরাণজাত, তা হলেও এই মিথ উপলক্ষ্যমাত্র, লক্ষ্য মানুষের জীবনের বিভিন্ন সত্যকে অকৃত্রিম ভাবে অভিজ্ঞতার পারম্পর্যে তুলে ধরা যা কবির মহত্তম ও বিভিন্ন বর্ণিল জীবন-যাত্রা ছাড়া সম্বভ নয়।

বাংলা কবিতা সাহিত্য এই মহত্তম কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়কে মনে রাখবে মহাকবিতার জন্য, সনেটের জন্য—যে কবি সারাটা জীবন শুধু কবিতার জন্যই 'প্রমিথিউস' হতে পারেন সত্তায় ও দ্রোহে, অস্তিত্বের বিপন্ন সংকটে জীবনকে বাজি রেখে, আত্মায় কাব্যদেবীরে কাছে বাঁধা রেখে— কাল ভেঙে মহাকালের দরজায় টোকা মারতে মারতে। বাজারী পত্রিকার আতসকাচে লিলিপুট দাসত্বকারীরা মহাকবি পবিত্রকে ধরতে পারবে না, কারণ তাদের রোধে হিংসার অনল ও পিঠে অস্ত্রচিহ্ন আছে। মহাকবি পবিত্রকে তাই বিরাট কাব্যকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মতোই গ্যালিলিওর দূরবীন দিয়ে বিচার করতে হবে। যতো দিন যাবে তা আরও সত্য বলে প্রকাশিত হবে পবিত্র কাব্যের অমোঘ দ্যুতি যা অনস্বীকার্য। তরুণ মেধাবী কবিরা কালের এসকালেটরে আসবেন ও বিশ্লেষণ করবেন পবিত্র ছটার ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য।

কবিতা : প্রবীণ-স্বর

চলো বন্ধু চলো

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

রাজ্য পেয়ে ভুলে গেলে সব বার্তা
মুখোশের নীচে কি ছিল তা কে জানত!
দিনে দিনে খুলে যাচ্ছে সব অর্থ
চোরেরা সব ডাকাত হয়েছে এই মর্তে।

কি করবে ভাবছ কি সবাই এখন
ভাবো ভাবো অহোরাত্র ভাবো
মুক্তির তো একটাই পথ নদীর মতন
চলো, বন্ধু চলো—

মৃত্যু তো রয়েছে কাছে

অনন্ত দাশ

মৃত্যু তো রয়েছে কাছে কিন্তু তা কোথায় কত দূরে
খুঁজেও পাইনা তাকে জীবনের আরক্ত যাপনে
এদিকে শহর জুড়ে প্রতিদিন মিছিলের সারি
প্রতিবাদ ফেটে পড়ছে মৃত্যু নেই এখন মননে

নিদ্রাহীন আছি তাই কীভাবে কাটাব অন্ধকার
কীটদষ্ট এই রাষ্ট্র জ্বেলে আছে দাঙ্গার প্রহর
বড়ো অসহায় লাগে মনে হয় ভাসছি মহাকাশে
ক্ষোভ আর আর্তি নিয়ে জেগে আছে আমার শহর

কঠিন জীবন নিয়ে বেঁচে আছি বড়ো দীর্ঘকাল
মানুষের দীর্ঘশ্বাস প্রতিদিন গায়ে এসে লাগে
পরবাসী নই আমি এ আমার স্বদেশ স্বভূমি
অধিকার নিয়ে তাই আজও আমি আছি পূর্বভাগে

আশি পার হয়ে ভাবি মৃত্যু তো রয়েছে খুব কাছে
স্বপ্নের ভিতরে দেখি সূর্যমুখী ফুল ফুটে আছে

আজবদেশের কল্পকথা

গণেশ বসু

গায়েন ঃ কে কী বলল যায় আসে না আমরা খাঁচার কাকাতুয়া
দোহার ঃ আমরা খাঁচার কাকাতুয়া
গায়েন ঃ উপরতলার মরজি মাফিক ডাকতে পারি হুক্কাহুয়া
দোহার ঃ ডাকতে পারি হুক্কাহুয়া
গায়েন ঃ কাজির বিচার ওঝার নাচন বাক্‌তাল্লার আন্ডা পাড়ে
দোহার ঃ বাকতাল্লার আণ্ডা পাড়ে
গায়েন ঃ জলকামানের সঙ্গী হয়ে মনের সুখে ডান্ডা মারে
দোহর ঃ মনের সুখে ডান্ডা মারে
গায়েন ঃ আমাদের চারপেয়ে জীব গ্যালন গ্যালন বিলোয় সোনা
দোহর ঃ গ্যালন গ্যালন বিলোয় সোনা
গায়েন ঃ ব্যাঙ্কগুলোকে লাটে তুলে ধাপ্পা চলে মুদ্রা গোনা
দোহর ঃ তুমুলভাবে মুদ্রা গোনা
গায়েন ঃ কালো টাকার পাহাড় গড়ে ভাবতে থাকি দেশের কথা
দোহর ঃ ভাবতে থাকি দেশের কথা
গায়েন ঃ ফোঁপরা ব্রেনে শকুন ইগল রাহুকেতুর সরবতা
দোহর ঃ সরবতা
গায়েন ঃ টপ্পা ঝেড়ে লটকা নোটন মাত্ করে দি আসরটাকে
দোহর ঃ আসরটাকে
গায়েন ঃ বন্ধ্যাজমির খড়কুটোরা হল্লা করুক প্যাঁচার ডাকে
দোহর ঃ প্যাঁচার ডাকে
গায়েন ঃ অট্টালিকার প্রাঙ্গনেতে দ্বার পাহারায় ছাগল পুষি
দোহর ঃ ছাগল পুষি
গায়েন ঃ ইচ্ছে হ'লে কান মুলে দি জনগণও বেজায় খুশি
দোহর ঃ বেজায় খুশি
গায়েন ঃ হাঁকতে নিলাম দেশবিদেশে মোটা ভাইদের লাগাই কাজে
দোহর ঃ লাগাই কাজে
গায়েন ঃ ঘণ্টা বাজাই হাতালি দি হিঁদুয়ানির পক্ষীরাজে
দোহর ঃ পক্ষীরাজে
গায়েন ঃ বিশ্বায়নের বোলবোলাতে চাচাচাচির পোয়াবারো
দোহর ঃ পোয়াবারো
গায়েন ঃ আজব দেশের কীর্তনেতে যুক্তি তক্কো কলি ছাড়ো
দোহর ঃ দেশ বিকোনোর স্বপ্ন ছাড়ো।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

প্রেমিক কোথায় আছে?

কৃষ্ণা বসু

তোমার ভেতরে এক পুরুষ রয়েছে,
কামনা কাতর সে যে কথা তো কয়েছে!
প্রেমিককে আমি আর পাইনি তোমাতে।
স্বপ্নাক্রান্ত হয়ে তুমি চাওনি আমাতে!
প্রেম নেই, কামনা রয়েছে তীব্রতর,
সেই প্রেম স্বপ্নে আছে খুব গাঢ়তর!
আমি সকল জীবন ধরে খুঁজে গেছি
একটি প্রেমিক সত্তা খুঁজতে এসেছি!
কামনা ফুরোলে সব ফুরিয়েই যায়,
স্বপ্নাতুর প্রেম লাগি প্রাণ করে হায়!
সন্তানের পিতা তুমি কর্তব্য-কাতর
প্রেমিক কোথায় আছে হৃদয় পাথর।
মধ্যরাত জেগে থাকে অনিদ্রা-যামিনী
প্রেম-পাগলিনী আমি প্রেম-গান মানি।
প্রেম তো পাইনি আমি কোনোদিন জানি,
পুরুষ পেয়েছি আমি সংসারও পেতেছি।
জীবনের জয়গান প্রাণেতে গেয়েছি।
প্রেমিক কোথায় পাবো প্রেম নেই সখা,
সকল জীবন ধরে নেই কেন দেখা!

জবা

দেবাশিস মজুমদার

এসো প্রেম দেশদৃশ্যময়,
পতাকার চারিদিকে অনন্যতায়;
প্রকৃতি ও প্রীতিতে উচ্ছল আশালতা
সম্ভ্রমে উতল সহযোদ্ধাদের মন, তবুও
শারীরিক চয়নে উদ্ধত হতে চায়
স্বপ্নমুকুল
স্ফীত সম্ভাবনায় ফুটে ওঠে ফুল,
সহস্র রক্তকরবী অথবা জবায়।

স্বাধীনতা

মধুশ্রী সেন সান্যাল

অদ্ভুত গোলকধাঁধা
ওপরে ওঠার সিঁড়ি
বাড়িয়েছে যেই হাত
নিমেষে পতন—
প্রাপ্য ছিল অথচ এ তাজ...
শকুন ভাগাড়ে
খুঁটে খুঁটে সব দানা
সিঁড়িময় নয়ছয়—
ডিঙোবে স্পর্ধার জমি—
রাজার মোহর সাঁটা মেধার বিভাবে?
খুলে ফেল সব সাজ
বোধের বাহার
শূন্যগর্ভ সব...
পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা পণ্যের
লেবেল গায়ে তার

বসন্ত

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েকটা ফুলের নামে তাকে ডাকা যায়;
একটা হাওয়ার ভালোবাসা
দক্ষিণ দেশ থেকে আসে।
স্বত্ববিলোপ তবু রবিঠাকুরের গানে
প্রতিবার তার আসা যাওয়া।
সময়ের পালক খসে সারাটা বছর
সারাটা বছর জুড়ে পর্যটন মেলা
কেবল বিজয়ীর আসা সশস্ত্র ফুলেল
আঘাতে আঘাতে তার প্রেম জেগে ওঠে।
পথেঘাটে মানুষের যৌবন বিজ্ঞাপিত হতে হতে
অবশেষে খরতাপে ধ্যানের গভীরে ডুবে যায়।

অতিমারি
বীথি চট্টোপাধ্যায়

হু হু করে কাটে দিনরাত
যেন ট্রেনের জানলা দিয়ে;
পেরিয়ে যাচ্ছে দিগন্তসীমা
ধানক্ষেত হাতে নিয়ে।

নিশুতি রাতটি ঝরে পড়ে
ঘোর বৃষ্টির মত মুখে
শুনসান পাড়া, ছায়ামূর্তিরা
হাঁটে শহরের বুকে।

পড়ন্ত রোদ মুছে দেয় দিন
পাখির ডানায় উড়ে,
কল্লোলিনীর কলরব যেন
বেড়াতে গিয়েছে দূরে।

কুসুমে কুসুমে ফাঁকা রাস্তায়
চরণচিহ্ন রেখে,
আর কতদূরে নিয়ে যাবে তুমি
আমাকে আমার থেকে?
কোনদিকে যাবো কিছুই জানিনা
কূল থেকে ঘোর জলে
নদীর ওপর জীবনের রং
কত খেলা বয়ে চলে।

ফাঁকা রাস্তায় ফুল ঝরে পড়ে
ধুলোবালি খড়কুটো;
তালা পড়ে গেছে দোকানে
দোকানে
আলগা হাতের মুঠো।

দিন শেষ হয়ে যে সিন্ধুপারে
রোজ রাত এসে মেশে,
ছায়া মেখে কারা মিলিয়ে যাচ্ছে
না ফেরার দূর দেশে।

ফাঁকা রাস্তায় কুয়াশার স্তর
শহরের ধুলো মেখে,
আর কতদূরে নিয়ে যাবে তুমি
আমাকে আমার থেকে?

ঘাতক
সুমন গুণ

পুরনো বাড়ির চিহ্ন মাঝে মাঝে পুনর্মুদ্রিত
সংসার চমকে দিয়ে যায়।
খুব ছোট ছোট টুকরো : অব্যবহৃত
খাতা, ঢাকনাহারা কৌটো, ভাঁজ করা
পরিপাটি পর্দা কয়েকটি
মুহূর্তে ঘাতক হয়ে ওঠে, লাফ দেয়
অসংবৃত জীবনের বুকের ভেতরে,
সমস্ত সাজানো ইচ্ছে কেড়ে নিয়ে, ভেঙে ফেলে
পরিযায়ী বাসনাচিহ্নিত ঘরবাড়ি।
ধ্বংসস্তূপে হাত রেখে মাঝে মাঝে পুনর্জন্ম হয়।

খুলে রেখো পানসি তোমার
অমল কর

একদিন দেখো, তোমার সুবর্ণরেখায়,
ঠিক পাড়ি দেব।
তোমার জলে নামব, ডুব দেব,
সাঁতার কাটব, ভাসব।
তোমার গভীরে, শেকড়ের মতো,
তিরতির নোঙর গাঁথব।
জল খেলা শেষ হলে, অনন্ত জিরেন নেব,
তোমার উপকূলে।

খুলে রেখো পানসি তোমার,
শিখে নেব সব পারাপার।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

প্রতীতি
আনসার উল হক

প্রিয় বন্ধু, এখনও যারা বিষণ্ণমুখে ভাঁজ হয়ে বসে আছ
আতর মেখে সুন্দরের বিকল্প খুঁজে বেড়াচ্ছ
বর্ণাঢ্য বিভ্রান্তির মোহে শরীর পেতেছ
জেনে রেখো, সময়ের ঠোঁট জুড়ে জেগে থাকে বস্তব ইতিহাস
অন্ধকারের নিজস্ব আলোয় পথ খোঁজে শ্রমিক-জীবন—

সেই কবে, সুরভিত সময়ের ভাঁজে আমি তো রেখে এসেছি
আমার গান, ছন্দের কবিতা, আর উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ শিল্প
তারা এখনো খ্যালে আমাদের গামে, পাড়ার বাঁশ-বনে
মেঠোপথের বাঁকে, ধানের শিষে, পাখির ঠোঁটে
পাঁজর-ওঠা সুতিখালের নড়বড়ে সাঁকোর ওপারে
সমস্ত দিন, পরম মমতায়।

সংসার পেতেছি অবেলায়
নেকড়ে, আর হাঙরের আস্তানার পাশে
সহাবস্থান আমার বেমানান, আমি এক ক্রান্তদর্শী বালক
তাই, মহাসত্যের সন্ধান করতে করতে
আমার নৈঃশব্দ্যের নাবিক-মন অনবরত খুঁজে বেড়ায়
পরম বাস্তবতা, প্রাণের প্রতীতি।

ভেঙে ফেলতে পারি
সুশীল মন্ডল

কবিতার জন্য ভেঙে ফেলতে পারি
বিপুল মহাকাল এবং সন্ধ্যার শেষ রূপটানে ব্যস্ত
আয়নার সামনে ঐ নারীকে। কপালের ঘাম
বৃষ্টিতে মুছে গেলে
কার্নিশে বসা চড়াই যুগলের সোহাগ কবিতার জন্ম দেয়।
এমন দৃশ্য আমি জলাভূমিতে নির্বাসন দিতে পারি।
নদীর ঢেউ অতসী ফুল
এবং বিপুল সহবাসের উৎসবে মানুষ
মানুষের মধ্যে সেঁধিয়ে রায় আর আমি
কবিতার জন্য পিছনে ফেলি
টুকরো টুকরো ভ্রমণ পিপাসু মেঘ।

প্রবেশ দ্বার

ভবেশ বসু

আগুন আমার প্রবেশ দ্বার জানে না ধোঁয়া জানে
এ নিয়ে ধোঁয়ার খুব গর্ব, সে শশ্মানঘাট থেকে
বাড়ির ভিতরে যায় বলে নিজেকে দেবতা ভাবে
আগুন জ্বলছে ধোঁয়া উড়ছে ছুঁয়ে যাচ্ছে চোখ
উচ্চারণে থেকে যাচ্ছে সকলের।
এই নারী উনোন জ্বালায়, তাপটাকে তার ভয় নয়
ধোঁয়াতে সে চোখ হারিয়ে বসে
আমাকে ছুঁয়ো না ধোঁয়া
আমি ছাই হতে প্রস্তুত কলঙ্ক নিতে নয়।

প্রতিদিন আমাকে হারিয়ে দেয় ধোঁয়া
বাঘের দাঁত সহ্য হয়, বিড়াল আঁচড় দিলে লজ্জা লাগে
আমি কি এমনই ফুল যার গন্ধ নেই!
মেয়ে সাজি নিয়ে চলে যায় ফিরেও তাকায় না
এতটুকু আগুনের জন্য রাতবিছানা ভিজিয়েছি
ধোঁয়ার কণ্ঠস্বর আমি চাই না
তবু রাত অথবা দিনে ধোঁয়া উঁকি মারে
জানালা গলে আমায় ভোগ করে সবার আগে
আমি আগুন খেতে পারি
ডানা ধরে ধোঁয়া খাব কি করে

একদিন আগুনকে বললাম তুমি একটা মূর্খ
আমাকে সাপে কাটছে দেখেও কিছু বলো না
সাপের ফণা ভয় করে
মৃত হয়ে পড়ে থাকতে হয়
তুমি মৃতদেহ খাবে?
তার চেয়ে এখন আমার নিজের আগুন প্রত্যক্ষ করো।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

মারীচ সংবাদ (২)

শঙ্কর ঘোষ

সমস্ত ছায়ার পাশে—পঙক্তি গড়িয়ে
বনের—বনান্তরে সময়কে টান দেয়
হাড়-মাংস ঢুকে...
এই যে সূর্য অনন্ত মেঘের আড়লে—অন্ধকার
সেজে আছে ধ্রুবপদ ব্যঞ্জনার উত্তর পর্বে
তবুও, কৌণিক আলো পড়ে—বাতাসে
ছড়িয়ে থাকা ঘ্রাণে—সে মায়াবী
হরিণীকে দেখতে পাই...
দেখতে পাই, বেদনার অশ্রুর ভিতর—আঁচলা
জলে দু-মুঠো অন্নের জন্য—অগ্নি পায়ে
তাপ ছুঁয়ে মায়াবী রূপ ধরেও
তীর বিদ্ধ হয়ে...
যেন, শব্দের প্রতিটা নিঃশ্বাসে লক্ষ -লক্ষ ধ্বনি,
প্রতিধ্বনিত হয়ে কানের গভীরে
বেজে উঠছে...
মারীচ, কতটুকু মৌসুমী প্রবণ-উত্তরের প্রতিঘাতে?
অনিশ্চিত হয়েও—নদীটিকে প্রশ্ন করি
যদি পাই সেই উত্তর—শব্দ জল তরঙ্গ থেকে...

সংক্রমণ

তাপস মিত্র

সম্পর্ক হল চারাগাছের মতো
তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে
ভালোবেসে জল ঢালতে হয়
সার কীটনাশক

এত যে বয়েস হল পড়ন্ত বিকেল
ঘর সংসার প্রিয় সন্তানেরা
নিজেদের সেলফি নিয়ে ব্যস্ত
বাগান জুড়ে শুধু আগাছা

কী জানি ফুসফুসে ইনফেকশন হলে
কেউ বাঁচে কিনা

এত বছর একসাথে আছি একটাও ছবি নেই
হৃদয় শুকিয়ে গেলে বেঁচে থাকা অন্যায়

পলায়নের মন্ত্রগুপ্তিটি পেতেই

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

গতজন্মের পোশাক খসিয়ে পুনর্জন্মের আলখাল্লাটি পরে নিল ইহজন্ম, যেভাবে
বধ্যভূমির দিকে তাকিয়েই ছাগশিশু চিনে ফেলে পুরনো হাড়িকাঠখানি; ওহে,
জীবনই একমাত্র, স্মৃতিরোগ ব্যতীত পিছু হাঁটে না, পাতাঝরা গাছেদের মতন
রিনিউয়েবল নয় পরমায়ু, সবকিছুরই অথচ উল্টোদিকে ছুটে চলার কীরকম
উদগ্র প্রবণতা! রাত দিনের দিকে, বর্ষা-দরবারে পোঁছতে চায় গ্রীষ্মদুপুর,
ফুটিফাটা নাবাল টাঙ্গায় সুরেলা মেঘমল্লার, দেদার আরশিময় বিস্তীর্ণ ধানমাঠ,
আঙ্গুলে পরেছে মেরজাপ, মধ্যদুপুরে সোহিনীও হাজির বেবাক্, বিজ্ঞাপিত হয়
মজা নদী ও বালুচর আয়োজিত যৌথ ঢেউ-ফেস্ট, সদস্যবৃদ্ধি হওয়ার দেদার
খুশিতে প্রসপেক্টাস পড়ে শোনায় তৃপ্ত মাস-জুলাই, সাড়ম্বরে, তিরিশদিন নাগাড়ে
অন্ধকার, কমপক্ষে রবি-সোম-ভৌম-বুধ-বিষ্যুৎ হয়ে কেষ্টা শুক্রবার, আচমকা
কত্তো, কতোবার যে স্বকর্ণে শুনেছি দৈববাণী ঃ
কান দিও না বাপ বাথরুমের গুজবে, কোনো অবস্থাতেই
শাস্ত্রে বিধান নেই যে ভ্রূণহত্যার পাপ হয় স্বহস্তমেহনে।

সময়

দুর্গাদাস মিদ্যা

মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে ভাবি কোন জমানায়
আমাদের বাস!
এমন সহবাস বহুদিন হয়নি
এতো আর্বজনা ঘরের মধ্যে ছিল অথচ বোঝা গেল না।
আর কত ভুল হবে মানুষ চিনতে?
সর্পসঙ্কুল এই যে সময় বিচলিত করে আমাদের সকলের হৃদয়।
যেদিকে চাই শুধু ছাই ওড়ে বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে ভয় হয়
এমনই এক সময় দাঁড়িয়ে সামনে। শুভ যা কিছু ছিল
ভেঙে চুরমার হল কার অভিশাপে কে জানে
কোনখানে গেলে নিশ্চিন্তে
বেঁচে থাকা যাবে মানুষের গৌরবে?

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

স্টেরয়েড

ফটিক চৌধুরী

স্টেরয়েডের মত তেতো জিনিস আর হয় না
অথচ জীবনদায়ী ওষুধ
তবে কি জীবনে তিক্ততারও প্রয়োজন আছে?
যৌবনে কেউ আমাকে বলেছিল, প্রেম নয়
প্রেম উপসর্গ মাত্র, বিরহ হচ্ছে অ-সুখ
সুখের সঙ্গে অ-সুখেরও প্রয়োজন
প্রেম ও স্টেরয়েড হচ্ছে ম্যাজিক
অন্তর্দাহ ও অ-সুখ নিয়ন্ত্রণ করে।

জীবন মানে ফুসফুস, যার ভেতরে
শ্বাস প্রশ্বাস আসা যাওয়া করে
একটু টান পড়লেই সব ওলটপালট
যেন শীতের ধোঁয়াশার মধ্যে ছোটা
যেখানে কোন সাইরেন কাজ করে না।

যে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসে
তাকে কি বোঝাবে জীবনের রহস্য কি ?
একটি ঘরের মূল্য ? ঘরের ভালবাসা ?
তুমি তখনই জেনে গেলে তোমার পাশে কেউ নেই
তিক্ত লাগলেও জেনে রেখো, ঘরের টান
ঘরের ভালবাসা তোমার স্টেরয়েড।

প্রথম সন্ত্রাস

মৃণালকান্তি সাহা

পৃথিবীর প্রথম সন্ত্রাস এখনো বেঁচে আছে
সালটা যা হয় হোক—
রহস্যের গভীরে যে অন্ধকার
তার মাঝে স্বপ্ন আসে নিয়ে যায় সীমান্ত রেখায়।

অজস্র প্রহর কাটে, পড়ে থাকে অগণিত পাতা
ঝাউ, নিম, আকন্দের ডালপালাগুলি
বাতাসের রুক্ষতায় শুষ্ক হয়—কতযুগ।

এ যুগেও ভাবে না কেউ, লুম্পেন ঘাতকদের কথা
আক্রান্ত ফাতেমা কাঁদে, পড়ে থাকে বাহারি উল্লাস।

নিঃশব্দ সেতারের সূর্য প্রদিক্ষণ

অরবিন্দ সরকার

মৌশাখীর নিতম্বে প্রতিদিন জোনাকীরা বর্ষার গান গায়
করতলে সাত সাগরের মণিমাণিক্য
কণ্ঠদেশ থেকে চুম্বন বাঁশি
অনিন্দ্য ধ্বনি তোলে
দেহতরঙ্গে চৈতন্য খেলা করে
আজ এই বঞ্চিত সময়ে দিগন্তে
দুটি ঢেউয়ের একাত্মতায়
উল্লসিত নিঃশব্দ সেতারের
সূর্য প্রদক্ষিণ।

বিশ্বাস

ত্রিদিবেশ চৌধুরী

এখন আমার ইচ্ছানদী মানুষ খুঁজে ফেরে
আসল মানুষ, নকল মানুষ চিনবে কিসের জোরে
বিশ্বাস চাও - বিশ্বাস দাও চাইবে জগৎপিতা
ভুল করলেই ঠকে যাবে নকল মানুষ খাসা
ভুল বুঝিয়ে জিতছে সবাই একনায়কতন্ত্রে বাঁধা
লোভের বশে পা বাড়িয়ে একদিনেরই রাজা
কিছু দিনেই ফেঁসে গিয়ে রাজার কাপড় কোথা
বিশ্বাস - অবিশ্বাসের মাঝে পুতুল নাচের কথা

পাঁচমিশেলে

দিলীপ দে

এক. মায়ের দুধের ওপর স্বীকৃত অধিকার সন্তানেরই।
তা বলে, বাছুর যদি সব দুধ খেয়ে নেয়
বেচারা গোয়ালার ব্যবসা তো লাটে উঠবে।

দুই. কল সেন্টারের সকল কল নকল নয়।

তিন. শোনা যায়
আইনের হাত অনেক লম্বা,
কিন্তু কত লম্বা তা কখনো কেউ
মেপে দেখেছে বলে মনে হয় না।

চার. পদার্থের যে তিন অবস্থা—কঠিন, তরল ও
গ্যাসীয়, এ-কথাটা অপদার্থদের
কিছুতেই বোঝানো গেল না।

পাঁচ. গালে টোল পড়েছে দেখছি,
টোলে পড়েছ নাকি?

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

ঘুম

সুবীর মজুমদার

পাশ ফিরলে বদল হয় দেওয়াল
চিৎ হলে বুকে কাটাকুটি দুই হাত
হাত ধরলে নীল আলো হলুদ গন্ধ
স্বপ্ন আসলে হলুদ গন্ধ
স্বপ্ন আসলে নষ্ট ইহকাল।

পাশ ফিরলে বদল হয় জলবায়ু
চিৎ হলে নেমে আসে আকাশ
হাত ধরলে সরীসৃপ ঠাণ্ডা
স্বপ্নে আসে ইচ্ছে সুখের ঝাঁপ।

পাশ ফিরলে কে যেন ডাকে
চিৎ হলে কমে আসে পালস রেট
হাত ধরলে নিভে যায় আলো
স্বপ্ন নিয়ে কিছু বলা যাবে না,
ঘুম পাচ্ছে...।

এক দুই

অভিরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুজন বাউল দুজন মুর্শেদ
এক লহমায় কাঙাল হওয়া
ক্ষত হওয়ায় গভীর যে দেশ
মানুষ বোঝায় ভেদ।

দুজন বাউল দুজন মুর্শেদ
কাঙাল হলেও এক যে ছিল
ভালোই ছিল বেশ
প্রবাসপুরে পাঠায় বেহেড
বানিয়ে ব্যর্থ শেড
তাতেই ঢালে ডাই অক্সাইড
কাঁদছে এ স্বদেশ।

ত্রিশ সেকেন্ড

যশোধরা রায়চৌধুরী

হারিয়ে যাওয়া কুকুরছানার মতন যারা করুণ ছিলে
তারাই আবার গর্জে ওঠ বাঘের মত, সুযোগ দিলে

টিপিন বাক্সো গুছিয়ে রাখা এটাই দিনের মুখ্য কর্ম
বাকিটা ত এলেবেলে। পরচর্চাই মোক্ষ, ধর্ম!

ঝড় নেবেছে কপাট বেয়ে রাত্রি জুড়ে জার্নি ফোঁপায়
তারাই আবার শান্ত হয়ে সকালে ক্লিপ গুঁজবে খোঁপায়

অসংখ্য সব ফাটল দিয়ে কাল দেখালো দাঁতের পাটি
হাস্যমুখে সেলফি তোলে, সাত চড়ে আজ নেই কথাটি

ভয় পাব না ভয় পাব না ভয় মানে শিরদাঁড়ার অসুখ
এখন শুধুই স্থির থাকাটাই শিখছি আমি, বন্ধ হাঁ মুখ!

সকালে বাস। টিকিট গুঁজে হাতঘড়িতে, চল কেরানি
সূর্য আনার দায়িত্ব নেই, সন্ধেবেলা মাংস আনি।

গলছে পাড়া গলছে জগৎ গলছে যাবৎ শিরদাঁড়ারা
ত্রাস গলে যাক। স্ট্রেস চলে যাক। হি হি হো হো দারুণ হাসি

ত্রিশ সেকেন্ডে রিল দেখেছি
তুচ্ছ হল মাথার খাঁড়া।

চটি

কালিদাস ভদ্র

চটির অপার লীলা
জানে আজ বাংলার মেয়ে

পরিবর্তনকামী সেইসব বুদ্ধিজীবী
শুধু চটিকে চাটতে শিখেছে
চেটে চেটে ক্ষমতার অলিন্দে
কামিনী-কাঞ্চনে ডুবুডুবু

কামদুনি, পার্ক স্ট্রিট, বগটুই
কিংবা গোরু, কয়লা, বালি
টেট উত্তীর্ণ ভাবী মানুষ গড়ার কারিগরদের
আরব্য রজনির মতো পাঁচশো রাত্রির
অজেয় চোখের জল
সেইসব বুদ্ধিজীবীর
বরফ-চোখ দেখে না

এগিয়ে বাংলা
এগিয়ে বাংলার মেয়ে জানে চটি লীলাময়

সুতীব্র ঘৃণায় ছুঁড়ে দেয়
সটান জেলখাটা মহাসচিবের দিকে

পরিবর্তনকামী বুদ্ধিজীবীর পরিবর্তনকামী
অধুনা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী
চটি চেনে না

চটি চেনে মা মাটি মানুষ---

ব্যক্তিগত

উদয়ন ভট্টাচার্য

প্রখর গ্রীষ্মে উচ্চবর্ণের জন্য রাখা
পানীয় জল খেতে গিয়ে
প্রহারে মৃত্যু হলো ইন্দ্র মেঘওয়ালের
শাণিত ব্লেডে লাল হয়ে গেছে
আমাদের শ্বেতশুভ্র পোশাক।

কারা বলছে ক্রোধ ও বিদ্বেষ থেকে
আমাদের মুক্ত হতে হবে।

বিপদ আসে যায়

অমরেশ বিশ্বাস

বিপদ আসে বিপদ যায়
আলোর দিশা দেখা,
কোথায় গেলে পাব তারে
সরল হবে রেখা।
ওপরে ওরে পবন আসার
ঘূর্ণিঝড়ের পাশে,
রোদ ঝলমল হবেরে তায়
সূর্য ওঠার আশে।
এখন দেখা চারিদিকে
অতিমারির ঢেউ,
মনে রখো সেই সুযোগে
স্বজন হারায় কেউ।
দোষ কারও না দিলেও
দোষ তো সবার জানা,
ফাঁকির ফাঁদে পড়ে যে তাই
দেয় সুযোগে হানা।

অভিসার

খগেশ্বর দাস

কাঁপা কাঁপা প্রদীপ শিখার মত ফতনা নড়ে লবণাক্ত জলে
হেঁতাল বনের অবৈধ জোয়ারে কুয়াশার ছায়া থরথর
জলতলের কালো আঁধার কোথায় লুকোবো
দুপুরের রোদে বনের সবুজে মায়াজাল
ঢেউয়ের অবৈধ ইচ্ছে ছুঁয়ে ফেলে বিরহী মনের উচাটন।

আমি পাতার ভীরুতা জানি
আর জানি অভিমানী মনের নিভৃত ছায়ার অবগুণ্ঠন
কম্পনের মোহিনী প্রহরে
রাতজাগা তুমুল অবৈধ বৃষ্টিপাত
নিরানন্দ বাঁশবনে ছায়ার আড়ালে আঁধারের নিবিড় মগ্নতা।

রাতের জ্যোস্নাকে নিরপেক্ষ ভেবে প্লাবিত আলোয় হৃদয় খুলেছি
ভুলের বহু দীর্ঘ রাতজাগা আলোর জমাট গোপন অভিমান
জানি না কত নিরপেক্ষ স্মৃতির অভিপ্রায়ে গুপ্ত পথে রাত্রি অভিসার
আলোড়িত নদীর অথৈ জলপথ শুনশান আঁধারের নীরবতা ভাঙে।

শালগ্রাম শিলা

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা দীর্ঘ ছায়া এগিয়ে চলে সামনে
মানুষটা তখনও যায় নি
সে সুখ ভোগ করছে জীবনের আরাম কেদারায়।

সুখ ভোগ করতে করতে একসময়
মানুষটাও অসুখে পড়ে যায় আচম্বিতে।

মানুষ পাথর হলে আর কাঁদে না
শাকান্ন বা পরমান্ন সবই অর্থহীন হয়ে যায়।

পাথরের কান আছে
হাওয়ার ফিসফিসানি শুনতে পায়
পাথরেরও শক্ত বুক আছে
স্রোতের ধাক্কা সামলায় অক্লেশে অবহেলায়।

কিন্তু মানুষটা পাথর হলে
শালগ্রাম শিলাও লজ্জায় মুখ লুকোয়
ফুল-বেলপাতা আর চন্দনের আড়ালে!

গল্প

হারানো নাকফুল

নলিনী বেরা

গ্রামের মধ্যে আমাদের বাখুলটাই ছিল সবচেয়ে বড়। একদিকে নদী আরেকদিকে ঘনঘোর জঙ্গল, মাঝখানে আমার জন্মভূমি গ্রাম, জন্মভিটা। বাবা-কাকাদের ঘর। বাবা-কাকাদের মা, আর আমার মা-কাকিরা। বর্ষায় যখন নদীর দুকুল ছেপে হড়কা বান আসত, ধড়াস ধড়াস করে নদীর "কাতা" ভাঙত, নদীধারের গ্রামের লোকেরা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে গবাদি পশুপাখি নিয়ে উঠে যেত ইস্কুল ডাঙায়, তখন আমাদের গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর একেবারে বাইরে এসে পড়ত, রীতিমতো "আউট সাইডার" "আউট সাইডার"। অঝোরঝর বর্ষণ, খড়ের চাল ভেদ করে মেঝেয় পড়ছে অবিরাম। মা-কাকিরা গিনা-বাটি-তাটিয়া পেতে রেখেছেন জলের ধারা বরাবর। জলে-বাটিতে টুং টাং আওয়াজ, বাজছে জলতরঙ্গ। দড়ির খাটিয়ার উপর বাবা কাকাদের মা। মুখে অবিরাম বলেই চলেছেন, বলেই চলেছেন—"যা না রে বিজু, গোবরগাদায় লাঙলটা পুঁতে আয়!' তাঁর ছোট ছেলে বিজয় ল্যাংটো হয়ে হালের লাঙলটা গোবরগাদায় পুঁতে এলে তবেই না বৃষ্টি থাকবে। ছোটকাকা বিজয়চন্দ্র তখন কোথায়। এর তার বাড়ি গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন "ওপারে তুমি শ্যাম এপারে আমি, মাঝে নদী বহে রে...।' আমরা জনাকয়েক "ল্যাঙটাভুটুঙ সাধের কুটুম" ঘিরে ধরে আছি বাবা-কাকাদের মাকে, আমাদের ঠাকুরমাকে। একেকটা বাজ পড়ার আওয়াজ আর বৃষ্টিপাতের ধরন দেখে মনে হত এ বৃষ্টি আর কখনও থামবে না, আর কয়েক ঘণ্টার ভিতরে প্রলয়ে লয় পেয়ে যাবে পৃথিবী। ভয়ে আতঙ্কে আরো বেশি বেশি করে জড়িয়ে ধরতাম বাবা-কাকাদের মাকে। বাবা-কাকাদের মা, ওড়িশার বাসড়ার অঞ্জনাসুন্দরী, ততক্ষণে "কহিনী" বলতে শুরু করেছেন — সেই গুড়গুড়িয়া, সেই বেঁটে-বাটকুল, সেই ঘোড়ার ল্যাজে সর্ষের পুঁটলি বাঁধা......। সে কাহিনীও সহজে থামত না। গ্রাম তো গ্রাম, আশপাশে যে আর কারোর ঘর আছে, বাখুল আছে সেকথা মনেই হত না, মনেই থাকত না। এমন এমন যে গ্রাম, "আউট সাইডার" সে-গ্রামে একটা "গঁগা" বাটভিখারি এলেও রীতিমতো হুল্লোড় পড়ে যেত। লাল আলখাল্লা গায়ে, কাঁধে একটা এক-রং-য়েরই বিপুলকায় ঝুলি, কথা নেই বার্তা নেই, মুখে শুধুই একটানা সেই "গ" আওয়াজ। সেই আওয়াজ শুনেই দৌড়ে এসেছেন মা-কাকিরা, পিছনে পিছনে ভিড় করেছে "ল্যাঙটাভুটুঙ সাধের কুটুমরা, আর গঁগা বাবাজির ঝুলিতে একটানা প্যালা পড়ে চলেছে চালটা আলুটা মুলোটা। এ গ্রামে কেউ তো আসে না, কেউই না—এমন এমন যে গ্রাম সে-গ্রামে কী করে যে একদিন এল "রবিন হুড"। আমার নাইন পাস ছোটকাকা বইটা লুকিয়েচুরিয়ে কখনও আম গাছের ডালে কখনও "বিড়াগাদার" আড়ালে কখনও মাটির দোতলার ছাদে বসে পড়তে লাগলেন। কত লোক যে হাতে রোলকরা দরখাস্তের ফর্দ কাগজ নিয়ে কাকার কাছে লেখাতে এসে ফিরে গেলেন। আমার তখন থ্রী কী ফোর। কদিন বাদেই দেখলাম—ছোটকাকা বই ছেড়ে বাঁশের তীর ধনুক বানিয়ে মাঝুডুবকার

জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ততদিনে "রবিন হুড" পড়ে আমিও "লিটল জন"। তার আগে অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার "বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র" কিছুটা "রামায়ণ" আর কিছুটা 'মহাভারত'। "আগে রাম মধ্যে সীতা পিছনে লক্ষ্মণ মহাবীর। তিনজনে হইলেন পুরীর বাহির।" কিংবা, 'আলো জ্বালি দেখ এবে যাজ্ঞসেনী সতী। তোমা হিংসি কীচকের এতেক দুর্গতি।" এছাড়া বই বলতে থ্রি ফোরের "কিশলয়" সেই "আম্রজাতক", "অবাক জলপান", "রাজার অসুখ", কণ্বমুনির আশ্রম, তাত কণ্ব কিসা গৌতমী .... সেই "সারি সারি তাল তমাল... বটপাতার ভেলা ... তবে হ্যাঁ, কে বিভূতিভূষণ কে অবনীন্দ্রনাথ — জানতাম না, লেখাগুলি বারবার পড়তাম, বারবার। কী সুন্দর লেখা। পড়তে পড়তে কখন যেন মুখস্থ হয়ে যেত, পড়া ধরলেই গড় গড় করে মুখস্থ বলতাম।

২

আমাদের বাখুলে একসঙ্গে গাদাগাদি করে জনা তিরিশেক ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছিলাম। আমরা সাত ভাইবোন, তবে ছ'ভাই এক বোন চম্পা নই, তিন ভাই আর চার বোন। বোন তো নয়, সব দিদি। বড়পুঁটি, রজনী, সুবোধ আর মুনকুদি। মেজোকাকার দুই ছেলে আর চার মেয়ে। শ্রীমন্ত, হেমন্ত, কামারদি ভট-অ নই আর কঁই। এতদ্ব্যতীতও আছে কারণ, আমার বাবা-কাকারাও পাঁচ ভাই, দুই বোন। আমাদের বাবা-কাকাদের যা আছে আছে, তদুপরি তাদের দুই বোনের অর্থাৎ আমাদের দুই পিসিমারও অতিরিক্ত জনা ছয়েক ছিল। আমরা একত্রে একান্নবর্তী হয়েই বড় হচ্ছিলাম। আমাদের খামারে বেড়ার গায়ে লতানো ঘি-কুমারীর ফল থেকে ঝুনো হয়ে ফেটে পড়লে খামারময় পাখি ওড়ার মতো ছড়িয়ে পড়ত তুলো। সেই তুলো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ধরার জন্য "ন্যাঙটাভুটুঙ সাধের কুটুমদের" আঙিনামায় যখন দাপাদাপি তুঙ্গে চলছিল, তখন, ঠিক তখনই আমাদের মেজোকাকা কোনো এক বছরে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই স্মিত হাস্যে ঘোষণা করে দিলেন—তাঁর সেজো মেয়ে "নই" অর্থাৎ নয়নতারার বিয়ের বন্দোবস্ত পাকা। সঙ্গে সঙ্গে বাবা-কাকাদের মা, আমাদের মা-কাকিরা কাকাকে ঘিরে ধরে আদি-অন্ত সব বৃত্তান্তই জানতে চাইলেন। কাকা একে একে সব কিছুই খুলে বললেন। 'বয়স? তা, বয়স একটু বেশিই। তা হোক, তবে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক, প্রায় জমিদার। পাত্রের নাম "গান্ধী"।' গান্ধী? পাত্রের নাম শুনে আমি তো চমকে উঠলাম, এ কোন গান্ধী? ততদিনে পড়ে ফেলেছি কী না 'কে ঐ চলে বিপুল দলে গান্ধী মহারাজ। উদার ধীর অতি গভীর চোখে পলক নাই।' মুসাবনীর গান্ধীর সঙ্গে আমাদের মেজোকাকার জমি নিয়ে কদিন জোর বাদ-বিসম্বাদ চলল। মেজো কাকার একটাই গোঁ 'আগে ভূমিদান তারপরে কন্যাদান।' অগত্যা 'নই'-য়ের নামে দশ বিঘা ধানী জমি তড়িঘড়ি রেজিস্ট্রিকৃতও হয়ে গেল। জমি রেজিস্ট্রি হল বটে, কিন্তু 'নই'-য়ের সঙ্গে গান্ধীর বিবাহ কিছুতেই দেখা গেল না। কারণ, তার আগেই বিবাহেচ্ছুক বৃদ্ধোপম গান্ধী আচমকা ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন পরলোকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন আমাদের মা-কাকিরা, আমাদের খামারটাও ফের ঘি-কুমারীর উড়ন্ত তুলো ধরতে চ্যাঙনা-ম্যাঙনায় ভরে উঠল। এতদত্ত্বেও আমাদের মেজোকাকার কপালের ভাঁজ কিন্তু গেল না ঐ যে 'নই' য়ের নামে রেজিস্ট্রিকৃত দশ বিঘা ধানী জমি। তার কী হবে? তাই নিয়েই কাকার অঝোরঝর ভাবনা, অঝোরঝর ভাবনা।

ক'দিন তো মেজোকাকা কোবরেজি ছেড়ে বিহার-মুসাবনী করে বেড়ালেন। কাজের কাজ কিসসু হল না, কিসুস না, গান্ধীর আগের পক্ষের সন্তানাদি উল্টে জমির আলের উপরে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী"। বাবা কাকাদের মা, আমাদের মা-কাকিরাও শেষমেষ 'না' করে দিলেন মেজোকাকাকে। আমাদের দশাসই মেজোকাকাও মাটির দাওয়ায় ধপাস করে বসে পড়ে ফুৎকারে সবকিছুই উড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "যানে দো!" "যেতে দাও"—বললেই কী সবকিছু চলে যায়। কেন জানি না গান্ধীর প্রতি একটা অশ্রদ্ধা তখন থেকেই মনে মনে জমা হচ্ছিল।

৩

আমার জেঠতুতো দাদা সতীশচন্দ্রই আমাদের গ্রামের বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেকেন্ড টিচার'। তাঁর বালিশের তলা থেকেই একদিন পেয়ে গেলাম চার বন্ধু চতুর্দ্বীপ"। কে যে লেখক এখন ঠিক মনে নেই, তবে কিছুদিন মনে মনেই ছিল। আসলে বইয়ের পাতায় চিত্রসহ মুদ্রিত গল্পগুলির চেয়ে আমাদের গ্রামে গ্রামের আশপাশে, বিলে বাতানে, বনে-জঙ্গলে, টাঁড়ে-টিকরে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন জ্যান্ত গল্প তৈরি হচ্ছিল যা বইয়ের পাতায় কল্পিত গল্পগুলির চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিল না। আমাদের বাখুলে 'নই'-য়ের না হোক, রমানাথ কাকার বড় ছেলে সন্তোষের একদিন বিয়ে হয়ে গেল বেশ ঘটা করেই। তার দু এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই কুলটিকরীর হাট থেকে শিকে বাহুকের একদিকে ক'আঁটি কলমিশাক আরেকদিকে পুঁটলিতে বাঁধা "জীবন যৌবন" বইটি নিয়ে বেশ মউজে হেলতে দুলতে বাড়ি ফিরলেন সন্তোষদা। আর তারপর থেকে বেশ ক'মাস ঐ বই নিয়েই গ্রামজুড়ে টানা-হিঁচড়ান, গুজগুজ ফুসফুস, গুঞ্জন, গান- 'এ ব্যাথা কী যে ব্যথা বুঝে কি আনজনে'। সত্যরঞ্জনের (ডাকনাম টুম্পা) বড় বউদি একদিন আমার সামনে আমারই নিত্য সহচর ন্যাঙটাভুটুঙ সত্যরঞ্জনের ঐ ঐ জিনিসটা নেড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'কী গো দেওর, রস যে গড়িয়ে পড়ছে।' ততদিনে শুরু হয়ে গেছে আমাদের দুজনেরই অ্যাডোলেসেন্স, আর গরুবাগাল সত্যরঞ্জনের না হোক আমার পি. কে. দে সরকার। পি. কে. দে সরকারের ট্রানশ্লেসান তো ট্রানশ্লেসান, এহ বাহ্য, আমার সাহিত্যপাঠ। ঐ যে বাংলায় একেকটা অনুচ্ছেদ, নিম্নে ইংরাজিতে অনুবাদ — ইংরাজি যেমন তেমন, ঐ বাংলাটা। বাংলার ঐ টুকরো টাকরাই ঘা মেরে যেত আমার অন্তরে, মোক্ষম ঘা। নাড়িয়ে দিত "সত্যরঞ্জনের ঐ ঐ জিনিসটা নয়, আমার অন্তর ব্রহ্মাণ্ড, ভিতরের কলকব্জা। কী অসাধারণ কথাংশ"—একদিন সে তাহারই মতো একজন দরিদ্রকে কাছে পাইয়া বলিল, "বাপু, তোমরা এখানে খাও কি করিয়া?" সে বলিল, "চাকরি করিয়া খাটিয়া খাই। কলিকাতায় রোজগারের ভাবনা কি?' বা, "রমণী কহিল, "শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" অর্ধরাত্রে ঝটিকা নিবারিত হইলে যুবক কহিলেন, "আপনারা এখানে কিছুকাল সাহসে ভর করিয়া থাকুন। আমি একটা প্রদীপ সংগ্রহের জন্য নিকটবর্তী গ্রামে যাই।" কিংবা, অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি যাব।" আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম- 'পাগল হয়েছ ভাই'। ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। অথবা, রাণী কথাটি শুনিয়া অপুদের বাড়ি আসিল। অপুকে বলিল হাঁ রে অপু, তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবি? সত্যি ?' বা, "সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, কি চাও?"

সে বলিয়া উঠিল, 'আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই সুড়ঙ্গ হইতে/ অন্ধকার হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, মুক্তি চাই, আকাশ চাই।" কিংবা সেইটা, "হে ভারত, ভুলিও না নীচ জোতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ...... উত্তেজনায় উত্তেজনায় অনুবাদ করতাম' **Hail– India, do not forget that...**" উত্তেজিত হয়ে একটার জায়গায় বসিয়ে দিতাম দুটো **'Hail Hail– India...'** কোন গল্প বা উপন্যাসের অংশ, লেখক কে কিছুই জানতাম না। মুদ্রিত অংশটুকু-ই বার বার পড়তাম, বার বার। মন ছট্‌ফট করত কখন কবে যে "সমগ্র'টা পড়তে পারব। লাউদহ গ্রামের পুলিন পৈড়া, আমাদের স্কুলের ইংরাজির স্যার, ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত সদা হাস্যময়, ক্লাসে ইংরাজি পড়াতে এসেই আমার হাফ-হাতা জামার বুকের বোতামগুলি গলাঅব্দি পটাপট বন্ধ করে দিয়ে ততদিনে বলতে শুরু করেছেন, **'Just like Gandhi'** ফের গান্ধী। এতদিনে অবশ্য বুঝে গেছি-এ গান্ধী মুসাবনির বিয়েপাগলা গান্ধী তো নন, বাপুজী গান্ধীজী। এতদিনে জানাও হয়ে গেছে "আমার জীবনই আমার বাণী" ইংরাজীতে **Essay** লিখতে গিয়ে কতবার যে কোট করেছি **'My life is my message'– said Gandhiji!** ততদিনে মন থেকে গান্ধীর প্রতি আমার অশ্রদ্ধাটাও উধাও। উধাও, উধাও।

৪

আমাদের বাখুলের পুবদিকে বিভূতিদের বাড়ি; তাদের খাটাল ও "পোআনশালা" পেরুলেই ওদিকে দক্ষিনসোলের সোঁতা। জ্ঞানকাকার ধানবিল। বাঁয়ে বিভূতিদের পুকুর আর পাতকুয়া। আমাদের বাঁশঝাড়। তলায় গোবরগানা। এমত গম্য-অগম্য স্থানে সংঘটিত দুটি জিনিস আমাকে যারপরনাই নাড়া দিত, আমার নাবালক হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠত। এক, যখন বাঁশঝাড়ের ভিতর দেখা দিত কচি কচি বাঁশকরোল বা বাঁশপোঙড়া। দুই, বর্ষাকালে যখন গোবরগাদার ভিতর থেকে ভুস ভুস করে লাগাতার বেরিয়ে আসত শালুই পোকা"। পোকা কী আর ডানাওয়ালা পেটমোটা বড় বড় সব লাল পিঁপড়া। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, আর ওদিকে ভুস ভুসকরে "শালুই পোকা বেরুচ্ছে ত বেরুচ্ছে। আমাদের খলা-খামার ফের ন্যাঙটাভুটুঙ সাধের কুটুমে" ভরে উঠবে না? আমরা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে উড্ডুক শালুই পোকা ধরছি আর হ্যাজাক লাইটের কাচের মতো পিঁপড়ার ফিনফিনে ডানা ধরতে না ধরতেই খসে পড়ছে। ঝরে পড়ছে। আমরা দ্বিগুণ, চর্তগুণ উৎসাহে মুঠো মুঠো ডানাবিহীন শালুইপোকা ধরে এনে ঠেকা পাছিয়ায় জড়ো করছি। এসব কাজে বাবা-কাকাদের মা, আমাদের মা কাকীদের উদ্দীপনাটাই বেশি। বালির খলায় শালুই পোকা ভেজে চালভাজার সঙ্গে তারাও খেতেন আমাদেরও খাওয়াতেন। আমার কানে এখনও বাজছে, বাবা-কাকাদের মা হাত পেতে মাকে বলছেন, "আর নাই বড় বউমা? থাকলে চাট্টি শালুই ভাজাই দাও। কুড়ুর মুড়ুর খাই।" বলেই ফোগলা দাঁতে হাসি, তখন তার বিরানব্বই কী তিরানব্বই। বাঁশঝাড় বাশকরোল ফুটেছে, রাতভিত গুরা সাঁওতালের "ঘুসুর" এসে তেড়ে দিচ্ছে, মচমচ আওয়াজ। নিদ্রাহীন বাবা-কাকাদের মা শুনতে পেয়ে চেঁচাচ্ছেন, "যা না রে অরু, যা না রে বিষ্ণু ঘুসুর এসে সব যে খেয়ে ফেলল রে।" কোথায় তখন মেজোকাকা

অরুণ, কোথায় বা ছোটকাকা বিজয় সব ত ঘুমে অচেতন, কাদা। লাঠি হাতে ঠকঠক করে নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন আমাদের বাবা-কাকাদের মা, “শালার ঘুসুর কোন দিকে রে, কোনদিকে?” এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খামারেই লাঠি ঠুকছেন, ‘যা, পালা।’ এ কী আর উদ্‌বিড়াল, কী পাম-কটাশ —কটাশ যে হুট-হাট করলেই দৌড়ে পালাবে। গুরা সাঁওতালের রীতিমত হাঁড়িয়া—খাওয়া শুত্তর, যেমনি এক বগ্‌গা তেমনি জেদী। পরের দিন সকালে আমরা “ন্যাঙটাভুটুঙ সাধের কুটুমরাই” ছিন্নভিন্ন শুওরের অ-খাদ্য বাঁশকরোল ভাঙা কুড়িয়ে আনতাম, মা-কাকীরা উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে হাঁড়িতে জল ঢেলে মকাইয়ের মতো বাঁশকরোল সেদ্ধ করতেন। তারপর তো মাংসের মসলা মিশিয়ে সেদ্ধ বাঁশকরোলের তরকারি। ঘর ত ঘর, গোটা বাখুল গন্ধে ম ম করে উঠবে না? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাবা-কাকাদের মা হলুদ ছোপ ধরা ডান হাতের তালু জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে মা—কাকীদের কাছে আব্দার করছেন, ‘আর নাই বউমা? থাকলে আর টুকচার দাও না!’ দু টুকরো বাঁশকোরলের মাংস গামলায় ঢেলে দিতে দিতে কপট রাগ দেখিয়ে মা-কাকীরাও বলছেন, “রাত জেগে ঘুসুর খেদিয়েছেন বলে সবটাই খেতে হবে মা?” রাগ হচ্ছে তবু ছেড়ে যেতে পারছেন না, খেতে খেতে নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়ে বলছেন, “আমি কী তাই বলেছি বউমা?” সহসা মেজো কাকা ঘরে ঢুকলে ঘরময় চুপ, আর টু-শব্দ নেই। মা-কাকীদের দুরবস্থা ও বেগতিক দেখে আমরা চ্যাঙনা-ম্যান্ডনারা যারপরনাই হো হো করে হেসে উঠলাম, বিশেষ করে আমি। চোখ বড় বড় করে মা-কাকীরা ধমকাচ্ছেন, “তুই চুপ মার ললিন।” ক্রমাগত উদ্‌গত হাসি চাপতে কখনও কখনও এক দৌড়ে বাখুলের বাইরে দখিনসোলের সোঁতায় এসে পড়ি।

৫

আমাদের বাখুল, বাঁশঝাড়, বিভূতিদের পোআনশালা এসবের লাগোয়া পুবদিকেই তো দখিনসোলের সোঁতা। আমার জীবনে যেমন একটা নদী, একটা লাইব্রেরী তেমনি একটা দখিনসোলের সোঁতা। দক্ষিনসোলের সোঁতা, দখিনসোলের সোঁতা। যদিও সোল আর সোঁতা একই জিনিস, একটা নামেরই এ-পিঠ ও-পিঠ, তবু বর্ষায় যখন কদমডাঙা মাঝডুবকা—সুখজুড়ি - মহুলহুড়ির “ঝোপ” নোংরা—জবরা সমভিব্যাহারে হড়হড়িয়ে নেমে আসে দখিনসোলের সোঁতায়, তখন কী রাত কী দিন “মোচ্ছব” পড়ে যাবে না দখিনসোলের সোঁতায়? জ্ঞানকাকা শশীজেঠা মহাধর—বাঈধর সর্বেশ্বীদের ক্ষেতের ধানগুলি জলের তোড়ে মাথা নুইয়ে দেয়, আলের উপর দিয়ে ছলকে ছুটে আসে রূপালী জলধারা, জলপ্রপাত। জলের তোড়ে ভেসে আসে পুঁটি-দাঁড়িয়া চাঁদখুড়ি ধানাহুলু, খলবলিয়ে ওঠে চ্যাঙ-গড়ুই-তুড় মাগুর। ধুম পড়ে যেত ঘুনি পাটা এড়ে মাছ ধরার। শুধু কী মাছ, হলহলিয়া ঢোঁড়া টুরি কট্‌কটি কতরকম সাপ, কত রকম ব্যাঙ। থেকে থেকে হাঁক ওঠে পড়ে, ‘কুঠে গেলু রে বঙ্কিমো।’ ‘তোর পাটায় ঢোঁড়া ঢুকে সব মাছ খেয়ে গেলরে টঙ্কেশ্বর, খালি গোধুতের মতো ‘ঘুম আয় আয় শিগগির আয়।” হুলুম-ঝুলুম করে নেমে আসে ভুঁড়া শিয়াল, মুখে তুসো কালিমাখা। শুরু হয়ে যায় মাছ নিয়ে সাপে শিয়ালে কাড়াকাড়ি, হিসহিস আর থিক থিক আকাশে চাঁদ থাকলে, আকাশের চাঁদের দিকেই মুখ তুলে শালার ভুঁড়াশিয়াল তো বেমালুম নালিশ জানায়, “হু-উ-উ-উ। হু-উ-উ-উ।।” ঘুম ভেঙে যায়,

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

ঘুমভাঙা চোখে রাতভিত দক্ষিনসোলের সোঁতায় নেমে পড়ি। চারধারে ভুসোপড়া হেরিকেনের দপদপানি, আর কালো কালো ছায়ার ছোটাছুটি। দু-সেল তিন-সেল এমন কী পাঁচ-সেল টর্চের হঠাৎ হঠাৎ ঝলকানি। ধাঁধিয়ে দেয়, ধাঁধিয়ে দেয় চোখ-মুখ। তবু আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াই বিভূতিদের সেই যে সেই ভাদু গাছটাকে। অঝোরঝর অন্ধকার, কোনোকিছুই ঠিকমতো ঠাহর হয় না। গাছটা কী ভেসে গেল “ঝোপ”য়ের তোড়ে ? গাছটা গেল গেল, ভাদু গাছের ভূতটা? ও-ভূত তো বিভূতিদের পোষা। যখন সাদমডাঙার মাঠে ডাঙাকাঠীর ওদিকে ডিমের কুসুমের মতো সূর্যটা “বুড়ে” যায়, মাঠঘাট ডাহি-ডুঙোড় থেকে গবাদি পশুর পায়ে পায়ে রাঙা-ভাঙা রোদ এসে থেমে যায়, থমকে যায় গৃহস্থের গোহাল ঘরে, নাচদুয়ারে, তখন, ঠিক তখনই বিভূতির মা শাড়ির ভাঁজে প্রদীপ লুকিয়ে ভাদুতলায় উপস্থিত হয়, প্রদীপ জ্বালেন, ’ জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপ খানি’...। বৎসরান্তে ভাদুতলার ভূত একবারই, মাত্র একবারই যা বিভূতিদের ঘরে আসে। যখন দখিনসোলের মাঠঘাট থেকে কাটা ধান উঠে আসে গৃহস্থের খলায় খামারে, যখন ভাদুতলায় বিভূতিদের ধানবিল থেকেও এক আঁটি ধানগাছ বাদে সব ধানই উঠে আসে বিভূতিদের খলায়, তখন, ঠিক তখনই ক্ষেত থেকে “ঠাকুর” আনার অছিলায় ভাদুতলার ভূতকেই ঘরে নিয়ে আসে বিভূতিরা, নাকি বিভূতির মায়ের আষ্টে-পৃষ্ঠেই তখন বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে ভাদুগাছের ভূতটা! রাস্তায় ঘাটে, এমনকী বিভূতিদের বাড়ি গিয়েও শাড়ির ভাঁজে উকিঝুঁকি মেরে খুঁজে দেখেছি কোথায় কীভাবে বিভূতির মায়ের শরীরে লটকে থাকে তাদেরই পোষা ভাদু গাছের ভূতটা! বৃথা চেষ্টা! কোথায় ভূত? বিভূতির মায়ের দু’বাহুর মাঝখানে লটকে আছে শুধু একটা কালো তিল, কালো জল! নাকি ‘কালামুহী” ভূত?

দখিনসোলের সোঁতার মাঝ বরাবর বিভূতিদের ভাদু গাছটা। তলায় ডোবা। বর্ষা তো বর্ষা, ভাদুতলার ডোবায় জল থেকে যায় সম্বৎসর। অজস্র টুরটুরি ব্যাঙ জলের উপরে চোখ দুটি রেখে জলের ভিতরে পা ঝুলিয়ে ভেসে থাকে, সহসা কেউ এসে ঢিল না ছুঁড়ুক ডোবার জলে সামান্য উঁকি মারলেও ব্যাঙগুলি চকিতে কালের অতল তলে ডুব দেয় টুপুক করে। আর ওঠে না, আর ওঠে না। এমন এমন যে ডোবা সেই ডোবায় সেবার রূপার নাকফুলটা হারিয়ে ফেলল আমাদের গ্রামেরই প্রফুল্লর বোন চাঁপা। প্রফুল্ল পিঠে তিনটে চিড়িতন আঁকা বেগুনী রংয়ের ঝালর ঝুলিয়ে হাতে মোহন বাঁশি নিয়ে “বালক সঙ্গীত” যাত্রাপালায় কৃষ্ণ সাজত। কাজে কাজেই আমাদের ভিতর চাঁপার জন্য আলাদা একটা কদর ছিল। তাকে দেখলেই কেন জানি আমরা গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠতাম, “আজ কেন সই নিধু বনে। রাধাকৃষ্ণ একাসনে ।” এমন এমন যে রাধা, থুড়ি চাঁপা তারই রূপার নাকছাবিটা ভাদুতলার ডোবার জলে কী না হারিয়ে গেল। মাথা কাৎ, ডান কান প্রায় জলে ছুঁইয়ে ডান হাত পুরোপুরি জলের তলায় রেখে নাকছাবিটা খুঁজে চলেছে চাঁপা। ‘খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তাহারি।’ চারধারে বুক সমান অঝোরঝর ধান গাছ, ডোবায় নামলে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ডোবায় কী আছে ঐ তো কটা টুরটুরি ব্যাঙ, গেঁড়ি-গুগলি, একটা চ্যাঙ-গোড়ুই মাছ বড়জোর। “কী খুঁজছিস চাঁপা।” ‘তোকে বলব ক্যানে?’ ‘বলিস যদি ত আমিও খুঁজি—খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তাহারি...।’ বলা নেই কওয়া নেই হুড়মুড় করে নেমে পড়েছি জলে। অবিকল একই ভঙ্গিমা—সেই ডান হাত জলের তলায়, মাথা কাৎ, ডান কানের লতি প্রায়

ছুঁয়ে যাচ্ছে ডোবার জলতল, উছুক-ডুবুক। হাসতে হাসতে এবার চাঁপা, 'কী খুঁজছিস ললিন।' "তোকে বলব ক্যানে?" ফের হাসি। জলে ভেজা সপসপে শাড়ি নামমাত্র লটকে আছে চাঁপার ব্লাউজহীন বুকে, কী তার খুলে যাচ্ছে। বলল, "হায় হায় রে নাকফুলটা কখন নাক থেকে খুলে পড়ে গেল জলে।" "সোনার ?" "উ-হ, রূপার।' আমার তখন কেবলই মনে আসছে যাচ্ছে টুম্পার বড় বউদির সেদিনকার সেই "ডায়লগ্‌টা" সেই যে, আমারই সামনে আমারই নিত্য সহচর "ন্যাঙটাভুটুঙ" সত্যরঞ্জনের ঐ ঐ জিনিসটা নেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'কী গো দেওর, রস যে গড়িয়ে পড়ছে!' দু-চাট্টা টুরি ব্যাঙ ইত্যবসরে জলের ভিতর পা ঝুলিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে উপরে উঠে এল, ফের টুপুক করে নেমেও গেল জলে। বোধকরি দেখে গেল আমাদের। একটা গ্রুপ গেল, উপরে উঠে এল আরেকটা গ্রুপ। এ-ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চলতে থাকল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই চাঁপার, কিন্তু আমি ব্যাঙ তো ব্যাঙ সামান্য একটা ধান গাছ নড়ে উঠলেও শিউরে উঠছি কেউ যদি এসে পড়ে, যদি কেউ। যদিও ভাদুতলার এদিকে কেউ বড় একটা আসেও না। ভাদুতলার আশপাশে চাঁপাদের চাষের জমি আছে হয়ত সে জমিতে নিড়ানির কাজ করছিল চাঁপা, কোন ফাঁকে ডোবায় এসে হারিয়ে ফেলেছে তার নাকছাবিটা। দুজনেই খুঁজছি, হাতের মুঠোয় ছোট ছোট নুড়ি, বালির দানা, মায় একটা সেফটিপিনও উঠে এল, কিন্তু সেই, সেই জিনিসটা নেই। একবার যেন আড়চোখে আমাকে দেখল চাঁপা। ফুলে আছে নাকের পাটা, শূন্য গহ্বর, শূন্য শূন্য, নাকছাবিটা নেই। নেই, নেই। কী যে হয়ে গেল আমার, অত্যুৎসাহে মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহে "দেড় ইয়া"র মতো অস্ফুটে কী যেন একটা বলেও ফেললাম চাঁপাকে। চাঁপা একবারেই চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখল। পরক্ষণেই বলল, "বলে দেব মাউসীকে উ" "মাউসী" তার মানে দূর সম্পর্কে মাসি আমার মাকে। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল লাউ-বৈতালের ছায়াঘন মাচানতলা, ঝিঙা-কাঁকুড়ের জালিভরা লতাবিতান পাশেই ঘরের মুখটায় বসে থাকা, মুখে রাঙা-ভাঙা রোদ, আমার মা, মায়ের ঠোঁট দুটো কী এখনও নড়ছে? ধুতির খুঁটে-বাঁধা কটা পোকাপোকা বেগুন কাঁধে রাজুর পো অনন্ত দত্তকে কী এখনও বলছেন, 'ন্না ঠাকুরপো, ছেলেটা এখন লেখাপড়া করছে আরো কিছুদূর করুক তো?' টুরি ব্যাঙের মতো টুপ করে জলের ভিতর ডুব দিয়ে মুখ লুকোলাম। ফের যখন উঠলাম আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে চাঁপা! চেঁচিয়ে বলল, "কে তুই ?" উন্মাদ হয়ে গেল কী চাঁপা। আমাকেও চিনতে পারছে না, এ কী কথা। ধীরে ধীরে বললাম, "কেন, আমি তো ললিন।" ডোবার জল থেকে ছলকে উঠে পড়ল চাঁপা, আলের উপর একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'না, তুই ভাদুতলার ভূত।' বলেই দৌড়ুল, দৌড়ুল গ্রামের দিকে, ঘরের দিকে। সুনসান দুপুর, ডোবার ধারে ভাদুগাছটায় দু চাট্টা কাক ভদ্‌কাচ্ছে। আমি খানিক হতভম্বের মতো গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। শালার গাছ কী না আজ আমাকে "ভাদুতলার ভূত" বানিয়েছে। "আজ তোর একদিন কী আমার একদিন" বলেই জল থেকে উঠে ভূতগ্রস্তের মতো ঢিল তুলে আনসাটকা ছুঁড়ে মারলাম গাছটার দিকে, মারতে থাকলাম। কোথায় ভূত? দু-চাট্টা কাঁচা-পাকা পাতা যা খসে পড়ল টুকু করে।

আকন্দকেশরী

তাপস রায়

আকন্দকেশ্বরী-র দিকে টেনে আনা গেল। নবীন শহরের হয়ে ওঠার সৌন্দর্য আর হাই-রাইজারের পরাক্রমের বিভা দেখতে দেখতে দয়াময় যেন অনাবিল হয়ে উঠতে পারে। ধরিত্রী'র পাঠানো গাড়ি সাপুরজী-পালনজী বাস স্টপ থেকে ডান হাতের কাঁচা রাস্তার ভেতর ধুলো উড়িয়ে নেমে পড়েছে। অ্যাজবেস্টসের ছাদের এক কামরার একটা কুঠুরির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়ে ড্রাইভার বলল, "ভেতরে লোক আছে, আপনাকে সাইট দেখিয়ে দেবে।"

সপ্রতিভ বছর পঁচিশের শ্যাম যুবক সামন্তক সাহার কাছে খবর পৌঁছে গেছিল, পার্টি যাচ্ছে। ফলে সে চা-কফি অফার করেছে। আর সে অফার ঠেলেই আঁখি বুঝতে লেগেছে সামনের জলাশয় এড়িয়ে ধু ধু ধানখেত পর্যন্ত কোথায় কোথায় বাংলোগুলি হবে আর কোথায় টু বিএইচকে আর থ্রি বিএইচকে-র সাতখানি টাওয়ারের এই কমপ্লেক্স।

সামন্তক নামে ছেলেটি অনেক কিছুই বোঝাচ্ছিল তার পারদর্শিতার সবটুকু দিয়ে, হাতের মুদ্রায়। ফাঁকা জায়গায় প্রাসাদের হাওয়া চলাচলটুকুও যেন ফুটে উঠছে। কিন্তু আঁখির কানে সেসব ঢুকছে না, সে ঢুকতে দিচ্ছে না। তার হাওয়া চলাচল করছে দয়াময়ের মুখের উপরে। দয়াময়ও কিছু শুনছে না। সে দেখছে সিমেন্টের দু'ফুটের ব্লক দেয়াল আর লোহার বিমের রেডিমেড জঞ্জালের ভেতর কেমন করে তখনও গরু চরে বেড়ানো একখানি গ্রাম ধুকপুক করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। যেকোনো মার্জিনাল পেশেন্টের মতো তার মৃত্যুদিন স্থির হয়ে আছে। কিন্তু কী যেন সরল শ্যামলিমায় মায়াময় হয়ে আছে গ্রামখানি। দু'পাশ থেকে শহর তাকে ঘিরে মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে।

সামন্তক বলেছে প্রজেক্ট হ্যান্ডওভার হবে আড়াই বছরের ভেতর। আর দয়াময় চোখের উপর দেখতে পাচ্ছে আকন্দকেশরী গ্রামখানির নাম মুছে দিয়ে সাত টাওয়ার ঘেরা এই প্রজেক্টের মাথায় নিশান উড়ছে ধরিত্রী গ্রুপের। প্রাইমারি স্কুলে কালো স্লেটের উপর থেকে আগের ক্লাসে লেখা বাংলা ছড়া জল-ন্যাতায় মুছে দিয়ে অঙ্ক ক্লাসের জন্য তৈরি হত তারা, নামতা লিখবে। সেরকম মুছে দেয়া যেন।

আঁখিও মুছে নেয়াটা দেখছে। সেক্টর ফাইভের ঝাঁ চকচকে অফিসের লিফটে নামতে নামতে গল্প করছিল, তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাটটা করে উঠতে পারলে একটা নিশ্চিন্তি, তার বাবা-মাকে শেষ ক'টা দিন একটু ভালো রাখতে পারলে জীবন খানিক জুড়োয়। অবশ্য আঁখির সমস্ত কুশলতা এই কয়েকমাস ধরে ধাবিত হচ্ছে এই মুছে নেবার নিখুঁত ব্যবস্থাপনায়। দয়াময়ের মনের কোনো কোণেও যেন মলিনতা না থাকে। না হলে কেন এই বিশেষ দিনে নিজের ভালোলাগাকে চেপে রেখে শহরের বাইরে আর একটা শহরের হয়ে ওঠা দেখাতে নিয়ে এসেছো! আজ মহালয়া।

আঁখি জানে দয়াময় খুব সেন্সিটিভ। ছোটো ছোটো দুঃখে সে সহজে কাতর হয়। একদিন বাজার করতে গিয়ে মুরগি কাটার সময় তার মৃত্যু-চিৎকার শুনে সে এমন কষ্ট পেয়েছে, যে মাংস খাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে বাইরের খাবার খেতে হলে হলদিরাম সে প্রেফার করে,

সেখানে নিরামিশ খাবার। আজ এখানকার কাজ সেরে। 'অ্যাকাডেমির আর্ট গ্যালারিতে' প্রদর্শনী দেখে হলদিরামে বসবে কফি আর স্নাক্স নিয়ে।

প্রমোটারের পাঠানো গাড়ির ভেতর বসে আঁখি তার শরীরের আসঙ্গতা দিয়ে দয়াময়ের ভেতর থেকে সমস্ত বৈরিতা মুছে দিতে চাইছিল। কেন যে সে নিজের ক্লায়েন্ট-কাম বন্ধু গতিনাথকে শত্রু ঠাওরেছে! খানিক টাকা টাকা করা ছাড়া বেচারা গতিনাথের আর কোনো লোভ নেই। নির্ঝঞ্ঝাট গতিনাথের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার থাকদাড়ি। তার সুপুরুষ চেহারার জন্যই শুধু নয়, কী যেন এক ভালোলাগা দিয়ে গতিনাথ আঁখির মন জড়িয়ে নিয়েছে। কিন্তু তা প্রকাশ্যে আনার উপায় নেই। পাছে দয়াময় হাট হয়। দয়াময় যে অনেকদিনের বন্ধু।

আজ নিজের ভালোলাগাকে আড়াল করার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে এই বাধ্যবাধকতা আঁখিকে মানতেই হবে। নাহলে কবেই রেজিস্ট্রেশন করে ফেলে বারাসতের ফ্ল্যাট। সেখানেই সুবিধে আখিঁর। মসলন্দপুর থেকে বারাসত পর্যন্ত চ'লে আসাটা কোনো কম কথা নয়। বারাসত বেশ উন্নত হয়ে উঠেছে। অম্বুজা, বেঙ্গল পিয়ারলেস-এর ফ্ল্যাটগুলো সেখানে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সেখানে 'ধূত' গ্রুপের স্বপ্নের বাড়ি নামে একটা রেডি-বিল্ট ফ্ল্যাট পছন্দ হয়ে গেছে আঁখির। কিন্তু মাঝখানে এই দয়াময় কাঁটা, মানে ওই গতিনাথের সাথে বৈরিতা—কাঁটা ঢুকে পড়তেই যত গণ্ডগোল। নাহলে এই ধ্যাড়ধেড়ে গ্রামে সে আসতে যাবে কেন! এই আইওয়াশটা গতিনাথকে দয়াময়ের বৈরিতা থেকে বাঁচানোর জন্য যে জরুরি। সে বলতে পারবে, তোমার সাথে এত ফ্ল্যাট তো দেখলাম, কিন্তু দর-দামে না পোষালে কী করব বলো! নিরুপায় হয়ে নিতে হয়েছে বারাসতের ফ্ল্যাটটা। আঁখি ভেবে রেখেছে বারাসতে গৃহপ্রবেশে গতিনাথকে নেমন্তন্ন করবে না। কোথাও সন্দেহের কোনো জায়গা রাখা যাবে না।

সামন্তক খুব মিশুকে ছেলে। সে ম্যাডামের থেকে স্যারকে নিয়ে পড়েছে বেশি। —'ওই যে দেখছেন, ধানের পাতা লকলক করছে, ওই অত দূর পর্যন্ত আমাদের জায়গা। এই গ্রুপের মোটো হল, প্রতিটি রেসিডেন্টকেই গুরুত্ব দেয়া। বলতে পারেন যত্ন দেয়া। এজন্য টাওয়ারগুলির ভেতর এতখানি জায়গা ছেড়ে রাখা হবে যে সব দিকই লাগবে খোলামেলা। সাতটা টাওয়ারের প্রত্যেকটার পাশেই থাকবে ঢোকা বের হবার গেট। ক্লোজ সার্কিট টিভি। আর প্রত্যেকটাতেই প্রহরী।'

"আচ্ছা, এই জমির মালিক, আপনি যাকে বলছেন চাষি, সে যখন জমি বিক্রি করে তার মন খারাপ হয়নি? এই যে পরের বছর সে আর ধান ফলাতে পারবে না, তার যে কষ্ট হবে, তার কথা বলেনি?"

দয়াময়ের কথার উৎসের হদিস সামন্তক করতে পারে না। সে পাখি পড়ার মতো শেখানো কথা ম্যানেজমেন্ট পাশের কুশলতা নিয়ে সে বলে। "তার মন খারাপ করবে কেন, তাকেও তো একটা টাওয়ারে হাজার ফুটের দু'টো ফ্ল্যাট দেয়া হবে!"

দয়াময়ের চোখের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে চাষির বীজতলা তৈরি থেকে ধান তোলা পর্যন্ত প্রতিদিনের স্বপ্নের চলাফেরা। ওই যে গর্ভবর্তী ধানের গুচ্ছের গায়ে, যখন দুধ এসে খানিক বেদনায় ধান মাথা নুয়ে রাখে, তখন পরম মমতায় চাষি হাত বুলিয়ে দেয়। দয়াময় কেন শুনবে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

সামন্তকের সাজানো কথা। সে বিড় বিড় করে, " চাষির বউ তো আর ধান সেদ্ধ করবে না। ধান শুকোতে হবে না তার। নতুন চালের গুড়ো দিয়ে গোবোর-লেপা উঠোন সাজাতে পারবে না আলপনায় আর কোনোদিন। কত প্রাণ ধুকে ধুকে মরে যাবে, তাই না!"

সামন্তক তোতা পাখি। সে তার জানাটুকু উগরে দিয়ে কাস্টমারের নজর নিজের দিকে আনতে চায়। —"হ্যাঁ, তা যা বলেছেন স্যার। প্রথম দিন, মাঠের মাঝখানে ধান আর জঙ্গলের ভেতর যেদিন ভিত পুজো হল, পুরোহিতের সাথে জ্যোতিষীও এসেছিল। সে কীসব খড়ির দাগ কেটে বলে, এই জমিতে নাকি কোনো এক মৃত্যু যোগ আছে। এজন্যই তো কেউ এ-জমি কিনতে চায় না।"

এরপর সে হা হা করে হাসে। "জানেন তো স্যার, পরে শুনেছি, 'সিদ্ধা' গ্রুপ খুব ঝাঁপিয়েছিল এই জমিটার জন্য। পারেনি। আমাদের স্যারের মন্ত্রী মহলে জোরালো কানেকশন। সেই জোরেই বের করে নেয় একলপ্তে এতখানি জায়গা। সেই সিদ্ধা গ্রুপই জ্যোতিষীকে টাকা খাইয়ে পাঠিয়েছিল অমন ভয় দিতে। এই তো প্রায় তিন বছর আছি এই সাইট-এ। কই কোনো টুঁ তো শুনিনি। খুবই শান্ত আর শান্তির জায়গা এই আকন্দকেশরী'

দুই

"এটা কোনো মোটিভ হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারে না! আরে মশাই পুলিশ কত আর বিনা দোষে লোকজনকে হ্যারাস করবে! থানায়, জেলে আটকে রাখবে। পুলিশেরও এভিডেন্স দরকার হয়। চোখের সামনে জলজ্যান্ত লোকটা, আপনি বলবেন মারা গেছে!"

"হ্যাঁ গেছে। ওটা ডুপ্লিকেট গতিনাথ চক্কোত্তি। ওটা ওর ভাই হবে গিয়ে দেখুন। সাজানো, সাজানো, সব সাজানো থিয়েটারের সেটের মতো"

"দয়াময় বাবু, আপনি কী করে যে হাইকোর্টে প্রাকটিস করেন! মক্কেল-টক্কেল হয়?"

"আরে হয়, হয়। ওই গতিনাথই তো আমার মক্কেল ছিল। কলকাতা কর্পোরেশনে কাজ করে। আর খুব প্রভাবশালী। কর্পোরেশনে যান একডাকে সব্বাই চেনে ওই চক্কোত্তিকে। সবাই দেখিয়ে দেবে।"

"তালে আপনি বলছেন মারা গেছে।"

"হ্যাঁ, গ্যাছেই তো। সে নেই, কিন্তু আছে। সবাই দেখিয়ে দেবে পারচেজ সেকশন। দেখবেন, বৃটিশ পিরিয়ড থেকে জল ধুলো সয়ে সয়ে একখানা দীর্ঘ কাঠের কারুকাজ করা চেয়ার। মশাই আপনার মনেও হতে পারে সেটা ময়ূর সিংহাসন। তার হ্যান্ডেলে সাদা একখান তোয়ালে ঝুলছে। সামনে লাল ফিতের অজস্র ফাইল আর জলের লাল জাগ। না লাল নয়, আগে লাল ছিল, এখন নীল। আর মোটা কাচের গ্লাসের উপর হলুদ ঢাকনা। কর্পোরেশনের সবচে দামি বড়বাবুর ওই চেয়ার। কাজ কিচ্ছুটি আটকাবে না। পিয়ন সুরদাসের হাতে সাদা খামের ভেতর যথাযোগ্য সেলামী আর ফাইলের বিবরণ গোদা বাংলায় লিখে দিলে নির্দিষ্ট দিনক্ষণে ঠিক মেয়রের স্বাক্ষর সহ ফাইল আবার ফেরত পাওয়া যাবে।"

হেস্টিংস থানার মেজবাবু দয়াময় ব্যানার্জীকে হাইকোর্টের জাঁদরেল উকিল হিসেবে চেনেন বলে অনেক্ষণ বকোয়াস সহ্য করে নিয়েছেন। কিন্তু আর এই চাটাচাটি সহ্য হচ্ছিল না। উকিলের

অভিসন্ধির ফাঁদে পড়তে তিনি রাজি নন। একবার লেদার কমপ্লেক্স থানায় ফোন করে এই উকিলের এক পার্টিকে জামিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন চটপট। বিনিময়ে কিছুই পাননি। শুধু একদিন চায়না টাউন-এ সপরিবারে এক পয়সায় ডিনার করেছেন মাত্র। এবার গাত্রোত্থান করলেন তিনি।

কিন্তু দয়াময় তো জানে সেদিন রাতে গিয়েছিল গতিনাথের বাড়িতে থাকদাড়িতে, টাকা উদ্ধারের জন্য। বেশি দূরে না, করুণাময়ীর কাছে। আর ভোরবেলায় হাঁটতে হাঁটতে, কথা বলতে বলতে অল্প আলো-আঁধারিতে ভেড়ির পাড়ে ধস্তাধস্তি। টাল সামলাতে না পেরে ভেড়ির ভেতরে পড়ে গেল সে। তারপর বুড়বুড়ি। আর ওঠেনি। অফিসেও সে আসছে না বেশ কিছুদিন।

এদিকে গতিনাথ ভেবেছে, এবার সলভ করে নেবে নিজের কেস নিজে। আর কোনো উকিল নেবে না। উকিলের খপ্পরে পড়াটা সে হাড়ে হাড়ে বুঝছে। কিছুতেই দেনা শোধ হয় না যে! সে ঠিক করে, মাস ছয়েক উধাও হয়ে যাবে। ত্রিফলা আলোর কেসটায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অডিট ডাকছে। এই সময় তাকে উধাও হতে হবে। মাস ছয়েক চোখের সামনে না থাকলে সবাই ভুলে যাবে। এপ্রিলের অডিট শেষে আর কেউ মনে রাখবে না। এমনিতেই অফিসে তাকে কেউ বিশেষ দেখতে পায় না। ফলে চাপ নেই। সুরদাসকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে। ছ'মাসে তিনটের বেশি ফাইল ছাড়বে না। আর হিস্যা সুরদাস নিজেরটুকু নিয়ে বাকিটা যত্ন করে রেখে দেবে। গতিনাথ চক্কোত্তি অফিসে জয়েন করলেই যেন হাতে পায়।

গতিনাথ ঠিক করেছে, এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি মারবে। কর্পোরেশনের প্রতিটি খোপে খোপে অনেক পাখি মারার বিদ্যে। একুশ বছরের অভিজ্ঞতা তার, পারবে না! পারবে পারবে।

ত্রিফলার ফলা এড়ানো ছাড়া, আর একটা ছোটো কাজ তাকে পারতে হবে। দয়াময় ব্যানার্জীকে হাপিস করে দেবে। থাকদাড়ির কাছে বনবিবিতলার বাজারে তোলা তোলার সময় একদিন সে ফেঁসে গিয়েছিল। পুলিশ হাতেনাতে ধরেছিল। চাকরিটা চলে যেত, কর্পোরেশনের প্যানেল্ড ল-ইয়ার দয়াময় ব্যানার্জী জামিন করিয়ে এনে চাকরিটা বাঁচিয়ে দিয়েছিল। দয়াময়ের সাথে কথা হয়েছিল গতিনাথ একলাখ দেবে। কিন্তু সেটা দেবে দেবে করে হাজার, দু'হাজার করে দিয়ে এখনো আশি হাজার বাকি।

গতিনাথ ভেবেছে দয়াময়কে সাপটে দিলে আঁখির-ও একটা হিল্লে হয়ে যায়। আঁখি ওই দয়াময়ের জন্যই খোলামেলা মিশতে পারছে না তার সঙ্গে।

গতিনাথের বিয়াল্লিশ বছরের নির্জন জীবন বেশ তুখোড় চলেছে। একাকিত্ব কার ভালো লাগে? বিয়ে-ফিয়ে তার পোষায় না। করেওনি। বেশ আছে। কিন্তু এই কয়েক বছর কেন যেন আঁখিকে ভাল লাগছে তার। মানে অফিসে এসে আঁখিকে দেখতে পারলে কাজে মন বসে। ওটুকুই। আমি তার পারচেজেরই ক্লার্ক। অফিসে কম আসে। গতিনাথ সব সামলে নেয়। উর্ধতনের কানে কোনো কথা যায় না। গতিনাথ জানে আঁখির তার প্রতি একটা জোরালো দুর্বলতা আছে। কিন্তু আঁখি আবার কীভাবে যেন দয়াময়ের কাছের লোক। দয়াময়ের নাটক দলের জন্য বিজ্ঞাপন টিজ্ঞাপন জোগাড় করে দেয়। সে নিজে আঁখির কথায় তা জুটিয়ে দিয়েছে। মাঝে মধ্যে দয়াময়ের সাথে আঁখি

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

যে নাটক দেখতে যায় তা জানে গতিনাথ। কর্পোরেশনের কোপারেটিভের ক্লাবের নাটকে আঁখি নায়িকা। আর দয়াময়কে হায়ার করা হয়েছিল ডিরেকশনের জন্য। দয়াময় সূচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে গেছে। প্রতিবছর শুধু নাটকই পরিচালনা করে না, সে কর্পোরেশনের প্যানেলভুক্ত ল-ইয়ার হয়ে গেছে। যারা দীর্ঘদিন মোটা টাকার ট্যাক্স জমা না দিয়ে বসে আছে, তাদের হাইকোর্ট থেকে উকিলের চিঠি পাঠানো, কোনো লিটিগেশনে কোর্টে কেস কেমন করে উঠবে ঠিক করা, এসব তার কাজ। তবে অবশ্য আরো চার জন উকিল আছে লিগাল সেলের।

দয়াময়কে সরিয়ে দিলে অনেক হ্যাপা দূর হবে। ভেবেছে গতিনাথ। ওয়ান শটার কেনা আছে। কানের ভেতর ঠুসে দিয়ে ভেড়ির জলে ঠেলে দিলেই হল মর্নিং ওয়াকের সময়। আঁখির আর তার, দু'জনেরই পথের কাঁটা নিকেষ হবে। বাড়িতে ডিনারে নেমন্তন্ন করবে দয়াময়কে, ভাবল সে। গতিনাথ যেকোনো কাজেই একটু বেশি ডেয়ার ডেভিল।।

তিন

'হরিবোল ক্লাবের সদস্য হওয়ায় সুবিধে হয়েছে। চিমটে খবর পেতেই, ম্যাটাডোর, ফুলের মালা, কাতার দড়ি, কোদাল, মালসা, কোড়া কাপড়, এমনকি পুরোহিতও জুটিয়েছে। ক্লাবে এই কাজের কো-অর্ডিনেটর সো ক্লাবের নিজস্ব শববাহী গাড়ি আছে। দর দামের ব্যাপার নেই। কম্বো সাপ্লাইতে খানিকটা কম তো হয়ই। তাছাড়া ছিদাম এ ক্লাবের দীর্ঘ দিনের সদস্য। ওর রেট অনেক কম হবে। যতটুকু না হলে নয়। অবশ্য ছিদাম বলেই রেখেছে, বাবার কাজে কোনো কঞ্জুসি করবে না। আর এখন কঞ্জুসি করে হবে টা কি! নয় নয় করে ছাখানা প্রজেক্ট চলছে কলকাতার পিঠোপিঠে। সবচে বড় প্রজেক্ট সাত টাওয়ারের, আকন্দকেশরীতে।

এখন খানিক সুবিধে হয়েছে ছিদাম মন্ডলের। সোজা সুন্দরবন চলে গেলেও কলকাতার পিনকোড পেতে অসুবিধে নেই আর। দেখেছে কলকাতা নামটা থাকলে গ্রামের দিকের, বিশেষ করে বাংলাদেশের যারা এদিকে আত্মীয়তার সূত্রে সম্পত্তি করতে চাইছে, ফ্ল্যাট কিনতে তেমন আপত্তি করে না। সোনারপুর, রাজপুর, সুভাষগ্রাম — এখন সোনার জায়গা। ছিদামের নিজের লোক সব জায়গাতে ফিট করা আছে। প্ল্যান পাশ থেকে, ব্যাঙ্কলোন পাইয়ে দেয়া বা প্রিন্ট মিডিয়া কি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেয়া — সর্বত্র নিজের ডান হাত রেখেছে। মানে অন্তত তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে, সে-ই ডান হাত। আর হ্যাঁ, ছিদাম খুব সৌখিন। ফ্যাব ইন্ডিয়ার হালকা রংয়ের ফুল-স্লিভ জামা প্যান্টালুন্সের ব্লু জিনসের ভেতর ইন করে পরা থাকে। চোখে দামি রে-ব্যান কোম্পানির চশমা। গলায় টাই। আর পায়ে দামি কালো শু। একেবারে ঝা চকচকে অফিসের মতো রোজ জিমে যাওয়া মেদহীন পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির তামাটে শরীরকে সে ব্যবসার কাজে লাগায়। তবে ধরিত্রী গ্রুপ' নামটা গুরুদেব হারাধন চক্রবর্তীর দেয়া।

হ্যাঁ, হারাধনদা শিখিয়েছেন এই ব্যাবসায় সব সময় আগে দর্শনধারী, পরে গুণ বিচার। অ্যাপিয়ারেন্স দিয়ে খদ্দের তুলে নিতে হবে। তাইত সব সুবেশী, সুন্দরী মেয়েতে ফ্রন্ট ডেস্ক সেজে থাকে ঠান্ডা ঘরের অফিসগুলিতে। তবে সেক্টর ফাইভের 'ধরিত্রীর' এই অফিসের পিআরও যেন একটু বেশি সুন্দরী হয়ে গেছে। সিনেমা-সিরিয়ালের নায়িকাদের মতো মাপা চেহারার। ক্লায়েন্ট অফিসে ঢুকলেই কাত। ওই অফিস থেকে বুকিং না করে ফিরে গেছে এমন

কেস কম। মেয়েটাকে পেয়ে ব্যবসার সুবিধে যেমন হয়েছে, তেমনি অসুবিধেও। ছিদাম মন্ডলের বাকি দুটো অফিস, মানে চেতলা আর বারাসতে যাওয়া কিছুটা অনিয়মিত হয়ে গেছে। ব্যাবসা বাড়ানোর লক্ষ্যের পাশে রাগিনীর সান্নিধ্যও কেমন যেন অমোঘ হয়ে এসেছে এই বছর খানেক। এক একটা প্রোজেক্ট থেকে কম করেও ঘরে ওঠে কোটি খানেক। এর থেকে কিছু খাওয়াতে হয় দাদাদের। সে থাক। ঠেকা বে-ঠেকায় তারা যা মদত দেয়, তা এই সামান্য পার্সেন্টেজ দিয়ে মাপা যাবে না। পাড়ার ক্লাব, প্রায় হাতে তৈরি ক্লাব এই 'হরিবোল ক্লাব'কেও সে দিয়ে থাকে নানা অছিলায়। এই ক্লাবই তার লক্ষ্মী। ফুটো কাত্তিক থেকে আজকের বিএমডব্লিউ নিয়ে ঘোরা ছিদাম মণ্ডলের উত্থান একেবারে রূপকথার মতো। গত সাত বছরে তার "হরিবোল ক্লাব' যেমন টিনের চাল থেকে তিন-তলা হয়েছে। ক্যারাম বোর্ড সরিয়ে টেবল-টেনিস বোর্ড ঢুকেছে। তার কোচ আর সুন্দরী মায়েদের ভিড় প্রতি বছর বেড়েই চলেছে, তেমনি ছিদামের প্রোমোটারির পালেও লক্ষ্মীলাগা। পার্টির ছেলেরাই খবরাখবর দেয় জমির, পুরনো বাড়ির। ছিদামের কাজ একবার সাইট দেখে আসা। তারপর নিজস্ব উকিল আর লোকাল ছেলে পাঠিয়ে ডিল করা। একেবারে মাছের তেলে মাছ ভাজা হয় একাজে। ফাঁকা জায়গা দেখিয়েই পার্টির কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে জমি কেনাটেনা সব হয়। খুব কম কাজে নিজের মূলধন লাগাতে হয়েছে।

মূলধন বেড়েছে ছিদামের লক্ষ্মী এই 'হরিবোল ক্লাবে'রও। বছরে দু'লাখ টাকা সরকারের কাছ থেকে পায়। এছাড়া বিয়ে-বাড়ি, শ্রাদ্ধ-বাড়ি ভাড়া দিয়ে টাকা ওঠে হু হু করে। ক্লাব আর তার মাঠের সাজ হয় সেই টাকায়। দুর্গা পুজো করে কর্পোরেট বিজ্ঞাপন আদায় করেও প্রচুর টাকা আসে। আর আছে মৃতদেহর সাথে শশ্মানে যাওয়া। এটা একেবারে প্রফেশনাল কাজ। মানে শ্মশানবন্ধুর কাজ। মানে এই ক্লাব চাকরির প্রভিশনও রেখেছে। শ্মশানবন্ধুর চাকরি। মাস গেলে সাত হাজার টাকা। সিভিক ভলান্টিয়ারদের মতো। এরা সবাই ক্লাবের নানা কাজে লাগে। পুজোর সময় চাঁদা তুলতে বেরোয়, পুজোর দিনে ভিড় সামলায়। আর ভোটের সময় বুথ ম্যানেজ করে। পুজোর সময় বকশিস আর শ্মশান থেকে উপরি আদায় করে এরা বেশ চালিয়ে নেয় সংসার। তবে মাস গেলে ওই সাত হাজারের বেশি ক্লাব দেয় না। বারোটা ছেলে আছে। ক্লাবের খরচ মাসে চুরাশি হাজার আর গাড়ির তেল ইত্যাদি নিয়ে তা গিয়ে দাঁড়ায় লাখ দেড়েকে। কিন্তু 'হরিবোল' ক্লাব এক একটা পার্টির কাছ থেকে কম করে নেয় ওই লাখ খানেক। মাসে অনায়াসে গোটা পনেরো কেস হয়। হবে না কেন, লোকাল কেবল চ্যানেলে 'হরিবোল' ক্লাবের বিজ্ঞাপন যায় যে। মেট্রো স্টেশনে ইনগোড়া টিভি রোজ তারস্বরে চেঁচাচ্ছে — হরিবোল, হরিবোল। আজকাল শহরের লোকজন কোনো হ্যাপা নিজেরা নিতে চায় না। বাড়িতে একজন গেস্ট এলেও তারা হোটেল থেকে রান্না করা ডিশ এনে পরিবেশন করে। তো খরচ টরচের পর হরিবোল ক্লাবের মাসে জমে সাড়ে তেরো লাখের মতো।

এখন নিজেকে একটু একা করতে গিয়ে ছিদাম নিজের ফ্লাটের বাইরে কদমগাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাবার মুখটা ক্রমে অস্পষ্ট হচ্ছে। বাবার গায়ে খুব অগুরু ছড়িয়েছে নিজের হাতেই। নাহলে বেড-সোর রুগীর ঘরে ঢোকাই যাচ্ছিল না। বাবার বুকের উপরে ফুলের মালা

জমে উঠতে উঠতে বুক-মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। শুধু চশমাটাই জেগে আছে। ফুল-চন্দন সহ আর সবই যেন গভীর ঘুমে।

নীচে নেমে কী যেন তার মনে হলো, হ্যাঁ একবার কি জানাবে রাগিনীকে বাবা মরে যাওয়ার ব্যাপারটা! জানানো উচিত হবে। সে তো প্রায় সব জানে মণ্ডল পরিবারের। গত মাসে ডুয়ার্সের মূর্তি ট্যুরিস্ট লজে গিয়ে এ ওর শরীরের কিছুই জানতে যেমন অবশিষ্ট রাখেনি, তেমনি ছিদাম মন্ডল নিজের পরিবারের খুঁটি-নাটি সব গল্প করেছে। নাহলে আর করবেইবা কি দু'দিন ধরে জানিয়েছিল। এই অসুস্থ্য বাবার কথাও জানিয়েছিল। আজ বাবা মরে যাওয়ায় যতটুকু দুঃখ হয়েছে তা শেয়ার করে ছিদাম পরিত্রাণ পেতে চাইল। জানাল সে।

স্যার, কী বলছেন! হোয়াট আ স্যাড নিউজ! আ হা হা! আপনি তো একেবারে একা হয়ে গেলেন! মানে না, মানে বলছিলাম, যে আই থিংক উ হ্যাভ নো রেলেশনশিপ উইথ ইওর ওয়াইফ। মানে আপনার ছেলে থাকে জলপাইগুড়ির এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোস্টেলে, আর এদিকে আপনি আর বৌদি। তো বৌদির সাথে তো আপনার সদ্ভাব নেই। থাকতে হয় তাই থাকা। মানে আপনি তো নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন। আ হা হা হা! খুবই কষ্ট আপনার!' এক লপ্তে অনেকখানি বলে ফেলল রাগিনী। সে একটু আগেই 'আকন্দকেশরী'-র সাইট-এ একটা খদ্দের পাঠিয়েছে। কি যেন নাম, মনে পড়েছে। চোখে হাত দিয়ে মনে করল আঁখি মজুমদার। ওনার সাথে ল-ইয়ার ভদ্রলোকের নাম দয়াময় ব্যানার্জী। প্রথম চোটেই ল-ইয়ার নিয়ে এসেছে মানে পাটি একপ্রকার মনস্থির করে নিয়েছে, 'আকন্দকেশরী'তে ফ্ল্যাট নেবে। সে খবর জানানোর জন্য রাগিনী নিজেই ফোন করত বস ছিদাম মন্ডলকে। আর তার পরে বলত, মহালয়ার দিন, একটু আগেই বাড়ি ফিরব স্যার। কিন্তু সেসব তো এখন আর বলতে পারল না।

ছিদাম এখন খানিকটা তো ভেঙে পড়েছেই। কিছু কথা বলতে তো হয়ই, নাহলে সে কেন তার কর্মচারীকে বাবার মৃত্যুর খবর জানাবে। তাই খানিকটা নিজেকে সামলে নেবার ঢঙে বলল, " হ্যাঁ, কাউকে তো জানাতে হয় মনোকষ্ট, আপনাকে জানিয়ে ফেললাম। আর আপনিও অফিসের সবাইকে জানাতে পারবেন। আমি তো আজ অফিস যেতে পারব না।'

"স্যার, আপনি শান্ত থাকুন। আমি এক্ষুনি আসছি আপনাদের বাড়িতে।"

"না না। তার কোনো প্রয়োজন হবে না।" ঐ ডাকসাইট-এ সুন্দরী এলে শুধু নিজের স্ত্রী কেন, ফ্লাটের অন্য প্রতিবেশীর ভেতরেও গুঞ্জন শুরু হয়ে যাবে। মণ্ডলবাবুর সাথে ওর স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কারণ খুঁজতে থাকবে।— 'না স্যার। এসময় আপনার পাশে কেউ তো একজন সমব্যথী দাঁড়াবে না কি! আপনি না বলবেন না। আমি আসছি। আপনি এক কথায় আমাকে টালিগঞ্জের ভাড়া বাড়ি থেকে তুলে এনে জোকার অমন হাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট বিনা পয়সায় দিয়ে দিলেন! আর আমি এটুকু করব না! আপনার বারণ আমি শুনব না স্যার।"

ছিদাম হা হা করে উঠল। এ তো এসে একেবারে কেলো করে দেবে। পাড়ায় এখন তার যথেষ্ট প্রভাব হয়েছে। মেয়র পারিষদ তাকে খুব স্নেহ করেন। তিনিও আসতে পারেন। কথা হয়েছে দু'হাজার কুড়ির কর্পোরেশন ইলেকশনে কাউন্সিলরের টিকিট পাওয়া যাবে। এখন কোনো নারী

কেসে ফেঁসে গেলে তো বিপদ। সুপ্রিমের কানে চলে গেলে টিকিট তো দূরের কথা টাইট দিয়ে ছেড়ে দেবে। ছিদাম শ্যাম ও কূল রাখার বিড়ম্বনার ভেতর মাথা ঠান্ডা রেখে গেমটা খেলল।

ঠান্ডা গলায় বলল, "আচ্ছা আসুন। আমাদের তো শবযাত্রা স্টার্ট করতে যাচ্ছে। অফিসের গাড়িতে সেক্টর ফাইভ থেকে এখানে আসতে খানিকটা সময় লাগবে। তো আপনি সোজা কেওড়াতলা শশ্মানে চলে আসুন। ওখানে আমার বাবাকে ফুল-টুলও দিতে পারবেন।"

"আচ্ছা স্যার, তাই হবে। আমি সোজা কেওড়াতলায় আসছি। আপনার বেয়ারা গোবিন্দকেও সঙ্গে নেব? লেকমার্কেট থেকে ফুল কিনতে হবে তো!"

"না না। সে ড্রাইভারকে দিয়ে কিনিয়ে নেবেন। লোকজন বাড়িয়ে কাজ নেই।"

ছিদামের মনে পড়ল এসময় হরেণদার কথা। হরেণ-দার স্ত্রী বিয়োগের সময় মৃতদেহ কাঁধে করে গাড়িতে তোলা থেকে শুরু করে, কেওড়াতলা মহাশ্মশানের ইলেক্ট্রিক চুল্লিতে পোড়ানোর জন্য এক নম্বর লাইন ম্যানেজ করা টরা সব নিজে করেছিল। বার্ণিংঘাট থেকে সার্টিফিকেট তোলা-টোলা সব একার হাতে। হরেণদার চোখে তো পড়বেই। হরেণদার চোখে কেন, হরেণদার মনে ঢুকে যেতে ছিদাম 'হরিবোল' ক্লাবের সাথীদের নিয়ে গলার শিরা ফুলিয়েছে তখন, "জোরসে বলো, সবাই বলো, আবার বলো—হরিবোল।"

স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতেন হরেণ বাড়ুজ্যে। সে অত অল্প বয়সে চলে যেতে তিনি তো কাতর হবেনই। আর তার শেষ যাত্রাকে ছিদাম নিজের শুরুর যাত্রা করে নিতে পারল। সব পারলৌকিক কর্ম বাড়ির বড় ছেলের মতো দায়িত্ব নিয়ে করে দিয়েছিল। ছিদামের মনে হলো রাগিনী-ও হয়ত সেই একই দায়িত্ববোধ থেকে তার বাবার মরদেহ আর তার পাশে দাঁড়াতে চাইছে একটিবার। আসুক, আসুক। শশ্মানে আসুক। কিন্তু সমস্যা হলো রাগিনী কেওড়াতলায় পৌঁছানোর আগেই তো সেখানে তাদের পৌঁছাতে হবে। ছিদাম ফোন করল চিমটেকে। জানতে হবে শববাহী গাড়ি কোথায়।

চিমটে বলল, "গুরু, তুমি এদিকে মোটেও মাথা দিয়ো না। আমরা তৈরি। গাড়ি তোমার বাড়ির দিকে যাচ্ছে। আত্মীয় স্বজন যারা বাড়িতে আসছেন, তুমি তাদের দিকে নজর দাও। আমরা 'হরিবোল' ক্লাবের মেম্বাররা ঠিক মেসোমশাইকে ফার্স্ট চান্সে পুড়িয়ে দেব। বাইক নিয়ে ছেলেরা চলে গেছে। পুরোহিত, ডোম, ধরার কাপড়-চোপর তুমি শশ্মানে গিয়ে একদম রেডি পাবে। এমনকি মেশোমশাইকে যাতে লাইনে শুয়ে থাকতে না হয়, তার জন্য ক্লাবের একজন সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকবে সেখানে। মেশোমাশাইয়ের লাশ গেলে ও লাইন ছেড়ে উঠে আসবে।"

ছিদাম জানে অন্যান্যদের মতো সব তৈরি থাকবে। এই ক'বছরে এরা তুখোড় প্রফেশনাল হয়েছে। কোথাও কোনো ফাঁক-ফোঁকর থাকবে না। এই শবযাত্রার ম্যানেজমেন্টটা ডিল করে চিমটে। ও সবার চাইতে সিনিয়র। ছিদাম জানে এতক্ষণে চিমটে সবটা গুছিয়ে করে ফেলেছে। ও খুব চটপটে। সবটা নজরে নেয়। কারা শ্মশানে গাঁজা খাবে, তাদের জন্য গাঁজা রাখবে। কয়েকটা বড় হুস্কির বোতল কেনা হবে। আর 'হরিবল' ক্লাবের ছেলেদের জন্য ঢালাও বাংলা মালের ব্যবস্থা থাকবেই। কেনা হবে মাটির ভাড়। তাতেই মদ পরিবেশন হবে। পাড়ার কেউকেটা

যদি যায়, তাদের জন্য থাকে স্কচের একটা বোতল। দরকার নাহলে খোলা হয় না। হরেণদাও নিজের গাড়িতে চেপে যেতে পারেন। আপ্যায়নে তো ফাঁক রাখা যায় না, ওরাও রাখে না। চিমটে বেশ অনেকগুলো বছর ছিদাম মণ্ডলকে কাছ থেকে দেখেছে। মানুষটার দিলও দরাজ আছে। তাছাড়া 'হরিবোল' ক্লাবের কম্বো প্যাকের ভেতর এসব আইটেম পড়েই। মানে শশ্মানে মরা মানুষটা আর তার পরিবারের দু'একজন যাবে, বাকি সব কিছুর দায়ভার 'হরিবোল" ক্লাবের। কোথাও কোনো ত্রুটি রাখা যাবে না। ক্লাবের রেপুটেশনের সাথে কোনো সমঝোতা নয়।।

চার

না না কোনো সমঝোতা হবে না। রাগিনী ফোন নামিয়ে রেখে হাত ব্যাগ উপুড় করে দিল টেবিলের উপর। বুক ধকধক করছে। আসল জিনিসটা আছে তো! সেটা সঙ্গে না থাকলে তো এত তাড়াতাড়ি পড়ে পাওয়া সুযোগটা কাজে লাগাতে পারবে না। সবে মাত্র রেজিস্ট্রেশন হয়েছে জোকা মেট্রো কারশেডের কাছে বহুতলে বারোশ স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট। রেজিস্ট্রেশনের টাকাও দিয়েছে ছিদাম মণ্ডল। মানে তার বস। 'মূর্তি' ট্যুরিস্ট লজ থেকে ফেরার পর পরই হয়েছে তা। রাগিনী কৃতার্থ। অন্যান্যদের মতো তা না না করে সময় কাটায়নি। বা আর একটা আউটিং এর জন্য চাপ দেয়নি। খুব কথার মানুষ এই ছিদাম মণ্ডলকে তার ভালো লেগেছে। রাগিনীর এই অফিসও ভালোও লেগে গেছিল। কীরকম যেন কর্তৃত্ব করত। সবাই ম্যাডাম বলতে অজ্ঞান। ব্যাবসাও ভালই দিয়েছে। স্যালারিও ঠিকঠাক ছিল। মাসে পঁচিশ হাজার। কিন্তু তার কাছে নতুন পার্টির খবর এসেছে। নতুন কাজ। এই প্রোমোটারটা গুজরাতি। কলকাতায় কম আসে। মুম্বাইতে বসে ব্যবসা চালায়। এখানে রিয়েল এস্টেটএ টাকা ঢালছে সে। স্কাইওয়াক থাকবে তার প্রোজেক্টে। রাগিনী নিজের ক্যারিয়ার সি ভি আর পোর্ট-ফোলিওর একটা প্রেজেন্টেশন ই-মেল-এ পাঠিয়ে দিয়েছে। খবর এসেছে রাগিনী সিলেক্টেড। বস ভিডিও কলে সময় করে কথা বলে নিলেই এপয়েন্টমেন্ট লেটার এসে যাবে। অফিস হবে পার্কস্ট্রিটে।

রাগিনী চায় এবার সেটলডহতে। এবারের ফ্ল্যাটে সে থাকবে। ভাড়া দেবে না। কলকাতার মাথায় উঠে মর্নিং ওয়াক নয়, সে একদম চুড়োয় বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে পায়ের নীচে কলকাতা দেখবে। ছোটো বড়ো সব মানুষই সেখান থেকে সমান। গুড়ি গুড়ি, মূল্যহীন। চাইছে সে নিজে এটাতে থাকবে। সেটল হবার সময় এসে গেছে। দশটা ফ্ল্যাট তার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এই ন' নম্বরটি তার মানসিকতার সাথে স্যুট করবে। এর আগে জোটানো সাতটা ফ্ল্যাটের সব কটাতেই ভাড়া বসিয়ে দিয়েছে। শুধু এই ছিদাম মণ্ডলের দেয়া ফ্ল্যাট এখনো ভাড়া দেয়নি। সবে মাস খানেক হল পেয়েছে সেটা রাগিনী। সব চুকে-বুকে না গেলে ভাড়া দেবে কী করে!

অফিসের এস-ইউ-ভি তে উঠে ডায়েরির পাতায় সবুজ কালিতে লেখা ছিদাম মণ্ডল-এর গায়ে একটা টিক মারল। আট নম্বর। ন'নম্বর হাতে এসে গেছে। রাগিনীর নিজের উপর বিশ্বাস আছে দশ নম্বরও জুটিয়ে ফেলবে। ড্রাইভার রিয়ার ড্যু মিররে দেখছে ম্যাডামকে। দেখুক। চোখে রে ব্যান সানগ্লাস। চোখ দেখতে পারছে না। রাগিনীও দেখছে আয়নায় মাঝে মধ্যেই ফুস করে

ভেসে উঠছে একটা শব্দ — প্রতিশোধ। প্রতিবারই এই বিশেষ কাজের আগে রাগিনী ওই শব্দটি ফুটে উঠতে দেখেছে হয় আয়নায়, নয় সাদা দেয়ালে।

হাত ব্যাগের একেবারে তলায় চলে যাওয়া হোমিওপ্যাথির ওষুধের শিশি। গায়ে স্টিকার সাঁটা ন্যাস্ট্রাম ফস ৩০। রাগিনী জানে এর ভেতর আছে ধুতুরার বীজের রস। এক ফোঁটাতেই কাজ হয়ে যায়।

চেতলাব্রিজ এ ওঠার আগে বাঁদিকে ঘুরেই গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। ড্রাইভার বলল, "ম্যাম ক্যাওড়াতলা শ্মশান এসে গ্যাছে, নামুন।" মৃতদেহ চুল্লির লাইনে চলে গেছে। চুল্লিতে ঢোকার আগে যেসব পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করতে হয়, পুরোহিত তা শুরু করেছে। একমাত্র ছেলে, ছিদামকে তো সামনে থাকতে হয়। সে বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে পারছে না। উঠে উঠে চলে আসছে বাইরে। গাছতলায় ক্লাবের ছেলেরা আছে, তাদের সাথে কথা বলছে। এবার পুর-ভোটে নমিনেশন পাবেই। একশ শতাংশ কনফার্ম। ছিদাম জনসংযোগ করছে। প্রত্যেকের কাছে গিয়ে কথা বলছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট দিচ্ছে। সুদৃশ্য বড় বড় মাটির ভাড়ে হুইস্কি পরিবেশন শুরু করে দিয়েছে চিমটে। বেশ লম্বাটে গড়ন। দু-পেগ আরামসে এঁটে যায়। ছিদামের হাতেও একটা ধরা আছে। এক সিপ দিয়েছে কি দেয়নি, তার চোখে পড়ল অফিসের গাড়ি বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়েছে। তাহলে রাগিনী এসে গেল বোধ হয়। এত লোকের মাঝে ওকে আনাটা কি ঠিক হবে! ছিদাম পা চালিয়ে গাড়ির দরজার মুখে।

"আরে আসুন, আসুন। আপনি আবার এতটা কষ্ট করতে গেলেন কেন!" রাগিনীকে কোনো কথা বলতে না দিয়েই ছিদাম বলল, "বাবার শরীর চুল্লিতে ঢুকে যাবার মুখে। ড্রাইভার ভাই, আপনি এক ছুটে গিয়ে এই ফুলের তোড়া ওখানে দিয়ে আসুন তো। ম্যাডাম যেতে যেতে দেরী হয়ে যাবে।"

ছিদাম দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে এমন যে গাড়ি থেকে রাগিনী নামতে পারছে না। ড্রাইভারকে সরিয়ে দিয়ে ছিদাম এবার বলল, "তুমি এই শশ্মানে, নোংড়া-টোংরার মধ্যে আসতে গেলে কেন!"

ছিদাম এটা করে মাঝে-মধ্যে। মানে একেবারে ম্যানেজ করার জন্য আপনি থেকে তুমিতে চলে যায়। উল্টোদিকের মানুষ খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

"না, আপনার বাবা চলে গেলেন, এই দুঃখের সময় আপনার পাশে না দাঁড়ালে মনকে তো বোঝাতে পারতাম না! আপনি তো শুধু আমার বস নন, আমার মনের কতটা যে জুড়ে বসে আছেন! একটু যাব না, একবার শেষ চোখের দেখাটা দেখব না!"

রাগিনী গাড়ি থেকে নেমে পড়তে চাইলে সমব্যস্ত ছিদাম বলে ওঠে, না না দরকার নেই। এতখানি দূরে এসেছ। মেয়েমানুষ হয়ে ওখানে আজেবাজে লোকের মাঝখানে যাওয়া শোভা পায় না। তা ছাড়া ওরকম মৃতদেহ দেখা যায় নাকি! ভয় টয় পাবে। ওখানে যেয়ে আর কাজ নেই।"

নিজের হাতে ধরা মাটির ভাড়ের দিকে চোখ পড়ে ছিদামের। " তুমি কি একটু ড্রিংক নেবে? নাও নাও। নিতে হয়। তুমি গাড়ির ভেতর বস। আমি নিয়ে আসছি। তুমি বরংচ আমার হাতের

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

এই ধরো। আমার নতুন একটা নিতে সুবিধা হবে।" এ একেবারে মেঘ না চাইতে জল। অবশ্য আগের সাতবারও কোনো অসুবিধা হয়নি রাগিনীর। কোনো না কোনো সুযোগ এসে গেছে। সময় তো লাগবে কয়েকটা মুহূর্ত। গাড়িতে আসতে আসতে ব্যাগের উপরেই গুছিয়ে রেখেছিল। ন্যাট্রাম ফস্কের কাচের শিশিতে ধুতুরা বীজের রস। এক ফোঁটা যথেষ্ট। রাগিনী দুফোঁটা দিল। সে জানে ছিদাম জিম-টিম করে। হাট একেবারে তরতাজা। হুইস্কির সাথে এই ধুতুরার বিষ গেলে নাকি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হবেই। নেট ঘেঁটে সে দেখেছে। আর প্রমাণ তো হাতে নাতে আগের কেসগুলোর সফলতা। রাগিনী গাড়ির ভেতর বসেই ছিদামের ভাড়ের সাথে ঠোকাঠুকি করে বলল, "চিয়ারস।"

ছিদামও চিয়ার্স বলতে বলতে চো চো মেরে দিল ভাড়ের সবটা। তার তাড়া আছে। ডাক পড়েছে মুখাগ্নির। গাড়ির দরোজা নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে সে বলল, "ড্রাইভার সাহেব, ম্যামকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আপনি অফিসে গাড়ি পার্ক করবেন।"

গাড়ি হু হু করে ছুটে চলেছে জোকার দিকে। রাগিনীর মাথা পেছনে সিটের সাথে হেলান। তার কালো চশমার নীচ থেকে দুটো জলের ধারা নামছে। ড্রাইভার আয়নায় চোখ রেখে ভেবেছে ম্যাডাম খুব নরম মনের মানুষ। বসের বাবার মৃত্যুতে সমব্যাথী হয়ে অফিসের আর কেউই তো শশ্মানে আসেনি। আর এখন কাঁদতে লেগেছে ম্যাম। রাগিনী জানে এই অশ্রু সে নিজে নিজে বের করেনি। বের হয়েছে। ছিদাম লোকটা খারাপ নয়। কিন্তু সে যে নিজেকে থামাতে পারছে না। সেই চোদ্দ বছর বয়স থেকে এক প্রতিশোধ মন্ত্র তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমগাছের ডালে বাবার ঝুলন্ত দেহ যে চোখ না বুজেও সে দেখে চলে অনবরত।

চোদ্দ বছর বয়সে নাগেরবাজারে নিজেদের বাড়ির পেছনের বাগানে প্রমোটার আর তার নয় সাকরেদ মিলে তাকে ধর্ষণ করেছিল। বাবা জমি ছাড়েনি বলে নাকি তারা শোধ তুলেছে অমন। বাবা নিজের উপর ঘৃণায় গলায় দড়ি দিয়েছিল। রাগিনী কি আর করতে পারত! সেও আত্মহত্যা করতে পারত। সবাই তাই করে। কিন্তু একটা প্রতিশোধ মন্ত্র তাকে বাঁচিয়ে রেখে, ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এতদিন। বাবার মুখাগ্নি করে সে যে উচ্চারণ করেছিল, দশ প্রোমোটার হত্যাই তার জীবনের ব্রত।

পাঁচ

জীবন যে কোথা থেকে কোথায় গড়িয়ে যায়! গত তিন মাস গতিনাথ অফিসে আসে না। এই তিন মাসে আঁখির কি খুব একটা দরকার হয়েছে গতিনাথকে! না, হয়নি। কখনো হলদিরামে বসে ভাবছে। অফিসে নিজের কাজ গড়গড়িয়ে গড়িয়ে গেছে, গতিনাথের হেল্প ছাড়াই। সত্যি কথা বলতে দয়াময়ের সাথে এই কটা মাস তো দিব্যি অফিস ফেরত ঘোরাঘুরি করেছে। গতিনাথ কোথায়! গতিনাথ যেন মুছে যাচ্ছে মন থেকে!

'আকন্দকেশরীর' সাইট দেখে ফেরার পর এক্সাইডের হলদিরামের দোকানে বসে কফি খেতে খেতে আঁখির মনে হল, 'আকন্দকেশরী' বেশ ভাল জায়গা। সেখানে সত্যি সত্যি ফ্ল্যাট নিলে মন্দ হয় না। শুধুমুদু গতিনাথের জন্য এই সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক নয়। আঁখির মনে হলে দয়াময়েরও ভালো লেগেছে 'আকন্দকেশরী'।

আঁখি জিজ্ঞেস করেই ফেলল, "কি গো তোমার ভাল লেগেছে 'আকন্দকেশরী' ?

দয়াময় কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে কাচের দেয়ালের ভেতর থেকে বাইরেটা দেখছিল। এক জোড়া মানুষ, স্বামী-স্ত্রী হবে, তখন থেকে হাত ধরাধরি করে রাস্তা পার হতে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। এক্সাইডের মোড়ে সব সময় তিন দিক দিয়ে গাড়ি আসে। এর ভেতর থেকে ম্যানেজ করে ওরা কিছুতেই পার হতে পারছে না। শহরের লোকেরা, তাদের অভ্যস্ততায় দ্রুতগামী গাড়ির ফাঁক-ফোকর দিয়ে দিব্য চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওরা যে শহরের পায়ে পা মেলাতে জানে না। দয়াময়ের মনে হল শহরের বাইরের মানুষ। পারছে না। একটু যাচ্ছে, আবার পিছিয়ে আসছে। ভারী বিপদ তো ওদের! দয়াময় ভাবল, হাত ধরে পার করে দিয়ে আসবে না কি! কিন্তু হঠাৎ দেখল, এই সামনে পেছনে করতে করতে এক সময় হাত ছাড়িয়ে বউ মানুষটি অন্য পাড়ে চলে গেল। এ-পাড়ে পড়ে রইল ওর পুরুষ সঙ্গী। সে কি পার হতে পারবে! দয়াময়ের মুখ থেকে হাসি সরে গিয়ে অন্ধকার। দয়াময় দেখল, কীভাবে শহর ওই মানুষ দুজনের কাছ থেকে সারল্য মুছে নিল এক ঝটকায়! সম্পর্ক ছিঁড়ে দিল তবে!

"কী হল, কথা বলছ না! আকন্দকেশরী পছন্দ হয়েছে?'

দয়াময়ের কানে আঁখির কোনো কথা তেমন করে পৌঁছয়নি। সে ওই পুরুষ মানুষটির পক্ষ নিয়ে নিয়েছে তখন। একবুক নিঃশ্বাস বের করে হেরে যাওয়া মাথা নেড়েছে মাত্র।

তখন অল্প দূরে কেওড়াতলায় চিমটে আর 'হরিবোল' ক্লাবের দলবল, নিচু স্বরে ক্রমাগত বলে চলেছে, হরিবল—হরিবল—হরিবল। পাটকাঠির মুখাগ্নি নিয়ে নাকি ধরাধাম ছেড়ে উর্ধলোকে যাত্রা শুরু হয় মানুষের। এসময় কানে হরির নাম থাকলে স্বর্গ সুনিশ্চিত। আগুন হাতে যাত্রা শুরু করেছে ছিদাম। জ্বলন্ত পাটকাঠির আগুনের উপর তার চোখ। তাকে মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করতে হবে পুরোহিতের মন্ত্র কানে নিয়ে তারপর উপুড় করে রাখা বাবার মুখে অগ্নি সংযোগ করতে হবে।

পুরোহিত মন্ত্র পড়ছে,"ওঁ কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা। মৃত্যুকাল বশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতং। ধর্মাধর্ম-সমাযুক্তং ...।"

ছিদাম কেন যেন কানে আর কোনো মন্ত্র শুনতে পাচ্ছে না। এমনকি ওই সম্মিলিত নিচু স্বরের হরিবল হরিবল ধ্বনিও উধাও। তার পা কাঁপছে যেন। আর তো একটু। উত্তরমুখি করে অধোবদনে শোয়ানো আছে বাবা। পা নড়ছে না ছিদামের। ছিদামের হাত-পা লম্বা। হাত বাড়ালে কি সে বাবার মুখটা জ্বলন্ত পাটকাঠির আগায় পেয়ে যাবে! পাবে হয়ত। আর ভাবার সময় যেন নেই মনে হল তার। ছিদাম দু'ই হাত প্রসারিত করে, লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে উপুড় হয়ে দড়াম করে নিজেকে ফেলল মার্বেলে বাঁধানো শশ্মানভূমিতে। পাটকাঠির আগুন বাবার মুখ কি ছুঁতে পারল! কে জানে!

সামনে আড়াল

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী

এত খারাপ অবস্থার মধ্যেও আমাদের ছেলেমেয়েরা দু দুটো জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। গতকাল রাতে পুরস্কার দুটোর খবর এসেছে। এবার খুব তাড়াতাড়ি এই এ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। আমি তো স্যার খুব খুশী হয়েছি। আপনি কি প্রেসকে কিছু বলবেন? অমর আচার্য কথাগুলো বললেন সুমন্তকে।

— প্রেসকে আবার কি বলব? আপনিই বলে দিন। সুমন্ত রেজিস্ট্রারকে বললেন।

—স্যার! আপনি হচ্ছেন ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। প্রেস আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমি তো অনেক সময় বলেছি।—আমাকে আগের ডিরেক্টর স্যার এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকের দায়িত্বও দিয়েছেন। সেটাতো ফর্মালি আমাকে করতে হয়। কিন্তু এটা স্যার খুব ভাল একটা খবর। এখানে এতরকম ঘটনা ঘটছে—পজিটিভ নেগেটিভ সব ধরনের ঘটনা। এত ভাল একটা পুরস্কারের ঘটনা—একসঙ্গে দু দুজন—গত কয়েকবছর এই প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পায়নি। আন্তর্জাতিক সম্মান স্যার প্রায়ই কেউ না কেউ পাচ্ছে। কিন্তু জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার গুরুত্বই আলাদা। আপনি স্যার ছেলে মেয়ে দুটোর সঙ্গে কথা বলবেন?

— নিশ্চয়ই। ওরা কি এখনো ক্যাম্পাসে থাকে? পাস আউট করে যায়নি?

—হ্যাঁ স্যার। দুজনেই পাস আউট করে গেছে। একজন ব্যাঙ্গালোরে থাকে, আর একজন নৈনিতালে। তবে নৈনিতালের মেয়েটি এখন মুম্বাইতে কাজ করছে শুনছি।

—ওদের ফোন নম্বর আপনার কাছে আছে?

—এখানে অনেকের কাছে আছে। ও স্যার যোগাড় হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে। আপনি ফোন নম্বরগুলো দিন। ওদের সঙ্গে কথা বলার পর আমি মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলব।

—তাহলে স্যার আজ বিকালে মিডিয়াকে আসতে বলব?

চোখ দুটো বন্ধ করে কয়েকমুহূর্তে ভাবল সুমন্ত। তারপর বলল—বলুন। কিন্তু সবাইকে বলার দরকার নেই। একটা বা দুটো প্রিন্ট মিডিয়াকে বলবেন। আলাদা আলাদা সময় দেবেন। সরকারি মিডিয়াগুলো আর বেসরকারি অন্য সব মিডিয়ার জন্য ইংরাজী আর বাংলায় দুটো হ্যান্ড আউট বের হবে। পি আই বি মারফৎ সেই দুটো সব হাউসে ইমেলে পৌঁছে যাবে।

—ঠিক আছে স্যার। আমি আপনাকে দশ মিনিটের মধ্যে ওদের ফোন নম্বর দুটো পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর বিকেলের দিকে টাইমসের মেয়েটাকে আসতে বলছি। আর কাউকে বলছি না স্যার। প্রিন্ট মিডিয়ার জার্নালিস্টরা এসক্লুসিভ স্টোরি করতে চায়। ওই একজনই থাকুক। অন্যরাতো হ্যান্ড আউট পেয়েই যাবে।

—ঠিক আছে।

সুমন্তর মনে হচ্ছিল প্রায় প্রতি সপ্তাহ একটা ফাইলে তাকে সই করতেই হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সারাবছর বিভিন্ন রকমের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চলে। সেই ফেস্টিভ্যালগুলোর

অনেক জায়গায় মানিক রায়ের নামাঙ্কিত এই বিখ্যাত ফিল্ম স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের তৈরী করা ডিপ্লোমা ফিল্ম কি সর্ট ফিল্ম অথবা অ্যানিমেশন ফিল্ম পাঠানো হয়। সেখানে কখনো প্রতিযোগিতার জন্য কখনো স্রেফ প্রদর্শনের জন্য এই ফিল্মগুলো নির্বাচিত হয়। কোনো সময় ডিরেক্সন, কোনো সময় সিনেমাটোগ্রাফি, কখনো সাউন্ড এডিটিং কখনো এ্যানিমেশনের কাজ যারা করে—সেইসব ছাত্রছাত্রীদের এইসব উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অনেক সময় তাদের শিক্ষকেরাও আমন্ত্রিত হন। উৎসব কমিটিগুলি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে। যারা কিছুটা ধনী—সেই সব উৎসবকমিটি যাওয়া আসার বিমানের টিকিট বা বিমান ভাড়াও দিয়ে দেয়। ডিরেক্টরকে সেক্ষেত্রে শুধু অনুমতিটা দিতে হয়। আর যেসব ক্ষেত্রে বিমানভাড়া বা টিকিট পাওয়া যায় না সে সব ক্ষেত্রে যারা বিদেশের আমন্ত্রণ পেয়েছে তারা নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন জানায়। সেই টাকাটা মঞ্জুর করে এম আর এফটি আই-এর ডিরেক্টর। এটা প্রায় একটা রুটিন ব্যাপার। ফিল্মের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন এইসব আমন্ত্রণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কয়েকটা বিষয় দেখে নিয়ে ফাইলে অনুমোদন দেওয়াটা খুব সাধারণ স্বাভাবিক একটা ঘটনা। প্রতিবছর এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশজন স্টুডেন্ট এইভাবে বিদেশ যায়। সঙ্গে যায় তাদের টিচাররা। কোনো কোনো সময় এখানকার ডিরেক্টরেরাও বিদেশে এইসব ফেস্টিভালে যোগ দিতে গেছেন। মন্ত্রণালয় এই ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তো করেই না, উল্টে উৎসাহ দেয়। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দের একটা মোটা অংশ এইসব বিদেশভ্রমণের জন্য ধরা থাকে। সেই টাকায় কখনো কম পড়ে না। মধুসূদন দাদার ভাণ্ডারের মতো এখানে টাকার পরিমাণ কমে আসলেই আবার নতুন করে টাকা এই ফাণ্ডে ঢোকে।

ছাত্রছাত্রীদের একটা অংশ এইসব গ্ল্যামারাস বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পাওয়ার জন্য টিচারদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এটা অনেকটা গুরুমুখী বিদ্যা। কোথায় কিভাবে কোন ফেস্টিভ্যালের আমন্ত্রণ পাওয়া যাবে তা টিচাররা যতটা জানে ছাত্রছাত্রীরা প্রায় তার কিছুই জানে না। আনুগত্য ছাড়া স্টুডেন্টদের আর কিছুই দেবার নেই। টিচাররা কেউ কেউ এর সুযোগ নেয়। তারা বিশেষ করে ছাত্রীদের সঙ্গে খুব সহজে শারীরিক সম্পর্কে চলে যায়। ছাত্রদের ক্ষেত্রে শিক্ষকের জন্য বিভিন্ন রকম নেশার সামগ্রী যোগাড় করে দেওয়ার দায়িত্ব এসে পড়ে। কয়েকটি ক্ষেত্রে হোমো সেক্সুয়ালিটি অথবা লেসবিয়ান প্রবৃত্তির কথাও শোনা যায়। তবে এগুলি প্রমাণের বিশেষ কোনো সুযোগ নেই। কারণ যাদের অভিযোগ জানানোর কথা তারাই কমপ্রোমাইজ করে বসে আছে। হলিউড থেকে বলিউড থেকে টলিউড —সর্বত্র ফিল্ম ওয়ার্ল্ডে এইসবই চলে আসছে। শরীর সম্পর্কে কোনোরকম ছুঁৎমার্গ এখানে রাখলে এই জগতে থাকা অসম্ভব। সবাই এটা জানে।

প্রতিশ্রুতি মতো দুটো ফোন নম্বর হোয়াটস এ্যাপ করে পাঠিয়ে দিয়েছে রেজিষ্টার। তারপর জানিয়েছে আমি স্যার আপনার সঙ্গে কথা না বলেই টাইমসের রিপোর্টারকে আসার জন্য সময় দিয়ে দিয়েছি। উনি বলছিলেন বিকালের দিকে ওর অন্য একটা কাজ আছে। এখন এই দিকেই কোনো কাজে এসেছেন। উনি স্যার মিনিট দশেকের মধ্যে আপনার কাছে এসে পড়বেন।

—সেকি! আমার তো পুরস্কার প্রাপকদের সঙ্গে কোনো কথাই হয়নি।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

—তাতে কিছু হবে না স্যার। আমি কি আপনার ওখানে যাবো?

ইণ্টারভিউ-এর সময় আমি থাকতে পারি—যদি আপনি অনুমতি দেন। আমার সঙ্গে ম্যাডাম শ্রাবন্তীর ভাল রিলেশন আছে। ওকে আমি চিনি।

—ঠিক আছে। আপনি চলে আসুন। ওর সঙ্গেই ঘরে ঢুকুন। আপনি থাকলে তো ভালই হয়। আপনি তো এখানকার চিফ ভিজিল্যান্স অফিসারের সঙ্গে সঙ্গে চিফ পারসোন্যাল রিলেশনস অফিসারও। প্রেস তো আপনারই দেখার কথা।

— কি যে বলেন স্যার! ঠিক আছে, আসছি স্যার। আমি ম্যাডামকে নিয়ে আপনার ঘরে ঢুকবো।

—আচ্ছা। আসুন। বলে সুমন্ত সামনের ফাইলে মনোনিবেশ করলেন। এই ফাইলগুলো একটু পরেই সরিয়ে রাখতে হবে। এতে অনেক গোপনীয় এবং জটিল ব্যাপার আছে। বাইরের লোকের সামনে এইসব ফাইলের কথা জানাজানি হওয়াও ঠিক নয়।

দশ মিনিটের আগেই সুমন্তের পি এ ইন্টারকমে জানালো, স্যার ম্যাডাম শ্রাবন্তী দাশগুপ্ত—টাইমসের রিপোর্টার—আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বলছেন এ্যাপোয়েন্টমেন্ট আছে। সঙ্গে রেজিষ্ট্রারও আছেন। কি করব স্যার? আমার কাছে আপনার আজকের যে সিডিউল আছে তাতে ম্যাডামের এ্যাপোয়েন্টমেন্টের কোনো উল্লেখ নেই!

সুমন্তর মনে হলো তার পি এ ছেলেটি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণের সে ঘোর বিরোধী। সব কিছু তাকে আগাম জানাতে হবে নাকি! সে বলল—সঙ্গে রেজিষ্ট্রার আছেন তো!—আপনি ওদের দুজনকে ঠিক একমিনিট বাদে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিন।

তারপর সে কনফিডেনশিয়াল লেখা ফাইলগুলো দ্রুত গুটিয়ে ফেলে তার পায়ের কাছে বাকার্ডের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। সামনের দেওয়ালে লাগানো লুকিং গ্লাসে নিজেকে মুহূর্তের জন্য জরিপ করে নিল সুমন্ত। না, তাকে দেখতে খারাপ লাগছে না। তারপর টেবিলের ওপর একটা নিরীহ ফাইল খুলে যেদিকে তাকাতেই রেজিষ্ট্রারের গলা ভেসে এল—মে উই কাম ইন স্যার!

—ইয়েস। ভরাট গলায় বলল সুমন্ত। দেখল রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছে একজন মহিলা। বছর তিরিশের মতো বয়স। সে সামনে থাকা দুটো খালি চেয়ারের দিকে হাত দিয়ে নির্দেশ করল বসার জন্য।

মহিলাটি তাকে জরিপ করছিল। রেজিষ্ট্রার বললেন—স্যার, ইনি ম্যাডাম শ্রাবন্তী দাশগুপ্ত। টাইমসের হয়ে আমাদের এখানকার খবর ইনিই করেন।

সমুন্ত নমস্কার করলেন। তারপর বললেন—আপনার জন্য কি বলব? টি? কফি? নাকি কোল্ড ড্রিংকস!

—এনি থিং উইল ডু। ড. বোস—

সঙ্গে সঙ্গে জার্নালিস্টকে থামালেন সুমন্ত। আমি ডক্টরেট নই। আপনি মিষ্টার বোস বলতে পারেন। বললেন সুমন্ত। গবেষণার বিষয়ে তিনি খুব স্পর্শকাতর হয়ে আছেন। বহু বছর ধরে ভারতে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের স্বশাসন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন সুমন্ত। কোলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই একই বিষয় নিয়ে তিনি এম. ফিলও করেছিলেন। তার গাইড অধ্যাপক বঙ্গেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় হঠাৎ মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে গবেষণা শেষ করার সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর বিভাগে নতুন করে তার গাইড হবার জন্য অলিখিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কোনো গাইড আর নিতে রাজী হননি সুমন্ত। ফলে তার কয়েকবছরের সাধনার কোনো গতি হয়নি। গাইড ছাড়া গবেষণাপত্রের যা হতে পারে তাই হয়েছে।

এরজন্য প্রথম দিকে কিছুটা দুঃখ হয়েছিল সুমন্তর। পরে ভেবেছেন যা হয়েছে ভালোর জন্যই হয়েছে। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে বিষয়টা নিয়ে কাজ করেছেন সুমন্ত। চাকরিসূত্রে মন্ত্রী এবং সচিবদের সঙ্গে সর্বোচ্চ স্তরে সব সময়ই তার যোগাযোগ থেকেছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকে তিনি এ বিষয়ে বেশ কয়েকটা পেপার পাঠিয়েছেন। এগুলো নীতি তৈরী করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তার পি. এইচ. ডি ডিগ্রীটা পাওয়া হয়নি। এর জন্য একজন গাইডের তত্ত্বাবধানে থিসিসটা জমা দিতে হতো। তা তিনি করেননি। থিসিসকে প্রাথমিকভাবে ডিফেণ্ড করেন গাইড স্বয়ং। কথা শুরু হলো। টুকরো টাকরা ছোট ছোট কথার মধ্যে দিয়ে জার্নালিস্ট জানতে চাইলেন—আপনি কেমন দেখছেন এম আর এফটি আইকে?

—ভালই। ইট হ্যাজ লটস অফ পোটেনশিয়াল। এইতো আমাদের এখানে একটা বড় এক্সিবিশন হয়ে গেল। আমরা পরপর সাতটা সেমিনার করতে চলেছি। গ্রেট মাস্টারের বিভিন্ন ক্রিয়েটিভ দিক নিয়ে। ওর সঙ্গে যারা কাজ করেছেন—যারা এখনও বেঁচে আছেন—তাদের আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এইসবটাই অডিও এবং ভিডিও রেকর্ডিং করে রাখা হবে—যাতে এর থেকে পরবর্তীকালে প্রাইমারী রেফারেন্স মেটেরিয়াল বের হয়। মানিকবাবুর কাজকর্ম সংরক্ষিত রাখার এটা একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে।

মহিলাটি চুপ করে সুমন্তর কথা শুনছিল। সুমন্ত থাকতেই প্রশ্ন করল—হোয়াট এ্যাবাউট দ্যাট এফ. আই. আর ইস্যু? ইজ দেয়ার এনি ডেভালপমেন্ট?

প্রথমেই সুমন্তর মনে হলো প্রসঙ্গটা নিয়ে সে কোনো কথা বলবে না। তারপর তার মনে হলো এই সব অতি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে মুখ বন্ধ রাখার কোনো মানে হয়না। রাজনীতিবিদরা অনেকে অবশ্য অন্যভাবে অপ্রিয় প্রসঙ্গ সামলায়। কখনো বলে—নো কমেন্ট, কখনো বলে বিষয়টা সাব জুডিস। এব্যাপারে কিছু বলব না। অথচ সাবজুডিস ব্যাপারে সব সময়ই কথা বলা যেতে পারে। অন্তত এক্ষেত্রে আইন তাই বলছে। যেটা কিনা কোর্ট বলতে বারণ করেছে নির্দিষ্টভাবে, সেটা ছাড়া যে কোনো বিচারাধীন বিষয় নিয়েই যে কেউ কথা বলতে পারে। আইন এ ক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট এবং পরিস্কার। সে বলল—আইন আইনের পথে চলছে। অধ্যাপক নীরজকমল পুনে থেকে এ্যারেস্ট হয়েছেন। তার কাস্টডিতে থাকার খবর আমরা পেয়েছি। সেই কারণে তাকে আমরা আইন অনুযায়ী সাসপেণ্ড করেছি। এখন আইনের পথে যা হবার তা হবে। সুমন্ত বললেন। আবার কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। কথা বললেন সাংবাদিক। আপনাদের এখানে টিচারদের বিরুদ্ধে যেসব যৌন হেনস্থার অভিযোগ আসছে সেগুলো সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য?

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

মনে মনে হাসলেন সুমন্ত। মহিলাটি শিরোনাম চাইছেন তার স্টোরির। বললেন—এগুলো খুব রেগুলোর বিষয় নয়। এইসব ঘটনাকে এ্যাবারেশন হিসেবে দেখাই ভাল। অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য বিশাখা গাইড লাইন অনুযায়ী এখানে একটা ইন্টারনাল কমপ্লেনস কমিটি আছে। আই সি সি এগুলো দেখছে।

—আই সি সি কি আপনার কাছে কোনো রিপোর্ট সাবমিট করেছে?

এক মুহূর্তে রেজিস্ট্রারের দিকে তাকালেন সুমন্ত। বোঝা যাচ্ছে মেয়েটি সব খবরই রাখে। তিনি ইচ্ছা করলে ওকে কিছুই নাও বলতে পারেন।

কিন্তু সেক্স স্ক্যান্ডালের কথা স্পষ্টভাবে বলে দিলে তা নিয়ে গশিপের সুযোগ কমে যায়। তাই তিনি বললেন—হ্যাঁ, আই সি সি তাদের রিপোর্ট আমার কাছে সাবমিট করেছে, সিলড কভারে। ওর ভেতরে কি আছে তা আমি এখনো খুলে দেখেনি।

—কিন্তু শোনা যাচ্ছে আই সি সি নাকি কয়েকজন অধ্যাপককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে সুপারিশ করেছে? আপনি কি করবেন?

—আই. সি. সি ঠিক কি সুপারিশ করেছে তা আমি এখনও জানিনা। মনে হচ্ছে আপনি এই বিষয়ে আমার চাইতে বেশি জানেন। আমি রিপোর্টটা পড়িনি। এই নিয়ে কারো সঙ্গে কোনো আলোচনাও করিনি। রিপোর্ট পড়ার পর আইনত যা যা করণীয় তাই করা হবে।

—এখানে টিচারদের লিব খুব শক্তিশালী। এরা কি সহজে এইসব শাস্তি মেনে নেবে?

—এটা একটা হাইপথেটিক্যাল প্রশ্ন। এর উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত নয়। আপনি পজিটিভ দিকগুলোও দেখুন। দেখুন এতসব ঘটনার মধ্যেও এবছর এই স্কুল দু'দুটো ন্যাশানাল এ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। এটা কি কোনো খবর হতে পারে না?

—পারে, পারে। নিশ্চয় পারে। ইনফ্যাক্ট, এই খবরটা করতেই আমি এসেছি। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, আমার ইনসটিংক্ট আমাকে দিয়ে অন্য প্রশ্নগুলো করিয়ে নিল। ওয়ান থিং আই মাস্ট এপ্রিসিয়েট—আপনি প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাননি। ও-কে। আপনি কি এওয়ারডিদের সঙ্গে কথা বলেছেন?

—না, এইযে বলার চেষ্টার করছি। বলতে বলতে স্মার্টফোনটায় ব্যাঙ্গালুরুর নম্বরে ফোন করলেন সুমন্ত। ফোনটা বাজছে। উল্টো দিকে কেউ একজন কথা বলছে।

সুমন্ত ভরাট গলায় বললেন—'ইউ আর মিস্টার বিজয়ন স্পিকিং? রাইট? আই এ্যম সুমন্ত বোস ফ্রম ইয়োর ইনস্টিটিউট, উই আর প্রাউড অফ ইউ-বিজয়ন। এভরি বডি হিয়ার ইজ ইন সেলিব্রেশন মুড। উই আর রিয়েলি ভেরি হ্যাপি'—কথা বলতে বলতে স্পীকার মোডে ফোনটা দিল সুমন্ত। সব কথা শোনা যাচ্ছে।

—এক্সকিউস মি, হু আর ইউ, ডিস এ্যাপিয়ারস টু বি এ্যান আননোন নাম্বার।

—আই অ্যাম সুমন্ত বোস, প্রেসেন্টলি ডিরক্টের এফ এম. আর. এফ. টি. আই।

—স্যার! ফোনের উল্টোদিকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল বিজয়নের কণ্ঠস্বর। স্যার! আই অ্যাম সারপ্রাইজড স্যার! ইউ আর পারসোনালি ফোনিং মি! আই ফিল গ্রেটলি আনারড স্যার!

—দেয়ার ইজ নাথিং গ্রেট এ্যাবাউট ইউ। ইউ হ্যাভ মেড আস প্রাউড। আমরা সবাই তোমার এই সাফল্যে খুব খুশী। কনগ্র্যাচুলেশনস।

—থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। স্যার, উই হ্যাভ নট মেট ইয়েট। আর ইউ কামিং ফর দ্য প্রাইজ গ্রিভিং সেরিমনি? স্যার, প্লিজ কাম। লেটস মিট দেয়ার ইন দেল্লি।

—বিজয়ন, ইউ ইজ নাইস টু টক টু ইউ। তুমি আমার এই নম্বরটা রেখে দাও। ইন কেস অফ এনি নিড। অর ইভেন উইডাউট নিড—ইউ কুড ফোন মি এনি টাইম। কনগ্র্যাচুলেশনস টু ইউ এগেন।

কথা বলতে বলতে সুমন্তর কণ্ঠস্বর আনন্দে ভরে উঠছিল। যখন সে বিজয়নের সঙ্গে কথা বলছিল তখন শ্রাবন্তী নিজের স্মার্ট ফোনে তার একটা ছবি তুলে নিচ্ছিল।

তারপর দু একটা ছোটখাট কথা। থ্যাংক ইউ, মিস্টার বোস। ইট ওয়াজ নাইস টু টক টু ইউ। বলতে বলতেই ক্যান্টিনের ছেলেটা ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকল। প্লেটের ওপর দুটো স্যান্ডউইচ আর পাশেই দিয়েছে তিনকাপ ধূমায়িত কফি। একটা স্যান্ডউইচ খেলো মেয়েটা। সত্যিই —এখানে এই স্যান্ডউইচটা খুব ভাল বানায়। কয়েকবার অনুরোধ করেও দ্বিতীয় স্যান্ডউইচটা খাওয়ানো গেল না শ্রাবন্তী দাশগুপ্তকে। কফিটার জন্য অবশ্য বলতে হলো না। সে নিজের কাপটা ট্রে থেকে হাতে তুলে নিয়েছে। সুমন্তর কিছুটা বিরক্তও লাগছে। নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকে কেউ মেয়েটাকে ব্রিফ করছে। ওর সোর্স জানা যাবে না। ভালো সোর্সকে কেউই এক্সপোজ করে না।

দরজাটা ভেজানো ছিল, কিন্তু পুরো বন্ধ ছিল না। কথা বলার সময় কেমন বারবার মনে হচ্ছিল সুমন্তর—কেউ যেন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরকার সব কথা শুনছে। কে হতে পারে? তার পি. এ? নাকি অন্য কেউ?

বিবর্তন

গৌতম দে

টিকটিকিটা যখন ছোট ছিল তখন সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াত। আমার চোখের সামনেই। লক্ষ্য রাখতাম। হুস হাস শব্দ করে তাড়াতাম না। বরং দেখতাম তার থেকে থেকে চলন। যেমন কিছু ভাবছে। ভাবতে ভাবতে চলছে। চলতে চলতে যেন কিছু খুঁজছে। কি খুঁজছে? হয়তো জানি না। জানার চেষ্টাও করিনি। তবে ভালো লাগে দেখতে।

আমার স্ত্রী নিয়তির চোখে পড়েনি কোনও দিন। নিয়তির সঙ্গে টিকটিকির বিষয়ে নিয়ে কোনও কথা হয়নি কখনও।

টিকটিকিটা বড় হওয়ার পর আর চোখে পড়েনি আমার। কোথায় গেল সে? খুঁজতাম। নিজের মনে মনেই এদিক সেদিক খুঁজতাম। মনটা যেন সব সময় চোখের লেন্সের পিছনে ঘাপটি মেরে থাকত।

এখন কেমন দেখতে হয়েছে সেই টিকটিকিটাকে? আমার মতো রোগাপটকা, কালশিটে মার্কা, নাকি পাড়ার গালকাটা বেতালের মতো মদে ডোবা খলখলে শরীর....।

সকলের মতো গালকাটা বেতালকে আমি চিনি। নিয়তিও চেনে। এ পাড়ার খচ্চর বাসিন্দা। এই একতলা বাড়িটা যখন করেছিলাম, তখন গালকাটা বেতাল মাল-মেটেরিয়াল দিয়ে সাহায্য করেছিল। একলপ্তে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়েছিলাম। খুশি হয়েছিল। তারপর থেকে বাকিটা মাসে মাসে শোধ করেছিলাম।

আস্তে আস্তে আমাদের 'স্বপ্নের বাড়িটা' অনেক দিনের কেনা পুরানো মাটিতে জন্ম নিল। তারপর ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ যুবক হয়ে উঠল। এখন আকাশের দিকে মুখ তুলে সর্বক্ষণ হাসছে যেন।

সেই থেকে গালকাটা বেতালের অবারিত দ্বার হয়ে উঠেছিল আমাদের স্বপ্নের বাড়িতে। যখন তখন আসত। আমি কিছু মনে করতাম না। তারপর একদিন অফিস যাওয়ার পর নিয়তির কাছে শুনলাম ও এসেছিল। তখনই আমার খুশি আর আনন্দগুলো একলহমায় কেঁদে উঠল। মনে হল, এই শরীরটা বুঝি শরীর নয়, একতাল ল্যাদলেদে মাটি। কাঁদতে কাঁদতে দাপাদাপি করছে অনবরত।

আমাদের বাড়িতে অনেকবার চা খেয়েছিল গালকাটা বেতাল। বৌদির হাতে পকোড়া তার নাকি খুব ভালো লাগে।

—ও তাই। আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম।

—হাসির কি আছে শুনি। নিয়তি বিরক্তি সহকারে বলেছিল।

— না...মানে...কেউ কিছু 'ভালো' বললে আমার ভীষণ হাসি পায়। আমার হাসিটি রাগের আগুনে আচমকা পুড়ে যায়।

—ওটা তোমার হাসি নয়, ভিতর ভিতর হিংসায় জ্বলতে থাকা আগুন।

—সত্যি তাই!!

নিয়তি তবুও থামেনি। একনাগাড়ে বলে যাচ্ছিল—অ্যাতো দিন বিয়ে হয়েছে কোনও দিন তোমায় বলতে শুনিনি অমুক রান্নাটা মনে ধরেছে। ভালো লেগেছে।

আমি তার কথা বাড়াইনি। মাঝ পথে থেমে গেছিলাম।

তারপর থেকে ওই টিকটিকিটার মতো গালকাটা বেতালও ভ্যানিশ হয়ে গেছিল আমার চোখের সামনে থেকে। বাজারের পথে, অফিস যাওয়ার পথে এখন আর দেখতে পাই না। রাস্তার ধারে ইট-বালি-চুন-সুড়কির দোকানটাও বন্ধ।

কেন বন্ধ? জানি না।

আমি একদিন নিয়তিকে প্রশ্ন করেছিলাম—তুমি কি জানো?

নিয়তি মুখঝামটা দিয়ে বলেছিল—আমি কী করে জানব।

—না...মানে...।

—অত মানে মানের কি আছে শুনি...। নিয়তি ফুঁৎকারে আমার কথা উড়িয়ে দিয়েছিল।

২

আগেই বলেছি, টিকটিকিটা বড় হওয়ার পর আর আমার চোখে পড়েনি। মনে পড়ল যখন তখন খুঁজতে দোষ কি? নিজেকেই প্রশ্ন করি বার বার।

খুঁজতেও শুরু করলাম। প্রথমে চোখ চলে গেল আলমারির পিছন দিকে। সাদা দেয়াল আর আলমারির অবস্থানের মধ্যে ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক। ওখানে গভীর অন্ধকার। মনে হয়, সারাক্ষণ কোনও না কোনও ষড়যন্ত্র চলছে। ভয়ংকর মাকড়সার জাল আর ধুলোর প্রলেপ। রাশি রাশি মৃত পোকামাকড়ের লাশ। কেমন একটা বিদঘুটে, পচা পচা গন্ধা। নাক জ্বালা জ্বালা করে। চোখ সরিয়ে নি।

ড্রেসিংটেবিলের পিছনের দিকে চোখ চলে যায়। ওখানেও একই অবস্থা। মাকড়সার জালে পোকামাকড়ের লাশের ফসিল। কত বছরের? জানি না। অথচ নিয়তি এই ড্রেসিংটেবিলের আয়নার সামনে বসে মুখে পেইন্টিং করে। সুন্দর মুখটা আরও সুন্দর প্রাণবন্ত করে তোলে। মাথা ভরতি ঘন কালো চুল। প্রশ্ন চিহ্নের মতো দুই কানে চার-চারটে করে সোনার দুল। টিকালো নাক। নাকের পাটায় মুক্তোর মতো নাকছাবি। সব সময় চমকাচ্ছে যাকে তাকে। কচি বেলপাতার মতো চোখজোড়া। তাতে কেঁচোর মতো বিভিন্ন রঙের প্রলেপ। পাতলা ঠোঁট। সেই পাতলা ঠোঁটজোড়াকে অনেকটা সময় নিয়ে রং দিয়ে মোটা করে তোলে।

তখন আরও একজনের উপস্থিতির টের পাই। এই ঘরে। নিয়তি ছাড়া আরও একজন আছে। তাকেও হুবহু নিয়তির মতো দেখতে। ডাকছে দু'হাতের ইশারায়। অথচ নিজেকে দেখতে পাই না। অবাক হয়ে যাই। টুক করে নিয়তির পাশে গিয়ে কোমরে দুহাতের তালু চেপে দাঁড়াই।

—সরো, সামনে থেকে। নিয়তি ঠোঁটে রং করতে করতে দাঁড়াস সাপের মতো ফোঁস করে ওঠে। তার লাল জিবটা তখন মানুষের মতো মনে হয় না। চমকে উঠি। বলি, আমি তো তোমাকে কোনও ডিস্টার্ব করছি না। তারপরেও হাসিমুখে আবারও বলার চেষ্টা করি—আমাকে ওই মেয়েটা ডাকছে...।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

—কোন মেয়েটা?

—ওই যে কাচের ওপারে...।

—তোমার মাথাটা যে আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারছি।

—হ্যাঁগো সত্যি বলছি।

—এখন সরো তো দেখি সামনে থেকে...।

তারপরও একই কথা বলার চেষ্টা করি—হ্যাঁগো সত্যি বলছি। বলতে বলতে আমি নিয়তির কাছ থেকে সরে আসি। তারপর বিছানার ওপর চেপে বসি। নিজেরে মতো করে আবারও বলি-মনে হচ্ছে, আমার যেন দু-দুটো বউ। একইরকম দেখতে।

—একজনকে সামলাতে পিছন ফাটছে তার আবার...। যত্তসব পাগলের প্রলাপ। নিয়তির গলায় আগের মতো ফোঁস ফোঁস শব্দ।

৩

মাথার ভিতর নিখোঁজ টিকটিকির ভাবনাটা আবার ভেসে উঠল। তাহলে টিকটিকিটা কী রান্নাঘরে অবস্থান করছে? সেও কী পকোড়া খেতে ভালোবাসে? আমি ছুটে যাই রান্নাঘরে। তন্নতন্ন করে খুঁজি এদিক সেদিক। বাসনকোসন, মশলাপাতির কৌটোবাটায়, তাকের ওপর 'হুস' 'হুস' শব্দ করে দু'হাতে ধাক্কা মারি। নাহ, কোথাও নেই।

তাহলে গেল কোথায়?

—খুঁজছি।

—কী খুঁজছো।

—টিকটিকিটাকে।

—এ আবার কেমন কথা।

—কেন? ভুল বললাম নাকি?

—ভুল বলোনি তা আমি জানি। আমাকে পাত্তা না দিয়ে নিয়তি এবার একটানা বলে চলে—ঘরবাড়ি থাকলে টিকটিকি যেমন থাকবে তেমনই আরশোলা ইঁদুর মাকড়সা পিঁপড়েও থাকবে।

—আমিও জানি। এ আর নতুন কথা নয়। এরা সবাই গৃহপালিত প্রাণী।

—তা ব'লে তুমি টিকটিকি খুঁজবে?

—না খোঁজার কী আছে! আমি বললাম, অনেক ছোটো দেখেছিলাম।

—তো?

—এখন কতো বড় হয়েছে, দেখতে ইচ্ছে করছে।

নিয়তি আর কথা বাড়ায় না। কপালটা ধনুকের মতো হয়ে ওঠে। আবারও একই কথা বলে 'পাগলের প্রলাপ'। ইদানিং লক্ষ্য করছি, ওর 'না-পসন্দ' কথা হলেই এই কথাটা বারবার আমায় বলছে। কেবল আমিই একমাত্র শ্রোতা। কিছু বলতে পারছি না।

প্রতিবাদ করতে পারছি না।

সেইভাবে বলতে বলতে সে অন্য ঘরে চলে গেল।

আমার চোখ চলে গেল আবার ড্রেসিংটেবিলের দিকে। নিয়তির মতো দেখতে একটি বছর বত্রিশের মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। আমি সেদিকে তাকিয়ে বলি—খুব মজা পাচ্ছো তাই তো।

সে তবুও হেসে চলেছে।

—আমি কিন্তু হাসির কথা বলিনি। শুধু বলেছি, একটা খুব পরিচিত টিকটিকিকে খুঁজছিলাম...।

—আমি জানি সেই খোঁজ। বলেই আবার হেসে ওঠে মেয়েটি।

—বলো তা'লে কোথায় আছে?

—বলছি তো বলব না। ওকে আমি 'বশ' করে রেখেছি। বলেই খিলখিল করে আবার হেসে ওঠে।

—কেন বলবে না?

—বলব না। বলতে বলতে মেয়েটি ড্রেসিংটেবিলের আয়না থেকে মুহূর্তে ভ্যানিশ হয়ে যায়। আমি ছুটে যাই আয়নার কাছে। কাচের ওপর দুহাতের তালু ঘর মোছার ন্যাতার মতো করে বোলাই। শরীর কাঁপতে থাকে।

কী আশ্চর্য। আমার দু'হাতের তালুতে গরম স্পর্শের অনুভূতি জেগে ওঠে।

টিউবলাইট জ্বালাই। অমনি অন্ধকারকে ধাক্কা মেরে আলো ফুটে ওঠে। এই আলো প্রকৃতির আলোর মতো অতটা জোরালো নয়। কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে। জ্বাল দেওয়া বার্লির মতো। সেই আলোতে আবার খোঁজার চেষ্টা করি টিকটিকিটাকে।

৪

একদিন সত্যি সত্যি টিকটিকিটাকে দেখতে পেলাম। খুব খুশি হলাম। আবার রাগও মনের মধ্যে ঝেঁপে এল। মনের মধ্যে কত কথা ফিসফিস করছে। অ্যাতো দিন কোথায় লুকিয়েছিলে বাপ আমার। বেশ তো বলশালী হয়ে উঠেছো। কী সুন্দর চেহারা হয়েছে তোমার! একেবারে নধর গঠন। অনেকটা গালকাটা বেতালের মতো। আমার মতো হতকুচ্ছিত নয়। নিয়তির শরীরের মতো ছিমছাম। মাখনের মতো লোভনীয় শরীরের রং।

এই তো আমার পাশে নিয়তি হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। নাকি 'তন্দ্রা'র মতো করে পড়ে আছে। টিকটিকিটাও বাঁদিকের দেয়ালে এমনভাবে সেঁটে আছে। সেও কী ঘুমিয়ে পড়েছে?

আচ্ছা, টিকটিকিরা কী আমাদের মতো ঘুমায়? নাকি সমস্ত সময় জেগে থাকে? নাকি অনবরত শিকার করে?

আমার চোখ নিয়তিকে দেখে। পরক্ষণেই আবার টিকটিকিটাকে দেখে। মনে হয়, নিয়তির হাত দুটো একটু একটু করে টিকটিকির পায়ের মতো হয়ে যাচ্ছে। চার-চারটি পা নিয়ে নিয়তিও বিছানার ওপর পড়ে আছে।

বিছানার চাদরটা সাদা। ঘরের চার দেয়ালও সাদা। মাথার বালিশ, কোল বালিশের কভারগুলোও সাদা।

টিকটিকির ধেবড়ে থাকা চার পায়ে কটা আঙুল? নখগুলো কত বড়? খুঁজতে খুঁজতে নিয়তির আঙুলের দিকে চোখ চলে যায়। নখগুলো বেশ বড়। রংহীন। ধারালো ছুঁচল। অনেকটা টিকটিকির মতো কী।

টিকটিকির খাবার সঙ্গে নিয়তির থাবা মেলাতে থাকি। টিকটিকির ভরাপেট আর নিয়তির ভরাপেটের একই ছবি। নিয়তির পেটের দুপাশে জেগে ওঠা শিরাগুলো যেন কিলবিলিয়ে ভেসে উঠেছে। শিরার ভিতর রক্ত। সেই রক্তের রং নীল যেন!

বিছানায় উঠে বসি। তারপর বিপুল উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ি। টিকটিকির পেটের দুপাশে কালো কালো ছোপগুলো কি মৃত পোকাদের লাশ? নাকি নিয়তির মতো নীল রক্ত?

আমার চোখের সামনে নিয়তি আস্তে আস্তে টিকটিকি হয়ে গেল। তারপর টিকটিকি থেকে কুমীর। এখন বিরাট কুমীরের মতো লাগছে। সাদা বালির চরায় 'তন্দ্রা'র মতো পড়েছিল অ্যাতোক্ষণ। সামনের পা জোড়া নাড়াতে নাড়াতে বিছানা থেকে নামল। সারা ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। তারপর দেয়াল বেয়ে উঠতে টিকটিকিটা ফুড়ুৎ করে কোথায় যে পালিয়ে গেল বুঝতে পারলাম না।

এই প্রথম আমি ভয় পেতে শুরু করলাম। ঘুনধরা খাটের একটি কাঠ হয়ে উঠলাম। তারপর থেকে সেই পরিচিত টিকটিকিটাকে আর দেখতে পাইনি...।

দুই মোড়লের কাহিনী

উৎপলেন্দু মণ্ডল

প্রস্তাবনা ঃ

কয়েক বছর আগেও এত নাম সংকীর্তন শুনিনি। এখন যেন জোয়ার। মন্দিরের মাথায় অহরহ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ! সংখ্যালঘুরা আওয়াজ তুললেও, সংকীর্তনের লোকরা বলে, তোরাও তো মাইকে আজান দিস।

আমাদের শ্যাম মোড়ল ও সুরেন দু জনেই নাম সংকীর্তনের লোক। সুরেন হেমিলটনের স্কুলের ছাত্র আর শ্যাম মোড়ল তার মেজো কাকার জন্য গরিবের পার্টিতে নাম লিখিয়ে ছিল। কারণ তার কাকা জ্যাঠাদের অনেক জমিজমা ছিল। গোসাবার গজেন মাইতি, মিহির দেবনাথ এদের কল্যাণে বামদূর্গ জেগে উঠছে। আমাদের গ্রামের বসন্ত চোঙা ফুঁকে ফুঁকে সুন্দরবনের জল জঙ্গল জীবনে নতুন দিশা দেখাচ্ছিল। রাধানগরের গণেশ মণ্ডলের নাম কোদাল বেলচায় দেয়ালে দেয়ালে লেখা হত। মাস্টারমশাই গণেশবাবু দুটো একটা ফাউন্টেন পেন নিয়ে সভায় সভায় ঘুরতো পরে রাইটার্স-এও দেখেছি একই রকম। খুব লো-প্রোফাইল-এর মানুষ। ৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় এলো, তখন গোসাবায় মাংসের দাম সাড়ে ন’ টাকা, মাছের দাম ১০টাকা। সুরেন তার আগে থেকেই গোসাবায় পড়ত। বড্ডো তোতলা কিন্তু গান গাওয়ার সময় সুরে কথা বলত। অন্যদিকে শ্যাম মোড়ল চোরা চোখে, সন্ধিগ্ধ মনে হরি নাম করত। আসলে তার বড়ো ছেলেটা বোবা ও কালা, সে কারণেই দেবদ্বিজে ভক্তি। এই দু’জনকে নিয়েই কাহিনী শুরু। একজন চৈত্রের বাতাসে উঁচু আবাদি ভূমিতে গ্যাসের ব্যথায় মারা যায়। অন্যজন লোকের জমি মেপে ভজাচ্ছিল। এসব জমি তার বাপ ঠাকুর্দার, সেই জমি ওকে প্রাণে নিল। বাতাসে তখনও নাম সংকীর্তনের সুর আর সুরেন সবসময় গামছা পরে থাকে, এখন নেই। সে যেন আমাদের দ্বিতীয় গামছা হরি। আসুন এবার বৃত্তান্তে যাই। ধরে নিন মনসামঙ্গলের মতো, এটাও এক বিদ্যাধরিমঙ্গল। বিদ্যার নোনা বাতাসে আসুন একটু আচমন করি।

গাড্ডু সুরেনের জ্যাঠামশাই বলতো, বিধবার পুত্র হবে। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ হবে। গাড্ডু সুরেন এ সব জানে না, শুনেছিলো মাত্র কিন্তু অবস্থার বিপাকে সে এখন অমূল্য ঠাকুরের জামাই। সঞ্জয় গান্ধী জন্ম নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচির পর সুরেনের বিবাহ হয়। প্রথম কন্যা সন্তান। গরীব বাড়িতে কন্যা কেই বা চায়। কিন্তু কন্যার বিবাহের পর সংসারটা কীরকম শূন্য শূন্য লাগে, তখনই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এতেই গাড্ডু সুরেনের জীবনবৃত্তান্ত পাল্টে যায়। সুরেনের বিবাহিত মেয়ে বলে—

—তোমার জন্য বাড়িতে মুখ দেখাতে পাচ্ছি না।

—কেন?

—কেন বুঝতে পারছো না?

মাধবকাটির মেয়ে অবাক হয়। তাদের মা জ্যাঠিমাদের এরকম কত হয়েছে, নতুন শিশুকে পেয়ে কোথায় আনন্দ করবে তা না—

সুরেনেরও কানে যায় কিন্তু ততদিনে কালা হয়ে গেছে। সে অত আমল দেয় না। বুড়ো বয়সে কে দেখবে, ছেলেই তো দেখবে। গাড্ডু সুরেনের দাদা সুধাংশু দোকানদার। দোকানদারও মেয়েকে বকে। কথায় কথায় বলে বার বার এককথা বললে সত্যি হয়ে যায়। কথাটা সুরেনের বউকেও স্পর্শ করে। সুরেন আর নিরেনের এক রাত্রে বিয়ে হয়েছিল দুজনের বউও একই গ্রামের। নিরেন ঝাড়ফুক করা লোক। তার দাপটও আছে খুব। সেও সুরেনের বউকে বলে; ওরকম মেয়েকে ঘরে তুলিস কেন! সে বছরই সতীশ ঠাকুরের বাড়িতে সে ময়না থাকে। সতীশ ঠাকুরের মেয়ের বিয়ে হয়নি। ঠাকুর বলে কথা, তার বিয়ে হবেও না। গ্রামের বর্ণ প্রথাও চলে গেছে অনেক দিন। সেবার নোনা জলে যখন বাগদার পোনা এসেছিলো তখন মেয়ে মদ্দার মতো ঠাকুরবাড়ির লোকেরাও জাল টানতে শুরু করে। জলের মধ্যে রুপোর টাকা, লোভ সামলাবে কী করে। সেদিন থেকে ঠাকুর পরিবারে চাষাদের কাজ আর ফেলনা নয়। পূজারী ব্রাহ্মণ ঠাকুররা সে দিন থেকে চাষবাসও শুরু করলো, মায়নার লোক রাখাও শুরু করলো, সুরেন হচ্ছে সেই মায়নার লোক। জাল্লির সঙ্গে তখন থেকেই সুরেনের লাগালাগি। সুরেনেরও মনে হয় এক জাতক্রম ছিলো না হলে ৫ বিঘা ভিটেবাড়ি সমেত সর্দার পাড়ার নদীতে নিমজ্জিত হয়। বাংলাদেশি রিফিউজিদের মতো তাদের অবস্থা হয়েছিলো, সব আক্রোশ জল্লির উপর গিয়ে পড়ে। আভাবউ কিছু বলতেও পারে না, ছেলে বড়ো হয়। সুধাংশু দোকানদার ভাইপোকে গুছিয়ে পড়াতে লাগলো, বংশের একমাত্র মুখ উজ্জ্বল করবে। তা ছেলেগুলো তো সব লেবার হয়ে সোনারপুর, গড়িয়া যায়। তাকে দেখবে এই ভাইপো!

মনে হচ্ছে এই বংশ উদ্ধার করবে সে। পাড়ার শিক্ষিত ছেলেপুলে সব চাকরি পাচ্ছে, তার ভাইপো কেন চাকরি পাবে না! সুধাশু ভাবে তার বাবাও এইরকম ছিলো। খুব বেশি কথা বলতো না। তার শ্বশুরবাড়িতে এসে, লোকটা যেন আরও বোবা হয়ে গেল। খুব কষ্ট করেই এখানে তারা টিকেছে, সে তবুও শুশুরবাড়ির জায়গা পেয়েছে, আর ভাইদের অবস্থা ভালো না। ছোটো ভাইতো তার ছেলেদের সঙ্গে সোনারপুর চলে গেছে, ওখানে ভ্যান চালায়, সেজো ভাই সুপদো গ্রামেই থাকে, সদানন্দোর বাড়ির জামাই, ভবিষ্যতে জমিও পাবে।

সুধাংশু মাস্টার তার ভাইয়ের চরিত্র জানে, সে কিছু বলতেও পারে না। তাদের এই কলুন পাড়ায়, পাড়ার মেয়ে, পাড়াতেই থাকছে। কেউ কিছু বললে আর কেউ শোনে না, মাঝে মাঝে মিটিং এ সে যায় বটে। কিন্তু পার্টির লোকরা তারই সব প্রমিলা বাহিনীর হাউলিদের ডাঁসা বউ বলে—আয়লার সময় থেকে দেখতিছি কার নাঙ্ কার সঙ্গে থাকে সে জানে। এরপর আর কথা বলা যায় না। মেয়ে—মদ্দাই প্রত্যেকের একাউন্টে টাকা ঢুকছে, এখন সবাই আর্থিকভাবে স্বাধীন। বেঁচে থাকুক এই সরকার। তখনই তার মনে হয়—ভাইপোর চাকরি হবে কী করে। দেশজুড়ে চাকরি বাকরি নেই।

সে জীবন শুরু করেছিলো পাঠশালার মাস্টারি দিয়ে। এখন শোনে প্রাইমারি স্কুলের মাস্টাররা রাস্তায় ধন্না দিচ্ছে। মাস্টাররা পড়ানোর জন্যে ধন্না দেয় না, চাকরির জন্যে ধন্না দেয়। গত দু'বছর বইয়ের সঙ্গে কারুরই সম্পর্ক নেই, সে কারণে সে আবার তার পাঠশালা খুলে ফেলে। পয়সা তো কেউ ছাড়তেই চায় না উপরন্তু বলে চালডাল কই। সে দিন কেনান বউ বলে স্কুল খুলেছো, চাল ডাল দেবা না! তারপর মনে হচ্ছিল ছেড়ে দিই। তারপর ভাইপোটারে পড়ানো! সে সত্যব্রত পালনের অঙ্গীকার নিয়েছে, তার থেকে সরে আসবে কী করে, বাধ্য হয়ে কলুন পাড়ার বেজন্মাগুলোর সবাইকে সে পড়াচ্ছে। সে মানুষ গড়ার কারিগর, তাকে তো পড়াতেই হবে। কিন্তু কইশোর অতি আত্মমগ্ন ও আত্মকেন্দ্রিক। ভাইপো সব সময় বাইরে বেরোতে চায়, এখানে থাকতে চায় না। তার মা চিররুগ্ন সংসারটা যা হোক করে ধরে রেখেছে। সুধাংশু দোকানদার ও সেভেন এইটের অঙ্ক, বিজ্ঞান জানে না, তাদের আমলে এ সব ছিলো না। তবুও সে বারে বারে পড়ায়, ভাইপোকে বোঝায়, পাথর ঘসলে ক্ষয় হয়, লোহাও তরল হয় কামারের বাসায়, তাহলে পড়াশুনে করলে কেন হবে না।

শ্যাম মোড়ল চৈত্রের গুমোট রোদে জমি যাচ্ছিল, বাপ ঠাকুরদার জমি, দাগ নং, ক্ষতিয়ান নং মেলাতে মেলাতে সে ধল পার হয়ে কাদা জমিতে ওঠে। সে সময় ভাঙা মাল থেকে শুকনো হাওয়া এসে পেটের বায়ুতে চাপ দেয়, দিশেহারা হয়ে শুয়ে পড়ে, কাঁদার কেঁচো তলা বিলে। পালযুগের সমর্থ পুরুষের মতো শুয়ে থাকে, চৈত্র মাসের হাওয়া সেখানে কম, সবাই ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসে, মারা যায়, শ্যাম্ মোড়লকে নিয়ে গেছিল তারা নিজেদের অপরাধী মনে করে। প্রফুল্ল ডাঃ আর মাছে অনিলের জমি কিছুতেই মিলছিলো না। দু'জনেই ডেকে নিয়ে গেছিল। বিকেল হলে দেখতে পায় না। সে কারণে অপরাহ্নের আলোয় শ্যাম মোড়লের চোখে ধাঁধা লাগায়, বাপ ঠাকুরদার ২০০ বিঘে জমি পলকে সে দেখে, নেই। মাথার মধ্যে কিলবিল করে, বড়ো বড়ো বনস্পতির জ্বালা, তারা যেন তাকে ডাকছে। এই দ্বীপ আবার আবাদ হবে, বাপকাকারা এসে ঘরকন্না করবে, সে আধো সচেতনে দেখে, ন-কাকা চলে যাচ্ছে তার জমি—কোমর জলে ছেলেরা জলের দামে বিক্রি করে দিলো, সে এই রাবণের বংশ ঠেকাতে গিয়ে গরিবের পার্টি করলো, আর তা করতে গিয়ে সে সত্যিই গরিব হলো, উঠানে শোয়ানো লাশের উপর বিষ্ণু ডাঃ আর নেহেরু ঢু'কলে ইনজেকসন দেয়। হাড বিট বন্ধ কারোর খেয়াল নেই।

গত শতকে হ্যামিলটন সাহেবের স্কুলের ফণিবাবু যাকে দয়া করে ভর্তি করেছিলো। সেই কর্ণ এমন ঘোরোতর সংসারি ছেলে মেয়েরা চলে গেছে। সে এখন ঠাকুরদার মন্দিরে ঘন্টা বাজায় প্রত্যেকটা বাদ্যযন্ত্র একবার করে বাজায়, তার ফাঁকে পাড়ার ছেলেরা এলে গাঁজা বিক্রি করে, সে এতটাই ধার্মীয় যে নদীর চর থেকে মা কালি আর সরস্বতীর কাঠাম নিয়ে বেড়া দেয়। শান্তি মালির চরে মাসে তার ভিটে বাড়িতে সবজি চাষ করে, ক্ষেতে মন নেই। সে সব জায়গায় দোকান দেয়। গোসাবা হস্টেলে থাকতে দেখতো জেলে পাড়া থেকে সাহা, কর্মকারদের বাড়ির লোকেরা দোকানে যাচ্ছে। ছোটবেলার স্বপ্ন সে পূরণ করছে মেলায় মেলায় দোকানদারি করে।

এই মেলার নেশার খপ্পরে পড়ে সে চমলাতেই মোশারি টাঙিয়ে রাতে ঘুমায়। রাত্রি গাড় হলে মেলার উচ্ছিষ্ট মেয়েদের সঙ্গে রাত্রিযাপন করে। এ বছর সে জমি চাষই করেনি। অতিবৃষ্টির কারণে পাতা-লতা নেই, ছেলেরা কেউ চাষবাসে সময়ে আসে নি তারও চাষ করার কোন তাগিদ নেই। কিন্তু কর্ণর মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেছে। শ্যামকাকার মৃত্যুর পর সে কেমন একাকিত্ব বোধ করে। সামনে পিছনে গোটাটাই যেন ফাঁকা। তার ঠাকুরদারা যত দিন বেঁচেছে ততদিন তারা বাঁচবে। তাদের বাগাতে গুষ্টি ডোঢো পাখির মতো লুপ্ত হবে। সে দিন বাজারে চারা বেচতে গিয়ে, ভবোকা পেটান খাচ্ছিল সে দোকানদারি করে বলে সবাই ঠাট্টা করে, কিন্তু কোনও দিন মার সে খায়নি। হ্যা মার খেয়েছিল কাকাদের ছেলেদের বউর প্রতি আসক্তি হওয়ায়। আসলে এরা কেই বুঝছে না, বাগাতে গুষ্টি লোপ পাবে যদিনা বংশ বৃদ্ধি হয়। এই সেদিন বোবা গৌরের ছেলেটা আড় কোলা করে নিয়ে যাচ্ছিল ভিড়ের মধ্যে ভুটভুটি থেকে নদীতে পড়ে গেল। এক সপ্তাহ পরে। শিব মন্দিরের কাছে বুড়ে বাঘ বসেছিলো, সে তখন মন্দিরে ঘণ্টা বাজালেও নড়ছিল না।

বাঘটা উলুবনের গল্প পাচ্ছিল-ওই উলু বনে তার ঠাকুরদা পো ঠাকুরদার সঙ্গে রাগ করে লুকিয়ে থাকত। বুড়ো ঠাকুরদা বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে আসত। মা-মরা সব ভাই কী অদ্ভুত বাঁধনে বাঁধা ছিল। এবারের প্রচণ্ড গরমে কেউ আর ঘরে বসে থাকতে পারছেনা। উন যায়, গাছতলায় বসে, সেখানেও হাওয়া গরম। আয়লার পরে গত দশ বছরে বটগাছ, সিরিশ গাছ হয়নি।

আসলে মাটির নোনা কাটেনি। কোলকাতার বাবুদের আসা যাওয়া বেড়েছে। কাগজে কলমে বাবুরা হিসাব করে। রূপশ্রীর টাকায় বারবার বৌ পালটায়। সরকারি সাইকেল নিয়ে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যায়। দয়াপুরের গেস্ট হাউসে লাইন লাগায়। হ্যামিলটনের দ্বীপে আগে হসপিটাল ছিল না। এখন চোট খসানো ডাক্তারে ভর্তি। আয়লার পরে গরু বাছুরেরও থ্রেট্রেল এবোরশন হচ্ছে। এর ক'দিন পরে মানুষেরও হবে। কর্ণ, সব মন্দিরে বসে থাকলে, যেন পরিষ্কার দেখতে পায়। নিশুত রাতে সে, শান্তি মালে কুমিরের বাচ্চা আসতে দেখে। কারা যেন বলে যায়, আর আবাদ হবে না, বাপ কেউড়া গাছের মাথাগুলো লকলক করে ওঠে। নদীর বাঁধ চুপ চাকট হয়ে কালে ভরে যায়, কর্ণও ঘুমিয়ে পড়ে।

বিষ্টু ডাক্তার গোসাবা হসপিটালে ভর্তি হওয়ার পর একবারেই চোট মেরেছিলো, আমান স্কুল। এখানে সে পড়তো। ভবতোষ স্যার, সম্রাট অশোক কেন শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিল তা তারপর কানে বাজে বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি। সেও বলে—যাচ্ছি যাচ্ছি। ঠিক সেই সময়ে হাসনাবাদ থেকে এম. বি. গঙ্গা ধর তাদের হস্টেলের পাশ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে গোসাবার ঘাটে যায়। নার্স এসে দেখে একটা লম্বা লোক শুয়ে আছে। হৃদস্পন্দন নেই চোখে মুখে অদ্ভুত প্রশান্তি।

ত্রিশ বছর আগের সাপুড়ে, ভটভুটিতে করে গোসাবায় নামে। কাছারি ময়দানের সামনে

সে ডুগডুগি বাজায়। এর আগে লঞ্চঘাটে মেলা দেখানো চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু কোনও লোকজন নেই, সিনেমা হলটাও উঠে গেছে। দুটো চারটে উটকো লোক এসে জড়ো হয়, ভরসা কিছু টুরিষ্ট। তারা খুব উৎসাহ ভরে দাঁড়ায়। এর মধ্যে একজনে বুড়ো সাংবাদিক ছিল, মরিচঝাঁপি কভার করতে এসেছিলো। সে খুব গল্প করছিল গোসাবার বি. ডি.ও আর ও. সি তাদের এখানেই আটকে রেখেছিল। একজন উৎসাহী শ্রোতা বলল—তাই, তারপর সে সাপ দেখতে ব্যস্ত। বুড়ো সাপুড়ে মাঝে মাঝেই ঘাড়ের গামছাটা ঠিক করছিলো আর কি সব বলছিল। সাপটা মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছিল। বিষদাঁত তোলা নেই। থলি ভর্তি বিষ। কালি কালাচ, গরমে সেও অতিষ্ট তার উপর সাপুড়েটা খুব বিরক্ত করছে, ধৈর্য না রাখতে পেরে তার ধুতির উপর ছোবোল মারে। তারপর সোজা হ্যামিলটনের বাংলোর দিকে যায়। বহুবছর আগে একজন বোকা সাহেব এখান থেকে চলে গেছিল। টিকতে পারেনি। সেই সব অভিশাপ লেগে আছে এখানকার বাতাসে। সাপুড়ে চিত হয়ে পড়ে আছে। টুরিস্টদের মধ্যে একজন বলল, ওকে হসপিটাল নিয়ে যাও, কে নিয়ে যাবে! সাপুড়ের অ্যাসিসটেনটাও ভয় পেয়েছে। ছটপট ঝুড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিলো। টুরিস্টরাই তাকে ভ্যানে করে হসপিটালে নিয়ে যায়। বুড়ো সাংবাদিক বলছিলো—এইসব হবে, পৃথিবী গরম হয়ে গেছে, সাপেরাও ইনসেকটিসাইট হজম করে ফেলেছে। ওরাই এই আবাদ নষ্ট করে দেবে।

এখন স্কুল বন্ধ, বাজার চালু আছে টুরিস্টদের জন্য। এখান থেকে ভ্যান ছায়াপুর যায়। টুরিস্টদের কাছে নয়া খবর, বাঘ নয় বাপে কেটেছে সাপুড়েকে।

ভগা বাগদি জানে তার এক কাকার নাম ছিল চড়ুই ধীরেন। সেও তার বাপ কাকাদের মতো চারা বিক্রি করতো। খুব বলিয়ে কইয়ে লোক, রোজ সময় করে রেডিওর খবর শুনতো এখন উপরে চলে গেছে। আজ মঙ্গল রায়ের হাটে যা হলো, মনে হয় সে আর চারা নিয়ে বসবে না। বসার দরকারই বা কি! ছেলে তো চাকরি পেয়ে গেছে তবুও সে অভ্যাস বসে, বাড়িতে চারা করে, সেই চারা বিক্রি করে বাপ কাকাদের আমলের খদ্দের সে পেয়েছে। কিন্তু এরকম কখনও হয়নি। বাড়ির মধ্যে সেই একমাত্র চারা বিক্রি করে। সে চলে যাবার পর, বাগাতে গুষ্টির কেউ আর চারা বিক্রি করবে না। লোভ, লোভই কাল হল। এখন আর কেউ বাড়ির লংকা, বেগুন-এর চারা বিক্রি করে না। সব প্যাকেটের চারা মাদা করে ফেলায়। চারা তৈরি হয়ে গেলে বিক্রি করে। সে দিন লোকটা যা করলো আর কেউ তার কাছে চারা কিনবে! ভাগ্যিস্ পরিচিত কিছু লোকজন ছিলো, তারাই রক্ষা করেছিলো। ভোগা এখন আর মাঠে পড়ে থাকে না, সে ঘরে বসে টিভি দেখে। খবর গোনে, খবরের অর্ধেক তার মাথার উপর দিয়ে যায়। বাপ কাকাদের আমলে টিভি ছিল না। কাজকর্মের এত পয়সাও ছিলো না। এখন শুধু পয়সা আর ভোগ আর সঙ্গে লোভ। ছেলেটা এখানে থাকতে চাইলোনা। পারতোও না। এখন যা সরিক সারাকের অবস্থা তারপর

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

পার্টিবাজি। ঠিকই করেছে। টাকা পয়সা দিয়ে ছেলের চাকরি করিয়েছে। সে চলে যাবার পর এই সব জমিজমা বাড়িঘর কে দেখবে!

ডাক্তার বাড়ি এখন ভুতের বাড়ি হয়ে গেছে। রাজ্যের খাটসা, আর পেঁচা ওখানে বাসা বেঁধেছে। কি কষ্ট করে বিল্ডিং বাড়ি করেছিল। বাড়িতে কাক চিল বসতে দিতো না। এখন সব শেষ, বাইরে মা লক্ষ্মীর বেঁ হচ্ছে তার বেরুনের কোন ইচ্ছে নেই। কাকের ঝি বহুদিন পর বাপের বাড়ি এসেছে। পাগলা ও তার ছেলে লম্বা লম্বা মশাল ধরিয়ে বলছে—

আশ্বিন গেল কার্তিক গেলো
মালক্ষ্মীর বিয়ে হলো.........।

এ পাড়ায় এমন ডাক্তার অনেক। গোরুর ডাক্তার, সারা দিন গো সেবার পরে, রাধা কৃষ্ণের নাম নেয়। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের বাড়িও করে দিয়েছে। জমিজমা বিক্রি করবে না। এসব রাধা-কৃষ্ণের নামে রেখে দেবে। এ বছর যারা বীজ ধান করতে পারেনি তাদের সে ধান বিলিয়েছে। প্রফুল্ল ডাক্তার অবলা জিবের যন্ত্রণা বোঝে। সে মনে করে এই পৃথিবীকে একটু যত্ন নিলে সবই আবার ঠিক ঠাক হবে। কিন্তু উপেন ডাক্তার তা মনে করে না। নিজের গলগণ্ড পুযে রেখে সে নিজেই বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। সেও তো কম পাপ করেনি। সামান্য জ্বরের ঔষুধের জন্য নিজের জেঠিমাকে মেরেছে। জেঠতুতো দিদিকে ঘুমন্ত অবস্থায় জলে ফেলে দিয়েছে। সেই সব পাপের দিন এখন যেন তাকে ডাকছে। ছোটোবেলার সেই ছায়াভরা বিকেল গুলো সে আর পাবে না। গাড্ডু সুরেন ও শ্যামাপদ আমার আত্মীয় ও প্রতিবেশী। গ্রাম দেশে তখনও নিয়ম করে বৃষ্টি হতো। আমরা বলতাম জৈষ্ঠের ভন্না। তখন ইন্দিরা গান্ধীর ঊনোজমির দুনো ফসল আসেনি। মানুষ একচাষে সন্তুষ্ট থাকত। অথচ অভাব ছিল সাংঘাতিক। সবথেকে বেশী অভাব দেখা যেত আশ্বিন কার্তিক মাসে। যদিও তখনও ঐ মনসা সে—আমরা কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সময় সবার বাড়িতে যেতাম। ছোটরা সন্ধ্যেবেলায় মা লক্ষ্মীর বিয়ে দিতাম।

আশ্বিন গেল কার্ত্তিক গেল
মা লক্ষ্মী গর্ভে বসল
ধান দাও চাল দাও গো....

শাঁক বাজিয়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশাল পাটকাটির ঝাড়। সেই পাটকাটির আলো। আমাদের জমির অংশ মাত্র এক ফালি—কয়েক কাঠাও নয়। পাশেই শ্যাম মোড়লদের জায়গা—সেখানে আবার বড় পুকুর। শ্যাম মোড়লের বাবার জমি শান্তিখালের শেষ মাথায়—আমাদের বারো বিঘের জমির প্লট। ওদেরও শীতকালে একসংগে ধান কাটা হ'ত। শীতের কুয়াসার মধ্যে আমরা ধানের গোড়া দিতাম। তারপর খড় একটু শুকিয়ে গেলে মাথাল দেওয়া হত। শ্যাম মোড়ল ভাল মাথাল দিতে পারত। আর আমাদের মধ্যে বড় বড় ধানের বোঝা বইতে পারত রামদা। পরে রামদার পার্কিনসন ডিজিজ হয়। শ্যামমোড়লের পরে মারা যায়—রাম মোড়ল।

এমনিতে শ্যাম মোড়ল লোক খারাপ ছিল না। গাড্ডু সুরেন তার ভগ্নীপতি সুধাংশুর ভাই। সুধাংশু আগে তাদের বাড়িতে পাঠশালা করত। তাদের বাড়িতে মেয়েরা কেউ এরকম করতে সাহস পাবে না। বাবা, কাকারা সব মেনে নিয়েছিল। মেজো কাকা বলে, আর কি করবি? এই ডাক্তারকাকাকে আমরা ভয় পেতাম। এইকাকার জন্য শ্যাম মোড়ল গরীবের পার্টিতে যোগ দেয়।

নিজেদের জমি ভাগাভাগি হওয়ার পর তিন বিঘে করে ভাগে, বাধ্য হয়ে বাইরে খাটতে হয়। গরীবের পার্টির সংগে থেকেও লাভ। তখন RSP পার্টিতে এত টাকা পয়সার স্রোত ছিল না।

যাই হোক যেদিন মাধবকাটি জলের নীচে, রায়মঙ্গল যেদিন নিয়ে নিল—শ্যামমোড়ল সেদিনই আমাদের বড় নৌকা নিয়ে সংগে ছিল, গৌরমামার বড় বড় কাঠের বাক্সে ঢুকে পড়েছে পদ্ম গোখরো। সাহসী গৌর প্রায় ফণা তুলে সাপদের বার করে নিয়ে আসে।

বড় জ্যাঠামশাইয়ের উঠোনে দেখলাম পুরো একটা সংসার। বুড়ো তালুই মশাই—একা বসে। এমনিতে কথা বলেন কম। আমরা খেলার সঙ্গী সাথী বেশি পেয়েছিলাম। রামমোড়ল শ্যামমোড়লদের জমি জমা ভাগ হয়নি।

বহুদিন পরে ঘের পাড়ায় যখন মনোহর নাপিত চলে গেল—সেই জায়গায় বসালো — ভগ্নিপতিকে। আরও পরে আমাদের পূবের ঘেরে—জল নিকাশী খাল বরাবর বিঘে দশেক ধান জমি ছিল—সেখানে নতুন করে পাড়া তৈরী করল আর এস পি থেকে। বাপ কাকারা সব বসে দেখল। গাড্ডু সুরেনও জায়গা পেল। ঘর পেল।

শ্যাম মোড়ল আমাকে খুব ভালবাসত। আমার ছোটবেলায় বড় অসুখ হয়েছিল, মরেই যেতাম। শ্যামমোড়ল, তার বোবা ছেলে জ্যেঠিমা, মা, নরেনদা সবাই মিলে কলকাতা অভিযান। সেখানে শিয়ালদাতে শেতল ঘোষকে দেখিয়েছিলাম। শ্যামাপদ ঐ যে শুয়ে আছে দুশো বিঘের সিথনে। এই জায়গাগুলো আবাদ করেছিল। সেখানে পরের প্রজন্ম চৈত্রের উদাসী হাওয়ায় শুয়ে আছে।

শ্যাম মোড়ল দেখে যেতে পারল না। ভাগ্নে লালিত মাতব্বরি করা সেই ভিটেবাড়ি ছেড়ে সবাই শান্তিখালের পাশে বাড়ি করছে। শান্তিখাল আবার মাথা চাড়া দিয়ে আসছে। বাপ কাকাদের ভিটেবাড়ি চড়া দামে গভর্ণমেন্ট বেচে দিল। সবার হাতে টাকা। দেখতে পারল না—সূর্যকান্তর ছেলে একশ' দিনের কাজের টাকা মেরে বিশাল দোতালা বাড়ি করেছে। পূর্বাহ্নেই বলেছি—গাড্ডু সুরেন বাড়ি ছেড়েছিল ছেলের জন্য। সেই ছেলে পরের দিকে বড় মাতব্বর হয়ে পড়েছিল। সুরেন যখন সুইজ গেটের মুখে ঘর বেঁধেছিল, তখন পাড়ার লোকও কিছু বলেনি। আসলে সুন্দরবনীদের মধ্যে পশ্চিমী হাওয়ায় অভ্যস্ত। দিদির চালডালে, বিগত আয়লার চালে কারুর অভাব থাকার কথা নয়—তবু সবাই বাইরে চলে যাচ্ছে। আরও বেশি টাকার জন্য। এই যেমন গোবিন্দকাটীর শুভার বাবা, তার রোগা বউটা নিয়ে বাইরে কাজ করতে গিয়েছিল।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

জায়গার নাম বলতে পারে না। তা ভারতের প্রায় শেষ দিগন্তে। ওখান থেকে একরাত বাসে গেলে কন্যাকুমারিকা। প্রচণ্ড গরমে বসন্তে মরছে। সারা গায়ে গুটি। তামিল ডাক্তার একফোটা বাংলা বোঝে না।

সেইরকম গাড্ডু সুরেন কি বুঝতে পেরেছিল? তার গ্রাম ভিটেবাড়ী সব আলাদা হয়ে যাবে! একরাতে রায়মঙ্গল নিয়ে নেবে। তার বাবা তো সকাল সন্ধ্যে গীতী পড়ত! তাতে কি হ'ল? রায়মঙ্গলের মেয়ে বিয়ে করেছিল। ছেলে হওয়ার পর সে বউ মারা গেল।

তারপর একদিন সুইজ গেটে কুঁড়েঘরে গাড্ডু সুরেন মারা গেল। পাড়ার লোকরা পচা ঠাকুরের বাড়ির কাছে, পুরানো হেঁতাল বাগানের উঁচু জায়গায় পোড়াল। পার্টি কিছু টাকা দিল। ওর দাদা সেদিন পাঠশালা বন্ধ করে দিয়েছিল।

আমরা স্কুলে যাওয়ার পথে এই হেঁতালবনে লুকিয়ে থাকতাম। ঘন হেঁতাল বন। চৈত্রমাসে খেজুর পাকত। কিন্তু বড্ড তেতো। সুইসগেটটা কীরকম নির্জন আর নোনতা হয়ে গেল। ওর কুঁড়ে ঘর দুপাশে ছেতরে পড়েছে। এই তো ক'দিন আগে সুইসগেট খুলে জল বার করল। পাশে যে এ্যাসশেওড়া, ঠাকুরবাড়ির চরা খালে পদ্মবাগান—মনে হয় গাড্ডু সুরেনের জন্য শোক প্রকাশ করেছে।

দুটো ঘটনা। ঠাকুরের মেয়ে আবার বিধবা হয়। বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন আবার স্বপ্নেই থেকে যায়। এর কিছুদিন পরে হরেনের বউ আবিষ্কার করে গাড্ডু সুরেনের ছেলে ঘরের মটকা থেকে ঝুলছে।

জানি না মৃত্যু কোথায় পৌঁছায়। গুনীরা বলে ব্রহ্মা সত্য জগৎ মিথ্যা। এইসব মৃত্যু দেখে বুঝতে পারি না কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা।

মন্ত্রীর ফিতে কাটা

সৌমিত্র চৌধুরী

বিকেল বিকেল সময়। ভিড় জমেনি তখন। একটু পরেই উদ্বোধন। সব আয়োজন মোটামুটি ঠিক। মন্ত্রী আসবেন একটু পরে। মূর্তিটার ফিতা কেটেই কনভয় হাঁকিয়ে হাওয়ার বেগে ভুস্‌স্‌। কলকাতার পথে ছুটতে থাকা গাড়ির মিছিল থেকে হুটারের শব্দ পিলে চমকাতে থাকবে অনেকক্ষণ। সময় নষ্ট করা যাবে না। এত বড় একজন মন্ত্রী এবং তাজা নেতা! তেঁতুলপাতির গণ্ড গাঁয়ে রক্ত মাংসের শরীরে তাঁকে দেখতে পাওয়া! বড় ভাগ্যের কথা। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তাঁর নাগাল পাওয়া গেছে।

মন্ত্রীর ভাষণের পরেই বক্তৃতা দেবার ডাক পড়বে। পাঁচ মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণ। হাতে লিখে নিয়ে কয়েকবার পড়তেই মুখস্ত। তবুও বড় হরফে বক্তৃতা লেখা কাগজগুলো হাত ব্যাগে ঢোকানো ছিল। বক্তৃতা মনে মনে আউড়ে নিচ্ছিলেন সন্ধ্যাদেবী। পাশে এসে নিঃশব্দে বসলেন বীণাপাণি। তার একটু পরে এলেন প্রাইমারী স্কুলের হেড দিদিমনি। একটু পরে মায়া এসে নিচু গলায় বলল, 'মাসীমা, ভাই বলল কাল সারারাত একানে কাজ হইসে। আজ দেকুন, মূর্তিটা কালো কাপড়ে ঢেকি দিসে। আমার মনটা খালি কু-ডাক ডাকতিসে।'

'তোর কু-ডাক ছাড় তো।' ভাইটা অন্য পার্টি করে তাই সহ্য হয় না। কত বড় খুশির দিন আজ! বীণাপাণির ধমকে ভেজানো মুড়ি হয়ে গেল মায়া।

দেখতে দেখতে তেঁতুলপাতির চৌমাথায় ভিড় জমে গেল। গমগম করছে চারদিক। সন্ধ্যে লাগেনি কিন্তু চারদিক আলোয় আলোয় ঝকমক। আগে কী ছিল জায়গাটা! অন্ধকার। আগাছা ভর্তি। কাঁচা ড্রেন চারদিকে। এখন ঝাঁ-চকচকে চৌমাথা। চার দিকেই পিচ ঢালা রাস্তা। মোড়ের মাথায় উঁচু বাতি স্তম্ভে চোখ ধাঁধানো আলো। কি যেন নাম এই স্তম্ভের? হাই মাস্ট। কথাটা শুনেছিল বিল্টুর মুখে। বিল্টু মানে বিল্বেশ্বর দাস। এলাকার কমিশনার।

কমিশনার রক্তদান অনুষ্ঠানের চাঁদা নিতে পাল পাড়ায় পাঠিয়েছিল সনাতন আর গেদুকে। সপ্তাহ দুয়েক আগের ব্যাপার। গেদুর মুখে বিকেলের অনুষ্ঠানে যাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্র সভাঘরের নতুন মঞ্চে ধবধবে পাঞ্জাবি গায়ে চাপিয়ে গলায় ফুলের মালা পরে বক্তৃতা দিয়েছিল বিল্টু। এলাকার উন্নয়নের, যে সব হয়েছে এবং হবে, ভদ্র ভাষায় তার ফিরিস্তি দিচ্ছিল। 'হাই মাস্ট বাতিস্তম্ভ বসবে', দর্শকদের হাততালির মধ্যেও বিল্টুর কথাটা পরিষ্কার কানে সেঁধিয়ে গেছিল। ক'দিন পরই চোখের সামনে বসে গেল উঁচু বাতিস্তম্ভ। এলাকাটা সন্ধ্যে থেকেই ঝলমল ঝলমল করে এখন। আর সন্ধ্যেবেলা এসময় ঠাণ্ডা বাতাস বয় চৌরাস্তার মোড়ে। কিন্তু দিনের বেলা ঝলসানো রোদ। তাপে পুড়ে যায় শরীর।

সেদিনও দুপুরের আগে রোদ মাথায় এখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন সন্ধ্যা পাল। এক হাতে ছাতা অন্য হাতে বাজারের ব্যাগ। দিন-রাতের কাজের মেয়ে ছুটি নিয়ে মেয়ের বাড়ি গেছে সেই রতনপল্লি। তাই ব্যাগ হাতে বাজারে বেরতে হল। একটু দেরিই হল। ঠাকুর ঘরে জপ করলেন অনেকক্ষণ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মা সারদার বাঁধানো ছবিতে মালা পরালেন। তারপর

চটপট একটু আম মুড়ি মুখে দিয়ে শাড়ি পাল্টে বাজারমুখো। বংশীহরির দোকান থেকে আলু আর আটা কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। তেতুল গাছটার নিচে ঝিরঝিরে বাতাস তখন। ভ্যাপসা গরমে হাওয়া খেতে একটু বসলেন। প্রাণটা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। জোরে আরামের একটা শ্বাস টানবার পরই চোখ গেল ডানদিকে মোড়ের মাথায়। তখনই মেজাজটা খচমচ করে উঠল। ওমা কেমন তর কাণ্ড এটা? প্লাস্টিকের চাদরে মুড়ে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে!

মাথায় বহরে দশাসই একটা মূর্তি। উঁচু বেদিতে দাঁড় করানো। প্লাস্টিকের বড় চাদর, তার উপর দড়ির শক্ত বাঁধন দিয়ে ঢাকা মূর্তি। মুখ চোখ দেখা যায় না কিন্তু দাঁড়াবার ভঙ্গিতে চেনা যায়। সামনে ঝুঁকে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন বলিষ্ঠ যুবক। দু'হাত বুকের কাছে ভাঁজ করা। মূর্তিটা কার বলে দিতে হয় না। এখানে দাঁড়িয়ে প্রাণের ঠাকুর জায়গাটা আলোয় আলো করে দেবেন। ভাবতেই মনের আনাচে কানাচে বেল ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই বুকে একটা ধাক্কা লাগল সন্ধ্যাদেবীর। তার প্রাণের ঠাকুর, টগবগে যুবক বন্দি দশায় কেন? কাঠফাটা রোদে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকবে? মাসখানেক পরে বর্ষা এসে যাবে। তখন আবার পড়ে পড়ে ভিজবে? বিবেকানন্দের মূর্তিটা আনলি তো বন্দী করে রাখলি কেন? কী আক্কেল তোদের! জানিস লোকটা কে? বিড়বিড় করলেন সন্ধ্যা দেবী, লোক নয়। ভগবান। গোটা দুনিয়ার শিক্ষক। আর অন্ধকার ভারত দেশটাকে আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে কে? এই মানুষটা। নারী মুক্তি আনল কে? এই মহাপুরুষ।

স্কুলে মাস্টারদের কাছে এসব কথা ছোটবেলায় শোনা। এখনও মনে গেঁথে আছে। বিবেকানন্দের জন্মদিনে বিনুনিতে বেলফুলের মালা গুঁজে শহরের পথে কত পরিক্রমা করেছেন। কত কাল আগের কথা। বিয়ে হবার পর এ-গাঁয়ে এসে সব বন্ধ। এখানে ওসবের বালাই ছিল না। গাজন, মনসা, চরক আর দুর্গাপূজা, এতেই মজে থাকত তেঁতুলপাতি। কিন্তু তাঁরা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন অন্য রকম। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভক্ত। স্বামীর সাথে বেলুড়মঠে গিয়ে প্রেসিডেন্ট মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়ে এলেন। মহারাজের কথা কানে বাজে, 'ঠাকুর মা আর স্বামিজী অভেদ। ঠাকুর বললেন, শিব জ্ঞানে জীব সেবা আর বিবেকানন্দ গোটা দুনিয়াকে শেখালেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' এটাই আজকের দুনিয়ার বাঁচার মন্ত্র।'

মহারাজের দেওয়া মন্ত্রই জপ করেন সন্ধ্যাদেবী। ঠাকুর-স্বামিজীর পূজা করছেন তিন বছর। আগে প্রত্যেক মাসে বেলুরমঠে যেতেন। গত বছর স্বামী মারা যাবার পর আর যাওয়া হয়নি। এলাকা ছেড়ে একা একা কোথাও আর যাওয়া হয় না।

ইদানীং এই এলাকাতেই ঘোরাফেরা। এখানেও যাবার যায়গা হয়েছে অনেক। বৃদ্ধ—বৃদ্ধাদের পার্ক, রবীন্দ্রভবন। পঞ্চায়েত থেকে পুরসভায় প্রমোশন পেয়ে এলাকায় উন্নয়নের ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটেছে। কাজ হয়েছে দেখার মত। নতুন রাস্তা, হেলথ সেন্টার, জলের লাইন। সংস্কৃতি চর্চাও হচ্ছে। রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা, ড্রাম বাজিয়ে নেতাজী জন্মদিবস পালন। কত কী? না দেখলেও শুনেছেন, ধুমধাম করে ডিজে বাজিয়ে রাত্রিবেলা নাচ গান করে ক্লাবের ছেলেরা।

হাতের ব্যাগটা পাশে রেখে এসব কথাই ভাবছিলেন সন্ধ্যাদেবী। কিন্তু ঘোর কেটে গেল নরম স্বর কানে ঢুকতেই, 'দিদি, জায়গাটা কেমন দেখতে দেখতে বদলে গেল!'

মৃদু শব্দে ঘোরচ্যুত সন্ধ্যা দেবী বাঁদিকে ঘাড় ঘোরালেন। চোখের সামনে সুখলতা। গোলগাল হাসিমুখ। প্রাইমারি স্কুলের রিটায়ার্ড দিদিমনি সুখলতা। গরমে বাড়িতে হাপসে উঠে হাওয়া খেতে এসেছেন। এসময় অনেকেই জিরিয়ে নিতে মোড়ের মাথায় আসেন। সুখলতা মুখের ঘাম মুছছেন।

ওদিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা বললেন, 'মূর্তিটা ঢাকা দিয়ে রোদের মধ্যে কতদিন ফেলে রেখেছে বল তো!'

—কুড়ি-পঁচিশ দিন তো হবেই।

—ভগবানকে এ ভাবে কেউ বেঁধে রাখে? জানো তো আমরা মিশনে দীক্ষিত। বিবেকানন্দ আমাদের ভগবান। ভগবানকে এ ভাবে রোদের মধ্যে কেউ...।' চিৎকার করে বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠলেন সন্ধ্যা।

—দিদি, আপনার পাশের পাড়াতেই তো বিল্টুর বাড়ি। আপনি একবার গিয়ে বলুন। স্কুলের দিদিমণিরা বলেছে। মহিলা সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট শুক্লাদিও কতবার রিকোয়েস্ট করেছেন!

—বিল্টু কী বলছে?

—ওর এক কথা। মন্ত্রীর টাইম হচ্ছে না। আমি কি করবো?

—এটা একটা কথা হোল? এইট পাশ ছোড়া কমিশনার হয়ে ভাবছেটা কি?

—আপনি একবার বলুন দিদি। আপনি এমএ পাশ। এত বড় উকিলের স্ত্রী। আপনার ছেলে কলকাতায় ডাক্তার। আপনার কথার একটা মুল্য আছে।

এর পর এক মাস ধরে বিল্টুকে বলেত বলতে মূর্তি উদ্বোধনের দিন ঠিক হয়েছে। পুরানো কথাগুলো মনে পড়ছে। কত বার যে বিল্টুকে ধরতে হয়েছে। বাড়ি, মিউনিসিপ্যালিটি, পার্টি অফিস। সব ঠায়ে ধাওয়া করেছেন। হুসহাস করে ইনোভা গাড়ি ছুটিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে যায় বিল্টু। ধরা কি মুখের কথা! তবে অনেক চেষ্টা করে মাঝে মাঝে দু'চার মিনিট কথা বলা গেছে। সব সময় সঙ্গে থেকেছে বীণাপাণি, আর মায়া। যখনি বলো, বিল্টুর মুখে সেই এক রা।

—মন্ত্রীর টাইম নাই।

—টাইম নাই তো তুমি ফিতে কেটে লেকচার দিয়ে দাও। সন্ধ্যামাসি বক্তৃতা লিখে দেবে। ফস করে বলে ফেলেছিল মায়া।

কী রাগ বিল্টুর। ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। ঘামতে ঘামতে বলছিল, 'বিবেকানন্দের কথা আমারে বলতে হবি না। আমি জানি। কত বড় ফিডম ফাইটার ছিল লোকটা!

—কী বললে তুমি?' সন্ধ্যাদেবী আঁতকে উঠে চিৎকার করলেন।

—বললাম তো ফিডম ফাইটার। নেতাজীর সাথে জেল খেটেছে। -

বিল্টুর কথায় সেদিন মাথা ঘুরে গেছিল। টলমল পায়ে বেরিয়ে এসেছিলেন ওর ঠাণ্ডা

অফিসঘর থেকে। তবুও হাল ছাড়েননি। বিল্টুর পেছনে জোঁকের মত লেগে থেকেছেন। হাজার বার বলতে বলতে বিল্টু পার্টির মাধ্যমে মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করল। শেষ অবধি অনেক কষ্টে গ্রামের বহু মানুষের চেষ্টায় ঠিক হয়েছে আজকের উদ্বোধনের দিনটা। মায়া বলে 'আমাদের সংগ্রামের ফসল, মাসীমা'। সংগ্রামের ফসল হোক কি গুরুর কৃপা, আজকে একটা শুভদিন। গ্রামের এক ঐতিহাসিক দিবস। তাকে লেকচার দিতে হবে। গ্রামে তো তেমন শিক্ষিত লোক নেই। যারা আছে সব থাকে গ্রামের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে কলকাতার আশে পাশে।

যাক, আজ শুভ দিন। ভিতরে ভিতরে আনন্দ হচ্ছে খুব। বিবেকানন্দের বন্দী দশা ঘুচাতে তার চেষ্টা তদ্বির অনেকটা কাজে দিয়েছে। আজ বিল্টুর কথায় তৈরি হয়ে এসেছেন। উপর মহলের নির্দেশ, বিল্টু নাকি ভাষণ দেবে না। সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন শ্রীমতী সন্ধ্যা পাল। বিবেকনন্দ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলবার জন্য বেশ গুছিয়ে এসেছেন সন্ধ্যাদেবী।

মন্ত্রীর কনভয় ঢুকতে আর দশ মিনিট। হন্তদন্ত হয়ে গদাই ছুটে এসে সন্ধ্যাদেবীকে মঞ্চের সামনে চেয়ারে এনে বসাল। সন্ধ্যাপালের বুকটা একটু ধক ধক করে উঠল। বক্তৃতা দেবার তো অভ্যাস নেই। পরক্ষণেই ভাবলেন, বিবেকানন্দ-ভক্ত ডরায় না কিছুতে। ঝড়-জল-তুফান, সব কিছুকে ডোন্ট কেয়ার।

হঠাৎ চিৎকারে ভাবনার ঘোর কেটে গেল। সশব্দে মন্ত্রীর গাড়ি ঢুকল সভামঞ্চের কাছে। পুলিশগুলো জিপ থেকে লাফিয়ে নেমে ধুপ ধাপ করে মঞ্চের চারদিকে পজিশন নিল। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন দাঁড়ায়। মন্ত্রী ধীরে ধীরে নামলেন। সঙ্গে অপূর্ব এক সুন্দরী, বোম্বাই না ব্যাঙ্গালোরে বড় অভিনেত্রী নাকি। বিখ্যাত নায়িকাকে পাশে নিয়ে ক্যামেরার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন মন্ত্রী। হাততালি আর পুষ্প বৃষ্টি চলতে লাগলো। মৃদু হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে ফিতে কাটলেন মন্ত্রী। তারপর ক্যামেরার ঝলসানি। ছবি উঠতে লাগল পটপট। কালো কাপড়ে ঢাকা মূর্তির আবরণ উঠে গেল। গদায়ের হাত ধরে স্টেজে উঠলেন সন্ধ্যাদেবী।

ঘনঘন হাততালি। কিন্তু চমকে উঠলেন সন্ধ্যাদেবী। একি! বেদীর উপর বিবেকানন্দ। তাঁর দু'পাশে আর পেছনে লোহার পাইপ। পাইপের খাঁচার উপর কী দেখছেন? বিবেকানন্দের মাথার পাগড়ির উপর দিয়ে ঝলমল করছে কার মুখ? চোখ কচলে আরেকবার তাকালেন সন্ধ্যাদেবী। এবার নজরে এল মুখ, মুখের হাসি। হাসি মুখের নিচে ঝক ঝক করছে লেখা, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

মাথাটা বন বন করে উঠল সন্ধ্যাদেবীর। ভগবানের মাথার উপর নেতার মুখ! মুখের নিচে কার বাণী এটা 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর?' যেন নেতার শ্রীমুখের কথা! রাগে উত্তেজনায় শরীর কাঁপছে তাঁর। কিন্তু কাকে কী বলবেন?

তখন স্টেজ জুড়ে দাপাদাপি। রিপোর্টার নেতা আর ক্যামেরাম্যানে ভর্তি মঞ্চ। কয়েকটি মেয়ে মন্ত্রীকে মালা পরাল। তারপর উদ্বোধনী সঙ্গীত। পুরসভার সভাপতি আর বিল্টুর দু'লাইন

করে কথার পর মন্ত্রীর ভাষণ। ছোট বক্তৃতা দিয়ে মন্ত্রী নেমে গেলেন। তারপর ঘোষকের বলিষ্ঠ কণ্ঠে মাইকে ঘোষণা, 'পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুরু হচ্ছে নিত্য।

মঞ্চে উদ্দাম নাচের মধ্যে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে শ্রীমতী সন্ধ্যা পালের নাম ডাকল না কেউ। ডাকলেও কী বলতেন, ভাবছেন সন্ধ্যাদেবী।

মায়ার হাত ধরে ধীর পায়ে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন সন্ধ্যাদেবী। তেঁতুলপাতি মোড়ে তিরতিরে হাওয়ায় ফাংশন জমেছে বেশ। একা একা বাড়ির পথ ধরলেন সন্ধ্যা পাল। বুকের কাছে দলা পাকানো কষ্ট। বিড়বিড় করলেন, তোদের নেতা ভগবানের থেকেও বড়?

অনেকটা পথ হেঁটে বাড়ি ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন সন্ধ্যাদেবী। মঞ্চের উদ্দাম চিৎকার বন্ধ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকছে। শোবার ঘরে ক্যালেন্ডারে বিবেকানন্দের উজ্জ্বল মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন সন্ধ্যাদেবী। অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভারতকে জাগিয়েছেন এই মহাপুরুষ!

বুক খালি করা একটা শ্বাস নেমে এল। তারপর ব্যাগ থেকে বিবেকানন্দ সম্পর্কে লেখা দু'পাতার বক্তৃতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। সময়ের হিসাবে তখন গাঢ় হয়ছে রাত্রি।

হীরের আংটি

নিখিল মণ্ডল

সেদিন ক্যান্টিনে টিফিন সেরে অজিতেশের চেম্বারে বসে দুই ব্যাচেলর বন্ধু খোশগল্প করছিলাম। এখনও টিফিন টাইম শেষ হয়নি। সুতরাং কাজ আরম্ভ করার প্রশ্ন নেই। হঠাৎ সেই টেবিলের সামনে যে এসে দাঁড়াল তেমন একজনকে এই ট্রেজারি অফিসের মধ্যে দেখব এ আমি কল্পনাতেও আনতে পারিনি। আমি অপলকচোখে তাকিয়ে দেখছি। তা খুব সুন্দর কিছু দেখলে কার আর চোখে পলক পড়ে? আড় চোখে দেখলাম অজিতেশেরও একই অবস্থা।

আমাদের অবস্থা দেখে মহিলা বোধহয় কৌতুক উপলব্ধি করছিলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'হাই', তার কমলালেবুর কোয়ার মতো ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক হলো।

আমি ঠিক মহিলাদের বয়স বুঝতে পারি না। বোধহয় সাতাশ আঠাশের মতো হবে। কিছু বেশি কম হতেও পারে। দীর্ঘাঙ্গী, স্লিম ফিগার। অপূর্ব সুন্দর এক নারী। কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য হলো কমলালেবুর মতো গায়ের রঙ আর নীল চোখ। আমি হলোপ করে বলতে পারি গত দশ বছরে এমন একজন সুন্দরীর পদধূলি এই ট্রেজারিতে পড়েনি।

অজিতেশ নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। চেয়ারে টানটান হয়ে বসে অফিসার সুলভ গাম্ভীর্যে বলল, "প্লীজ বি সিটেট।" মহিলা আমার ডানদিকের চেয়ারে বসে পড়ল। অজিতেশ আবার জিজ্ঞাসা করল, "হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ"।

মহিলা এবার পরিস্কার বাংলায় বলল, "আমি শিবি, শিরি ব্যানার্জী।" আমি মহিলাকে বিদেশী ভেবেছিলাম। ওর কথা শুনে ভুল ভাঙল।

এবার শিরি যা বলল, এমন কথা শোনার জন্য আমরা দু'জন শ্রোতা একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। ওর স্বামী অয়ন ব্যানার্জী রাজ্য সরকারের অফিসার ছিলেন। বছরখানেক পূর্বে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। কিন্তু তার প্রাপ্য গ্রাচুউয়িটি, পি. এফ, পেনসন কিছুই শিরি পাচ্ছে না।

শিরিকে আরও বেশ কয়েকবার আসতে হল। প্রতি সপ্তাহে সে আসত। যে সময় ক্যান্টিন থেকে টিফিন আনিয়ে অজিতেশের চেম্বারে খেতে বসতাম, আর শিরির আগমন প্রতীক্ষা করতাম—ঠিক তখনই শিরি চেম্বারের কাঁচের দরজা খুলে সশরীরে আমাদের সম্মুখে এসে হাজির হতো। শিরি আমাদের সঙ্গে কোনও দিন একটা ফ্রিস ফ্রাই কিংবা কাটলেট খেতো, কোনওদিন শুধুই চা।

আমরা দুই বন্ধু ওর রূপের এ্যাডমেয়ার। সেই প্রথম দর্শনেই ফিদা হয়ে গেছি। বারবার আসার কারণে ও আমাদের একপ্রকার বন্ধু হয়ে গেছে। এখন আমি জেনে গেছি ওর এই রূপ বাবা-মার উত্তরাধিকারী হিসাবে পেয়েছে। শিরির মা অমিতা ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। তিনি ছিলেন রূপবতী এক বিদুষী মহিলা। মাদ্রাজের কোনও খৃষ্টান মিশনারী কলেজে ইংরাজী পড়াতেন। সেখানে তাঁর পরিচয় হয় এক আইরিশ অধ্যাপকের সঙ্গে। সেই পরিচয় একসময় পরিণয়ে গড়ায়। শিরির মা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে ওই আইরিশ অধ্যাপকের সঙ্গে বিয়ে

করেন। কিন্তু সেই বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। শিরি জন্মবার পাঁচ বছর পর তাঁদের ডিভোর্স হয়ে যায়। এরপর আইরিশ অধ্যাপক তাঁর দেশে চলে যান। আর ওর মা শিরিকে নিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে খীষ্টানকে বিয়ে করার পর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে পূর্বেই তাঁর সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। কিছুদিন এখানে ওখানে ভাড়া থাকার পর বেকবাগানে একটি ছোট দু'তলা বাড়ি কিনে বাস করতে থাকেন। শিরির বিয়ের এক বছরের মধ্যে তাঁর মার হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়। তার দু'বছরের মধ্যে সে স্বামীকে হারিয়েছে।

এক কষ্টকর দুঃখময় জীবন শিরির। তাই তার সুন্দর মুখে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে বিষাদের আবছা ছায়া। সেই ছায়া গভীর হওয়ার আগেই খিলখিল করে হেসে ওঠে শিরি। এই হাসির মধ্যে সে তার সমস্ত ব্যথা কষ্টকে তাড়াতে চায়।

শিরির স্বামী দশ বছরের কিছু বেশিদিন চাকরি করেছে। টাকা বেশি কিছু পেল না। তবে ও ফুল পেনশন পাবে। টাকাটা ওর বিশেষ প্রয়োজন। শিরি ওর বাড়ির কাছাকাছি একটি বাচ্চাদের স্কুলে পড়ায়। নামমাত্র মাইনে। তাতে আমু আর তার সংসার ঠিকমতো চলে না। আমু এক বৃদ্ধ মহিলা। বেগবাগানে বাড়ি কেনার কয়েক মাস পর থেকে তাদের সঙ্গে আছে।

পেনশন চালু হওয়ার পর শিরির আর ট্রেজারিতে আসার দরকার থাকল না। কিন্তু অজিতেশের সঙ্গে ওর যে ভালোই যোগাযোগ আছে সে অজিতেশের কথা থেকে বুঝতে পারতাম। শেষের দিকে শিরি যখন ট্রেজারিতে আসত তখন বুঝেছিলাম অজিতেশের সঙ্গে ওর সম্পর্ক গড়ে উঠছে। অজিতেশ ছয় ফুট লম্বা সুন্দর চেহারার এক যুবক। কথাবার্তায় স্মার্ট, অফিসার। আমি তো সেখানে বেঁটে খাঁটো। একটু স্থুলকায়। চাকরিও করি ক্লার্কের। অজিতেশকে শিরির পছন্দ হওয়া স্বাভাবিক। আমি কিন্তু ওদের সম্পর্ক গড়ে ওঠায় খুব আনন্দ পেলাম। শিরির জীবনটা বড় দুঃখের। এবার ও সুখী হোক।

হঠাৎ একদিন অজিতেশ আমাকে একটি হোটেলে ডিনারে নিমন্ত্রণ করল। বলল- শিরি থাকবে। ডিনার শেষে অজিতেশ জানাল, "আগামীকাল থেকে এক সপ্তাহ অফিসে ছুটি নিয়েছি। শিরি আর আমি দার্জিলিং-এ বেড়াতে যাচ্ছি।"

কথাটা শুনে মনে হলো, এই কথাটা শোনানোর জন্য অজিতেশ আমাকে ডিনারে ডেকেছে। এও একপ্রকার অহংবোধ—নিজেকে জাহির করা। অজিতেশের সঙ্গে আমি ফাইভ থেকে টুয়েলভ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছি। তারপর ওর আর আমার ভিন্ন কলেজ, ইউনিভারসিটি।

মাস ছয়েক পরে অজিতেশ ট্যান্সফার হয়ে শহরতলির এক অফিসে চলে গেল। প্রথম মাঝে মাঝে ফোনে কথা হলেও ক্রমে তাও বন্ধ হযে গেল। ভেবেছিলাম বিয়েতে নিশ্চয় নিমন্ত্রণ পাব। কিন্তু তার বদলে একদিন শিরির ফোন পেলাম। কথা শুনে মনে হলো অসুস্থ। ওর অনুরোধে এক সন্ধ্যাবেলা অফিস ফেরত ওদের বেগবাগানের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

একজন ষাটের কাছাকাছি বয়সের মহিলা আমাকে পথ দেখিয়ে দু'তলায় নিয়ে চলল। বুঝলাম ওই মহিলাই আমু। আমু একটা ঘরে ঢুকে টিউব লাইট জ্বালিয়ে দিল ছিমছাম সাজানো

ঘর, একপাশে খাট, অপরদিকে সোফা, নিচু টেবিল—দেওয়ালে মর্ডান আর্টের ছবি। খাটের সামনের দিকের দেওয়ালে কয়েকটি ফটো লাগানো। তার মধ্যে শিরিকে চিনতে পারলাম। আমু একটা চেয়ার খাটের পাশে টেনে নিয়ে আমাকে বসতে বলল। এতক্ষণ আমি ঘরটার চারপাশে চোখ বোলাচ্ছিলাম। খেয়াল করিনি খাটে কেউ শুয়ে আছে। আমি খাটের পাশে চলে যাওয়ার আগেই আমু শায়িত ব্যক্তির গায়ের চাদর মুখ থেকে সরিয়ে বুকের কাছে এনে দিয়েছে। আমি মুখটা দেখে চমকে উঠলাম। এমন দৃশ্য দেখব এ আমার কল্পনাতেও ছিল না। আমি জীবিত নাকি মৃত শিরিকে দেখছি বুঝতে পারছি না। তার কমলালেবুর মতো রঙ কেমন হলুদ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ভাঙা গাল, নির্জিব ঠোঁট। সুন্দর নীল চোখ দুটি কোঠারাগত। সেখানে যে স্বপ্ন ভাসত—তা আর নেই। এখন যেন সেখানে মৃতপুরীর ছায়া।

খুব আস্তে, যেন এক প্রেতের ছবি। শিরি বলল, 'বসো'।

এরপর অনেক সময় নিয়ে থেমে থেমে যে কথা সে আমাকে শুনালো—তা শুনে অজিতেশের প্রতি আমার ঘৃণা হলো। সেই সঙ্গে নিজের প্রতি রাগ। ওর কথা শেষ হওয়ার পর আর এক মুহূর্তও সেখানে থাকতে ইচ্ছা করছিল না। তবু এখনও শিরির কথা শোনা হয়নি—যেতে পারলাম না। শিরির সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল সে ছিল রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ। আর শিরির অপেক্ষা অনেকটাই বয়স বেশি। তার অসুস্থ মা শিরিকে নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। অয়ন ব্যানার্জী অপেক্ষা কোনও যোগ্য পাত্র খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি খুঁজে পাননি। শিরির অপছন্দ থাকলেও মার কথা ভেবে অয়নকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু কখনও সে তাকে ভালোবাসতে পারেনি। তার পিপাসার্ত ভালোবাসা তৃপ্ত হয় অজিতেশের সঙ্গে মেলামেশার পর। ওই মেলামেশায় শিরির গর্ভে সন্তান আসে। সে কিছুতেই রাজি হয়নি অ্যাভোরশান করতে। কিন্তু অজিতেশের জোরাজুরিতে বাধ্য হয়। পাঁচ মাসের সন্তানকে অ্যাভোরশান করে নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পাওয়ার পর যখন সে শয্যাশায়ী—তখন থেকে অজিতেশ তার কাছে আসা বন্ধ করে। এর মাস দেড়েক পরে পোস্টে অজিতেশের একটা চিঠি আসে। তাতে সে লিখেছে, "আমি বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা, মা জানিয়েছেন খৃষ্টান বিধবা মেয়েকে বিয়ে করলে তাঁদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হবে। তাদের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করা ছাড়া আমার কোনও পথ নেই। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

এই চিঠি পাওয়ার পর শিরি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দেয়। এখন ও যক্ষ্মা রোগে ভুগছে। আমুর কাছে শুনেছি সে এখন কোনও ওষুধ খাচ্ছে না।

শিরির স্বামী গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী দুর্ঘটনা ছিল তার অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। এক বিধ্বংসী কালবৈশাখীর মতো অজিতেশ তার শরীর মনের উপর ধ্বংসালীলা চালিয়েছে। অজিতেশের এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিধস্ত। বেঁচে থাকার স্পৃহা তার আর নেই। তার এই দুঃখের জীবনের সে সমাপ্তি চাইছে।

শিরির সব কথা শোনার পর ক্ষণকাল আর তার কাছে আমি দাঁড়াতে পারলাম না। আমার নিজেকে কেমন দোষী মনে হতে লাগল। তবু আমি কথা দিয়ে এলাম ওর অনুরোধ আমি রাখব।

শিরি বলেছে—আমার তো শেষ সময় এসে গেছে তাই একটা উইল করাব। আমার আর কে আছে, অজিতেশকে আমি এই বাড়িটি দিয়ে যেতে চাই। আর টাকা গয়না যা আছে তা আমুকে আর আমার স্কুলকে দিয়ে দেব। তোমাকে দেব দেড় লাখ নগদ টাকা। এই টাকা নিয়ে তুমি উইলের প্রবেট নেবে। তোমাকে আমি উইলের একজিকিউটর করতে চাই। উকিলবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

শিরি আমাকে অজিতেশের সঙ্গে দেখা করে ওর এই উইলের কথা জানিয়ে তাকে একবার নিয়ে যেতে বলেছে। শেষবারের মতো অজিতেশকে দেখতে চায় শিরি। আর শুনতে চায় সে শিরির বাড়ি নিতে রাজি কিনা? শিরির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে অজিতেশ ফোনের সিম পাল্টিয়েছে। তাই ও আমার সাহায্য চেয়েছে।

আমি জানি টি.বিতে ঠিকমতো চিকিৎসা হলে প্রাণহানীর সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু শিরি জীবন থেকে মুক্তি চায়। আমু বলেছে শিরি তার কথা শোনে না। ঠিকমতো খেতে চায় না।

আমার মনের ভিতর অপরাধবোধ। মাঝে মাঝেই মনে হয় আমি যদি অজিতেশের স্বভাব সম্পর্কে আগেই ওকে অবগত করাতাম তাহলে এমন একজন সুন্দরী নারীর জীবনের এমন করুণ সমাপন ঘটত না। আমি এখন প্রতিদিন অফিসের পরে ওর কাছে যাই। ওকে ওষুধ খাওয়াই। ঠিকমতো ডিনার খাচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখি। দিনেরবেলা না খেলে আমুর কাছ থেকে শুনে ওকে বকাবকি করি।

তারপর রাত দশটা-সাড়ে দশটার সময় শিরির কাছ থেকে আমার ভাড়া ঘরে চলে আসি। আমি একাই ভাড়া থাকি। আমার মা- ছোট ভাই আর তার বৌয়ের সঙ্গে দেশের বাড়ি নদীয়ায় থাকে।

ক্রমে শিরি একটু ভালো হতে থাকল। এক সন্ধ্যাবেলায় শিরির বাড়িতে অজিতেশকে নিয়ে এলাম। ইতিমধ্যে শিরি উইল লিখে নিজের ও সাক্ষীদের সই করিয়ে নিয়েছে। অজিতেশ আর আমি তার সামনে চেয়ার টেনে বসলে, শিরি ডানহাত দিয়ে উইলটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'পড়'।

যতক্ষণ পড়া হলো দেখলাম শিরি কেমন এক অভিব্যক্তিহারা দৃষ্টিতে অজিতেশের দিকে তাকিয়ে থাকল। অজিতেশ সেই দৃষ্টির সম্মুখে দিশেহারা। কোন দিকে তাকাবে ঠিক করতে পারছে না। খুব সামান্য কথা হয়েছে তাদের। পড়া শেষ হতে অজিতেশ দ্রুত বাইরে চলে গেল। যেন সে মুক্তি পেল। কিছুক্ষণ পরে আমি বাইরে এসে দেখি ঝুল বারান্দায় একপাশে দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানছে। আমি পাশে যেতে সে বলল, "ওর বাবা বিয়ের সময় ওর মাকে একটি খুব দামি হিরের আংটি দিয়েছিল। শুনেছি এখনকার বাজারে তার দাম পঞ্চাশ লাখ টাকার বেশি। সেটার কি করল?"

আমি একটু রাগত স্বরে বললাম, "যা করে তোর কি? তুই যাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলি, তোর সেই প্রাক্তন প্রেমিকার কাছ থেকে তার বাড়িটা পাচ্ছিস। তার মূল্যও তো কম নয়।"

অজিতেশ আর ওই বিষয়ে কোনও কথা বলল না। শুধু বলল, "ঠিক আছে। কখন কি ঘটে জানাস।"

আমি উত্তর করলাম, "মারা গেলে জানতে পারবি।"

অজিতেশ আর দাঁড়াল না। শিরির ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একবার বলল, 'আসছি'—তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

আমি কিন্তু শিরিকে ছেড়ে গেলাম না। সেকি শুধুই অপরাধ বোধের জন্য? নাকি সেই প্রথম দিন তাকে দেখে আমার বুকের ভিতরে বীণার তারে যে ঝঙ্কার তুলেছিস, তারই প্রভাবে? অথবা শুধুই সহানুভূতি। প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাইনি। কিন্তু দেখলাম, শিরি আমার কথা ফেলতে পারে না। ঠিকমতো ওষুধ পথ্য খায়। আমি বোধহয় ওর বাঁচার স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছি। আমু বলে, "বাবু, তুমি যখন সময় পাবে চলে আসবে। শিরি তাহলে হয়তো ভালো হয়ে উঠবে।"

সত্যিই শিরি ভালো হয়ে উঠতে লাগল। এখন ও উঠে বসতে পারে। কিন্তু আর কয়েদিনের মধ্যে আমাকে দূরে চলে যেতে হবে। আমি বাংলায় বি.এ অনার্স, এম.এ পাস। বি.এডও করেছি। স্কুলের চাকরি করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তখন তা পাইনি। সরকারি ক্লার্কের চাকরি পেয়ে ট্রেজারিতে জয়েন করিছিলাম। তবে কয়েক বছর আগে এস. এস. সির পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিলাম। মাত্র কয়েক মাস আগে মৌখিক ইন্টারভিউ হয়েছিল। আর কয়েকদিন হলো এপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছি। জলপাইগুড়ি জেলার লাটাগুড়ির কাছে এক স্কুলে পনেরো দিনের মধ্যে জয়েন করতে হবে।

আমার কাছ থেকে সে কথা শুনে শিরি বলল, "সবাই দূরে চলে যাবে। আমার বাবা, মা, অয়ন, অজিতেশ, তুমি—সবাই। আমাকে শুধু একা থাকতে হবে। তবে কেন তুমি আমাকে বাঁচাতে চাইছ?" কথা শেষ করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁদতে থাকল।

কেন জানিনা আমি ওর কান্না সহ্য করতে পারছি না। আমার মনে হলো মানুষ যখন বাঁচার জন্য খড়কুটো আঁকড়ে ধরেও রক্ষা পায় না তখন বোধহয় এমনিই কাঁদে। ওর এই করুণ কান্নায় আমার চোখেও জল আসছে। আমি নিজে শক্ত হতে চেষ্টা করছি—কিন্তু পারছি না। ওকে চুপ করাতেও পারছি না। শেষে একসময় বললাম, "তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। তোমাকে আমি সুস্থ করে তুলব।"

আমার কথা শুনে ওর কান্না থেমে গেল। আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসল। আমার মুখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে শিরি। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল, "আমি একজন যুবতী। কিভাবে সঙ্গে নেবে?"

"বিয়ে করে নিয়ে যাব।"

আরো গভীর তার দৃষ্টি। পলকহীন চোখে বিস্ময়। অস্ফুটে উচ্চারণ করল, বিয়ে !

এবার আমি ধীরে ধীরে বললাম "হ্যাঁ দু-তিন দিনের মধ্যে আমরা বিয়ে করব।" আমি জানিনা কেন এসব কথা বললাম? কেমন করে বললাম? আগে তো এমন কথা ভাবেনি।

শিরি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখে মৃদু হাসি। সে এবার আমুকে ডাকল। আমু এলে বলল, "আমাকে সেই কৌটাটা দাও। তার দিকে একটি চাবির গোছা এগিয়ে দিল।

আলমারির লকার খুলে আমু একটা রূপোর কৌটা বার করে শিরির হাতে দিল। কৌটো খুলতেই ঝকমক করে উঠল হীরে। শিরির হাতে বেশ বড় এক হীরে বসানো আংটি। সে আমার বাঁ-হাতটা টেনে নিল।

আমি দ্বিধাগ্রস্ত। হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। বললাম, "এত দামি আংটি। না- না, তুমি ওটা রাখো।"

শিরি আবার আমার হাত ধরল। বলল, "অজিতেশের আঙুলে এই আংটি পরিয়ে দেবার ইচ্ছা কতবার জেগেছে। কিন্তু সে কখনই এর উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। আজ আমি তোমার আঙুলে এই আংটি পরাতে পারলে সবচেয়ে সুখি হব। তুমি আমার সেই সুখ থেকে বঞ্চিত করো না।" ও আমার বাঁ হাতের অনামিকায় আংটি পরিয়ে দিল। আমার আঙুলে বেশ খেটে গেল আংটিটা।

শিরির চোখে আবার যেন স্বপ্নের ছোঁয়া। ফ্যাকাসে গালে রক্তিম আভা। আমি শিরির দুই গালে চুমু খেয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

একটি তথ্যচিত্রের খসড়া

চন্দন চক্রবর্তী

চৌমাথার মুখটা এখন বেশ জমজমাট। অনেক গাড়ি, বাইক, রিকশা, অটোর মাখামাখি। কেউ কাউকে মানেনা। এ বলে, আমি আগে যাব ও বলে আমি আগে। ফলে মাঝে মাঝেই দুর্ঘটনা লেগেই ছিল। এখন রাস্তার চারধারেই লাল সবুজ হলুদ আলো জ্বলে। পুলিশেই জ্বালায়। রাস্তার একপাশে গুমটি ঘরে। তাতে যে খুব সুরাহা হয়েছে তা নয়।

রাস্তার একটা মাথা সোজা পুব দিকে সিরিটি শ্মশানের দিকে গেছে। ঠিক ক্রশিং এর আগেই রাস্তার দু'দিকে দুটি পাগল অবস্থান করে। বাঁ দিকে একটা ঝাঁপ বন্ধ করা দোকানের সামনে। সিমেন্টের বাঁধানো চাতাল মতো করা আছে। সেখানে এক পাগল শুয়ে থাকে পশ্চিমমুখো হয়ে। উল্টো ফুটে একটা ময়লা আবর্জনা ফেলার ভ্যাট আছে। তার পাশেই একটা জাফরি ছায়ায় গাছতলায় আর একজন পুবমুখো হয়ে শুয়ে থাকে। অর্থাৎ দুই পাগলের মাথার পজিশন পুরোপুরি উল্টো। উল্টো কেন কেউ জানেনা। তবে কি রেষারেষি। ও পুবে অতএব আমি পশ্চিমে। ওরা কি এক বগ্গা হয়?

অর্ক রোজ দেখে। অদ্ভুত ভুলেও দুজনে একমুখো হয় না। অবশ্য এখানে পাগলের প্রকার ভেদ আছে। পশ্চিমমুখো লোকটিকে ঠিক পাগল বলা যায় কি? অর্ক কিছুটা ধন্দে। সে স্থানীয়। ছেলে বয়সে আর পাঁচটা ছেলে ছোকরার সাথেই বড় হয়েছে। একতা সংঘের পাঁচিলঘেরা মাঠে ভলি বল খেলেছে। অনেক উঁচু পর্যন্ত লাফাতে পারত। নেটের ওপরে জোড়া হাত বাড়িয়ে বলগুলো ভাল ব্লক করত। আপোনেন্টের সমস্ত চাপ মারা বলকে ব্লক করে ফেরৎ পাঠাতে ওস্তাদ ছিল। সবাই বলত দেবর্ষি হচ্ছে গেম ব্লক মাস্টার। কিন্তু একসময় জীবনের কোনও চাপ নিতে পারল না। সেই দেবর্ষি স্কুল কলেজ শেষ করে চাকরিও পেল। বিয়ে করল। দুটি বাচ্চা হল। একটা ছেলে, একটা মেয়ে, খুশি পরিবার। চাকরি চলেও গেল। কেন, অর্ক জানে না। গেছে এইটুকু জানে, হতে পারে অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। অথবা পেন্সিল শিষের মতো ওকে ছেঁটে ফেলেছে। নতুবা চুরি বা অন্য কোনও অন্যায়ের দায়ে ধরা পড়েছিল। অথবা নতুবা কিম্বার মধ্যে ঢুকে লাভ নেই। এটা হামেশাই ঘটছে। নতুনত্ব কিছুই নেই। কিন্তু পাগল হল কেন? সেটা কি চাকরি চলে যাবার জন্য? সেটা যদি হত তাহলে দেশে পাগলে পাগলে ছয়লাপ হয়ে যেত। শুধুমাত্র হাইডরোডের দু'পাশে মৃত কারখানা থেকেই শ'য়ে শ'য়ে পাগল বেরোত। তা কিন্তু ওর ক্ষেত্রে ঠিক খাটেনি। ওর স্ত্রীর বাপের বাড়ির অবস্থা ভালো। তাদের সাহায্যে চলেই যাচ্ছে। খুচখুচ কাজ দেবর্ষিও করছিল। তবে? ওর স্ত্রী বলে, কেউ নাকি তুকতাক করেছে। জলপোড়া —টোড়া খাইয়েছে। কেউ বলতে ওর দুই দাদা এবং তাদের স্ত্রীরা। কারণ পাগলদের খুব সহজে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে উচ্ছেদ করা যায়।

বেচারা প্রথমে মদ ধরল। মদ খেয়ে ওই নির্দিষ্ট চৌহিদ্দির মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকত। পরিষ্কার জামা জুতো এবং ক্রমশ শরীরে ঝুল পড়তে শুরু করল। তারপর জামা ছিঁড়ল। প্যান্ট ফাটল। জুতো হাঁ হল। গালে দাড়ি মাথায় চুলেতে জঞ্জাল বাড়ল। গায়ে মাছি, কানামাছি

খেলতে শুরু করল। পিঁপড়েরা সার দিয়ে হেঁটে যায় খাবারের সন্ধানে। গাছেদের জল খিদে পায়। রোদ খিদে পায়। মানুষের পাকস্থলি হাঁকর পাঁকর করে খিদে মেটাতে চায়। কিন্তু লোকটার কি তাও ছিল না। নাকি পাগলদের ওসব থাকতে নেই?

রাতে কখনও সখনও বাড়ি ফিরত। এক সময়ে বাড়ির সদর দরজা, পেছনের দরজা সব বন্ধ হল। ছেলে মেয়েদের। স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে বাপের পরিচয় লিখতে পারে না। একবার স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে শুনতে হয়েছে। 'ওর বাবা রাস্তার পাগলা না?' স্ত্রীও লজ্জায় বেরোতে পারে না। শেষে ওরা সত্যিই শ্বশুরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। পাগল স্বামীকে ভালো করার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। অথচ কত ঠাকুরবাড়ি, শীতলার থান, এমনকি পাগলের চিকিৎসা করিয়েছিল। কোন স্ত্রী না চায় এক সুন্দর সুস্থ জীবন। সেও তো এক সময় স্বপ্ন দেখতো। কিন্তু তা চুরমার হতে থাকে। বেচারি এখনও সিঁদুর পরে। শাঁখা লোহা পরে। বলতে পারে না স্বামী মৃত। অথচ ওর কাছে মৃতই তো।

এ হেন দেবর্ষি এখন মদ খেয়ে কাঁচা খিস্তি করে। বিড় বিড় করে বকে। একসময় বেহুঁশ হয়ে শুয়ে পড়ে সেই নির্দিষ্ট চাতালে। অর্ক বুঝতে পারে না ওকে কী বলবে? ভিখিরি নাকি মাতাল-পাগল। কিন্তু ওর চোখমুখেও দেখেছিল এক অদ্ভুত মায়াময়তা।

একদিন এক শুনশান দুপুরে বাড়ি ফিরছিল। দেবর্ষি ফুটপাতে এমনভাবে শুয়ে ছিল অর্ক ওকে ক্রশ করে যেতে পারছিল না। ডিঙোতেও অসুবিধা। কোন রকমে পাশ কাটিয়ে যাবার মুহূর্তেই অর্ক শুনতে পেল ওর দপদপ করা জড়ান কণ্ঠস্বর। তেল বিহীন প্রদীপ আলোর মতো। সে কথাও কাঁপে। 'স্যার আই নিড ফুড। নট মানি। শুধু ভাত ডাল হলেই চলবে'। সেই ছেলেবেলার ব্লক মাস্টারের কথা মনে পড়ে অর্কর। মায়া হল। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলেছিল হোটলে গিয়ে খেয়ে নাও'। ওর হাঁটার ক্ষমতা ছিল না। ইশারায় বলেছিল 'নড়তে পারছি না। এনে দাও না'। ওই হোটেলে আমাকে চেনে। 'বলবেন...। যা শালা নামটা কি যেন! ভুলে গেলাম। এই মাত্র ভুলে গেলাম। বিশ্বাস করুন মাইরি।' অর্ক বলল 'দেবর্ষি'।

ও ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। 'মানে' কি বলুনতো? শালা বাপ-মা মানেটা বলে যায়নি।

অর্ক বলেছিল, 'দেবর্ষি মানে' স্বর্গীয় ঋষি। এদের স্থান স্বর্গে। ও হাঁ করে থাকে। 'সেটা কতদূর হেঁটে যাওয়া যায়?'

কিছুক্ষণ অকর বকর করার পর বাচ্চা ছেলের মতো বলল, 'ক্ষিদে পেয়েছে'।

ওর গায়ে তখন ভন ভন করে মাছি উড়ছে। অতিরিক্ত মদ গেলার ফলে চোখ মুখ ফোলা। চোখটা লাল। মোটা ঠোঁটটা ঝুলে গাছে। অর্কর কিছুক্ষণ আগের মায়াটা কর্পূরের মতো উবে গেল। বিতৃষ্ণায় ভরে গেল 'মদ খাবার পয়সা পাও আর খাবার পয়সা পাও না?'

'হে হে মালতো বিনে পয়সায়। রোজ রাতে রিকশাওয়ালার মাধ্যমে বড় বাড়ির লোক পাঠিয়ে দেয়। সঙ্গে চিরকূট। মর, কবে মরবি? একেবারে চোলাই। অব্যর্থ নেশা। ব্যাটা রিকশাওয়ালা হাফ আমি হাফ। ও মাল টেনে রিকশা নিয়ে বাড়ি যায়। আর আমি আউট। বাড়ি ঘর দুনিয়া থেকে...

অর্ক চমকে ওঠে। 'আরে এতো পুরো দুপুরের বাংলা ছবির প্লট'। পঞ্চাশ টাকা গুঁজে দিয়ে অর্ক হাঁটা লাগায়। সেই ঝিম মারা বিষণ্ণ দুপুরে অর্কর বার বার মনে হতে লাগল এটা কেন রূপালি পর্দার 'গল্প' হয়ে থাকল না।'

এতো গেল এ পারের মাতাল চাতাল পাগলের কথা। রাস্তার অন্য পারে লোকটি কিন্তু সত্যিই পুরো পাগল। যদিও দেখলে এখনও সুপুরুষ মনে হয়। ছিপ ছিপে বেশ লম্বা। চোখালো চোখ নাক। লম্বাটে মুখ। রোদ জল ধুলো খাওয়া কালচে তামাটে রঙ। ঝুলুম ঝালুম জটা চুল। মুখে জমা দাড়ি। ভাসা মেঘের মতো চোখটা অদ্ভুতভাবে ভেসে থাকে। অর্ক হ্যাংলার মতো হাঁ করে দেখেছে অনেক দিনই। হঠাৎ ওর মনে হয়েছিল ছবিতে দেখা ক্রুশবিদ্ধ প্রভু যিশুর কথা। কেন ও জানে না। এত সুন্দর চেহারার মানুষটিকেও কি কেউ সম্পত্তির লোভে পাগল করে দিয়েছে। নাকি ব্যর্থতা। জীবনে কিছু না পাওয়া একটা মানুষ, সম্পূর্ণ একা হয়ে যাওয়া মানুষ!

লোকটির নাম কেউ জানে না। কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। কেউ কোনদিন একটা কথা বলতেও শোনে নি। একতা সংঘের ক্লাবের পাঁচিলের ধারে, ময়লা আর্বজনা ফেলার ভ্যাটের পাশে একটা চাওড়া জায়গায় শুয়ে থাকে। বেশির ভাগ সময়ে চিত হয়ে মুখটা আকাশের দিক করে। পোশাক বলে কিছুই নেই। বিশেষ করে নিম্নাঙ্গে এক ফ্যালি ন্যাকড়া কখনও দেখা যায়। শিশ্নটি আর্দ্ধেক উন্মুক্ত। ক্ষিদে পেলে ভ্যাট থেকে ঘেয়ো কুকুরের মতো এঁটোকাটা খায়। মাঝে মাঝে এদিক সেদিক টহল মারে। অবশ্য কাছে পিঠে। অর্ক ছেলেকে স্কুল বাসে তুলে দিতে যাবার সময় সকাল ছ'টায় ওকে ওখানে দেখেছে। সন্ধেতেও আবার রাতেও দেখেছে। একদিন বিয়ে বাড়ি ফেরৎ গভীর রাতেও অর্ক লোকটিকে দেখেছিল। একইভাবে শুয়ে রয়েছে।

উল্টোদিকে দেবর্ষি বিড়বিড় করে কাঁচা খিস্তি করছে আর এই লোকটি? নিথর নিষ্পাপ আকাশের দিকে চেয়ে। কী চায় আকাশের কাছে? নাকি 'পাগলে কি না ভাবে' ভেবে আকাশ ছুঁতে চায়। অর্কর এক বন্ধু সব শুনে বলেছিল 'হয়ত ওর প্রিয় আপনজনেরা সব মরে গিয়ে 'তারা' হয়ে গেছে। তাই ও তারা দেখে। বন্ধুটি হাসে। তোর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই নাকি! অর্ক বলল, 'জানিস। ফিরে শুতে দেখিনি। সর্বদা আকাশমুখো।' ও আবার বন্ধুকে প্রশ্ন করে কিন্তু দিনের বেলাতে তারা কোথায় পাবে? ও তো দিনের বেলাতেও আকাশ দেখে। এবারে বন্ধুটি উচ্চস্বরে হো হো হাসে। 'কেন? রাতের সব তারাই আছে। দিনের আলোর গভীরে' বুড়ো কবি বলে গেছে। সব সত্য। এই অ্যাখ্যানের আর একটি চরিত্র আছে। না, সে পাগল নয়। সে একজন ফল বিক্রেতা। আসে সেনহাটি কলোনি থেকে। চার চাকা ভ্যানে চাঙারি করে ফল এনে বেচে। ভ্যানের ওপরেই একটা ছোট জায়গা করে নিয়ে বসে। কোমরে কালো কাপড়ের পয়সার থলি।

সঙ্গে থাকে দাড়ি পাল্লা। কিছু বাটকারা আর সবুজ প্ল্যাস্টিক বোতলে জল। বসে ঠিক দেবর্ষির সামনে ফাঁকা কিছুটা অংশ জুড়ে। নাম আলমগীর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, পৃথিবীজয়ী। সে পৃথিবী

জয় করেনি। কিন্তু স্থানীয় মানুষের মন জয় করেছে। তার ব্যবহারে। বাজার থেকে কমপক্ষে পাঁচটাকা কম রেটে দেয়। তাই খদ্দেরও কম নয়।

অর্কর সাথেও আলমগীরের বেশ ভাবসাব আছে। রথ দেখা কলা বেচার মতো ছেলের স্কুল বা অফিস ফেরৎ ফলও কেনে আবার গল্পগাছাও করে। অর্কর আসল টার্গেট ওই দু'পাশে দুই পাগলের ক্রিয়াকর্ম।

এক সন্ধেতে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করছিল,'তোমার পেছনে এবং সামনে দুধরনের দুই পাগল। ওরা কি তোমার পাহারদার নাকি?

আলমগীর হাসে। উল্টোফুটের পাগলটা সম্বন্ধে বলতে পারব না। তবে পিছনের মাতাল পাগলটি কিন্তু লক্ষ্য রাখে। মাঝে মাঝে সন্ধেতে উল্টো দিকের কলে জল ভরতে গেলে ব্যাটা ঠিক লক্ষ্য রাখে। বদলা হিসাবে দাগি পচা ফল দিলে ব্যাটা খেয়ে নেয়।

'আর উল্টোদিকের পাগলটা যে নজর রাখেনা সেটা তুমি নিশ্চিত হচ্ছ কি করে?'

'লোকটার চেহারাখানা দেখেছেন? ব্যাটা কোনও বড় ঘরের। ভাগ্যের ফেরে পাগল। মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে ব্যাটা পুলিশের লোক নয়তো?'

'দূর বদ্ধ পাগল না হলে কেউ ওরকম হাফ ল্যাংটো হয়ে হয়ে শিশ্ন বার করে ঘুরে বেড়ায়?'

'ওই কারণে তো এদিকে এলে হ্যাট হুট করে তাড়াই, মাঝে মাঝে দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে জল ছুঁড়ি। তখন পালায়। পাগলের আবার গুমর আছে। একদিন একটা থ্যাতলান পাকা আম দিতে গিয়েছিলাম। নেয়নি। উল্টে ঠোঁট উল্টে পালিয়ে গিয়েছিল।'

ওর খদ্দের এসে পড়ে। আলমগীর ফল বেচায় মন দেয়। অর্ক একটা সিগারেট ধরিয়ে দাঁড়ায়। হলই বা পাগল! মানুষ তো। সারাদিন একটাও কথা না বলে থাকে কী করে! পাগলদের কি আলাদা কোন পাকস্থলি তৈরি হয়ে যায়। বেড়াল কুকুরের মতো এঁটোকাটা আবর্জনা খেয়ে রোগ ভোগ ছাড়াই কি করে বেঁচে থাকে? নাকি পাগলরা কুকুর বিড়াল হয়ে যায়! অর্থাৎ পাগল হল গে রাস্তার চারপেয়ে জন্তু।

এ ভাবেই চলছিল। একই রাস্তা দিয়ে অর্কর বারবার যাতায়াত। দুটো ভিন্নধর্মী পাগল দেখা। সন্ধেতে আলমগীরের থেকে কখনও ফল কেনা। মাঝে মাঝে দু'চার কথা। নতুনত্ব কিছু নেই। আখ্যানও থমকে।

নাহ! থমকে গেল না। একদিন ঝড়ের গতিতে সামনে এগোল। সন্ধে হয়েছে। ... গরমের পর এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। বাতাসে ঠান্ডা ভাব। অর্ক চৌমাথার অপর প্রান্তে। পান দোকান থেকে একটা একশ বিশ জর্দা পান মুখে পুরল। খোশ মেজাজে নিরীক্ষণ করছিল অন্য দুপারে দুই পাগল এবং আলমগীরকে। আলমগীরের দোকানে খদ্দের ছিল না। ও প্লাস্টিকের বোতল নিয়ে খাবার জল আনতে গিয়েছিল। একটু দূরেই টিউবওয়েল থেকে। ভালো কথা জল ফুরিয়েছে। জল আনতে গেছে। এর মধ্যে নুতনত্ব কিছু নেই। হঠাৎ দেখা গেল ল্যাংটো

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

পাগলটি দৌড়চ্ছে পুব দিকে, পিছু নিয়েছে কয়েকজন 'চোর চোর' বলে। 'চোর' চিৎকার শুনে আলমগীর চকিতে দৌড়ে এল দোকানের দিকে। অতঃপর সে'ও দৌড়তে লাগল উর্দ্ধশ্বাসে। 'হায়রে আমার সব্বনাশ হয়ে গেল'।

মুহূর্তের ঘটনায় অর্ক স্তম্ভিত বিচলিত। ব্যাপার কী? ওর পাগল নায়ক শেষে 'চোর' বনে গেল! মনে ক্ষীণ আশা। নাহএ হতে পারে না। ওযে পাগল দু'জনকে নিয়ে নিদেন পক্ষে 'পাগল' শিরোনামে একটা তথ্যচিত্র বানাবে ভেবেছিল। এই তার পরিণতি।

নাহ দেখা যাক। অর্কও পিছু নিল। বয়সের ভারে কিছুটা মন্থর। তবে বেশি দূর যেতে হল না। সম্ভবত পৃথিবীতে! কোনও রাস্তার পাগলই শুকনো পেট, মন দিয়ে বেশি দূর দৌড়তে পারে না। মনমোহন পার্কের সামনে জটলা। দেখা গেল চোরটি বামাল সমেত ধরা পড়েছে।

দেবর্ষির টুঁটি চেপে ধরে আছে অপর পাগলটি। দুজনেরই বুক দুটো হাপরের মতো ওঠা নামা করছে। ওরা হাঁপাছে। দেবর্ষির পেটে নিশ্চই মদ পড়েনি। না হলে এতটুকু পথই বা ছুটল কি করে? দেবর্ষির হাতে আলমগীরের কালো রঙের টাকার থলি। ওর নড়বড়ে শরীরটা কাঁপছে। আলমগীর যেন ধড়ে প্রাণ পেল। টাকার থলি নিয়ে টাকা গুনতে থাকে। নাহ মহাজনের জন্য রাখা সাতহাজার টাকাই আছে। ওর মুখে হাসি।

দু'চারটে চড় খেতেই দেবর্ষি রাস্তায় বেহুঁশ। কিন্তু অপর পাগলটা? যে ধরিয়ে দিল।

সে কোথায় গেল?

কেউ দেখল না। খেয়াল করল না। বৃষ্টি স্নান করা কালো রাস্তা ধরে একটি বেতের মতো কালো ছিপছিপে শরীর সিরিটি শ্মশানের দিকে হেঁটে চলেছে। অর্ক সময় নষ্ট না করে পিছু নিল। তথ্যচিত্রের খসড়টা যে এখনও শেষ হয়নি।

প্রবন্ধ

গল্পকার শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় : একটি প্রাতিস্বিক বীক্ষণ

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি তুমি গদ্যের
সভায় যেতে চাও?
যাও।
পা যেন টলেনা, চোখে
সব কিছুকে—তুচ্ছ করে দেওয়া
কিছুটা ঔদাস্য যেন থাকে।
যেন লোকে বলে,
সভাস্থলে
আসবার ছিল না কথা,
তবুও সম্রাট এসেছেন।
—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

যে কবির প্রবাদ প্রতিম পঙ্‌ক্তি, 'রাত বারোটার পর কলকাতা শাসন করে চারজন যুবক' কবিতা প্রেমীদের মুখে মুখে আজও উচ্চারিত হয়, তিনি কিন্তু প্রথমাবধি কবিতার পাশাপাশি গল্প রচনাও করেছেন—এবং একেবারে শুরুর দিকে গল্প স্বনামে লিখলেও, কবিতা লিখতেন নমিতা মুখোপাধ্যায় নামে।[1] ভাবতে আশ্চর্য লাগে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন ক্ষমতাবান লেখক তাঁর নিজস্ব রচনা সম্পর্কে কী ভয়ানক মাত্রায় নির্মোহ। তিনি লিখেছেন "গল্প আমি কবিতার পাশাপাশি আগেও অনেক লিখেছি। কিন্তু চল্লিশ বছর বয়েস হওয়ার আগের সব লেখাকে নির্মমভাবে বর্জন করেছি এই ভেবে যে, বয়স পরিণত না হলে নিরীক্ষণ শক্তি স্বচ্ছ হয় না। এই সংগ্রহে সুতরাং আমার প্রায় সব গল্পই চল্লিশোর্ধ্ব কালের রচনা।[2] বিভিন্ন চরিত্রের নাম, গল্পের নামকরণ—ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও তিনি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তাঁর এই ভাবনাগুলিকে শুধুমাত্র ভাবনার স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখেননি তিনি। গল্প লেখার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে একটি বই পর্যন্ত লিখেছেন শরৎকুমার। এর থেকেই বোঝা যায় গল্প লেখার ব্যাপারটিকে তিনি কত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে নীরেন্দ্রনাথের পথনির্দেশ সম্যকভাবে পালন করেছেন—তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য মানুষ। এ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ "চলমান জীবনকে সম্পূর্ণ দেখানো যায় না, ছোটগল্পের এই হল এক প্রধান সমস্যা। আবার প্রধান মজাও। এক লহমা দৃষ্টিপাতে ঘটনা ও পরিস্থিতি থেকে নিগূঢ় সত্যকে আবিষ্কার করা এবং তারপর বিশ্বাসযোগ্যভাবে তাকে উপস্থাপিত করা, প্রথম থেকে শেষ অবধি পাঠককে হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে চলা—এই এই হল ছোটগল্পের কৌশলের দিক। কোথা থেকে শুরু করতে হবে, কীভাবে শেষ করতে হবে কী পরম্পরায় টাল খেতে খেতে এগোবে গল্প তার লক্ষ্যের

দিকে—এ সবের হিসেব শুধু প্রতিভা দিয়ে করা যায় না। কিছু মুনশিয়ানাও লাগে। নিগূঢ় সত্য কখনও ধূলোর নীচে, কখনও সাজগোজের আড়ালে, আবার কখনও সোনার কৌটোর মধ্যে পোকার মতো চাপা থাকে। তাকে খুঁজে বার করতে গবেষকের অনুসন্ধিৎসা দরকার হয়। লেখককে এ কথাও মনে রাখতে হয় যে, প্রখর আলোর সামনে পড়ে গেলে পাঠক তা সহ্য করতে পারবে না। চোখ বুজে ফেলবে। তার কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া যাবে না। তাই উপস্থাপনে লেখক সাংকেতিকতার আশ্রয় নেন। আভাসে ইঙ্গিতে কাজ সারেন। মনোযোগী পাঠক তাতেই বুঝে ফেলে ব্যাপারটা। ছবিতে গল্প দেখতে অভ্যস্ত এই প্রজন্মের অধৈর্য পাঠক এত সব সূক্ষ্ম কারুকাজ ধরতে পারে না আজকাল। তাই 'তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর যখন টেলিফোন পাই, 'আপনার কুকুর নিয়ে গল্পটি ভালো লাগল,' তখন দুঃখ, হয়। আমি কী করে বোঝাব ওটা কুকুর নিয়ে গল্প নয়, কি 'বালি' মেয়ে পকেটমার নিয়ে গল্প নয়? বা 'সেমিকোলন' পেনশন নিয়ে গল্প নয়—সবই সংকটে পড়ে যাওয়া অসহায় মানুষের গল্প। তার প্রতি লেখকের সহানুভূতি আছে।"[3]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হয় একারণেই যে শরৎ কুমারের গল্পের বিশ্লেষণে প্রবেশ করার পূর্বে ছোটোগল্প সম্পর্কে তাঁর প্রাতিস্বিক বীক্ষণটি সম্পর্কে আমাদের একটি সম্যক ধারণা অত্যন্ত আবশ্যক। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অসহায় মানুষের অস্তিত্বের সংকটকেই তিনি তাঁর গল্পগুলিতে বিম্বিত করেছেন। নানা রূপে নানা বর্ণে নানা বৈচিত্র্যে বিভিন্ন চরিত্রের আনাগোনা তাঁর গল্পের শোভাযাত্রায়। স্বভাবতই বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের অন্তর এবং বাহির তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের আলোয় উদ্ভাসিত—চরিত্রের গভীর গোপন অন্তঃস্থ অনুষঙ্গও গোপন থাকেনি লেখকের রঞ্জন-রশ্মি সদৃশ দৃষ্টির তীব্রতার সামনে। সুতরাং তাঁর গল্পের প্রকরণ সম্পর্কে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় প্লটের বিন্যাসকে গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও চরিত্রচিত্রণকেই তিনি সমধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তঃসম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের জটিল বিন্যাসের স্তর পরম্পরা তিনি যখন উন্মোচন করেন তখন তার পরতে পরতে মানবমনের গভীর গহন রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষের মন সর্বাপেক্ষা জটিল রহস্যময় ও বিভ্রান্তিকর। মনঃসমীক্ষণের প্রবর্তক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) নির্জ্ঞান মনের অবস্থান বোঝাতে গিয়ে মনকে ভৌগোলিক গভীরতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই ভৌগোলিক গভীরতার সব চাইতে ওপরের যে স্তর তা হলো সংজ্ঞান বা চেতন। তার চাইতে নীচের স্তরটি হলো আসংজ্ঞান বা অবচেতন এবং গভীরতম স্তরটি হলো নির্জ্ঞান।....ফ্রয়েডকে অনুসরণ করে মনের এই তিনটি অংশকে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যায়।

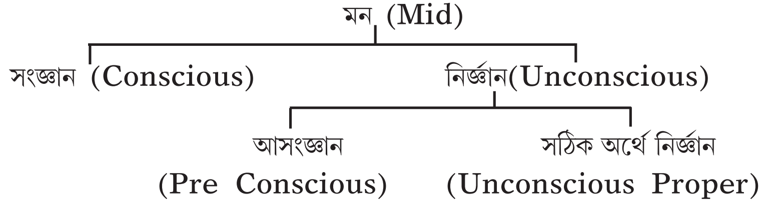

নিয়ন্ত্রণকর্তা হিসেবে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নির্জ্ঞান মনে দুই ধরণের উপাদান আছে। একটি হলো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জন্মগত বৃত্তি যথা কামবৃত্তি—ও আক্রমবৃত্তি আর কিছু অবদমিত কামনা বাসনা। কামবৃত্তিকে অন্য অর্থে বলা যায় গঠনমূলক অর্থাৎ তার প্রধান কাজ হচ্ছে বন্ধনের সাহায্যে গঠন। আর আক্রমবৃত্তিকে বলা হয় ধ্বংসমূলক অর্থাৎ ভার-প্রধান কাজ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে ধ্বংস। যে আদিম মৌলিক চাহিদাগুলি আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে তা হচ্ছে প্রবৃত্তি এবং তার পেছনে যে মানসিক শক্তি কাজ করে তা হচ্ছে তাড়না বা drive। নিউটনের মতে যেমন সমস্ত ক্রিয়া (action) বা গতি (motion)-র পেছনে কোনো না কোনো শক্তি কাজ করে, তেমনি ফ্রয়েডের মতেও সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার পেছনে এই কামশক্তি এবং ধ্বংসাত্মক শক্তি কাজ করে"....

এবার একটা প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে যে যদি নির্জ্ঞান অংশ সজ্ঞান অংশে প্রভাব ফেলে, তাহলে নির্জ্ঞানের বিষয়গুলোকে ক্রিয়াশীল করার জন্য তো কাউকে দরকার। নিয়ন্ত্রণকর্তা কে? নির্জ্ঞান মনের তাড়নাগুলোকেই বা কে নিয়ন্ত্রণ করছে? অবদমন ক্রিয়াই বা কার দ্বারা সাধিত হচ্ছে? প্রহরীর কাজই বা কে করে? ফ্রয়েড তখন তার 'The ego and the Id (1923) গ্রন্থে Id, Ego, Superego অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকর্তা হিসেবে অদস্, অহস্ অধিশাস্তাকে ধরে নিয়ে মনের গঠনকে ব্যাখ্যা করলেন। এই অদস্ অহম্, অধিশাস্তাকে নিয়ে মনের যে গঠন আমরা পাই তাকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন 'মানসিক যন্ত্র'।

সাদসের সঙ্গে নির্জ্ঞান গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত। অদসের এক অংশে থাকে জন্মগত প্রবৃত্তি আর অন্যদিকে থাকে অবদমিত কামনা বাসনা।"

"কামজ সুখ ভোগ করে তৃপ্তি লাভ করাই যেহেতু অদমের একমাত্র লক্ষ্য, তাই অদস্ সর্বদা সুখ সূত্র (Pleasure Principle) দ্বারা চালিত হয়।... অদসে 'না'-এর কোনো অস্তিত্ব নেই। সর্বদাই প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন হবে না—এই বোধ অদসের নেই। অদসের কাল বা 'time' এর কোনো ধারণা নেই। আমাদের শৈশবের কোনো অবদমিত ইচ্ছা, বর্তমানের ইচ্ছার পাশাপাশি উপস্থিত থাকতে পারে।

অদস্ যেহেতু সর্বদা সুখ-সূত্র দ্বারা পরিচালিত তাই এখানে যুক্তি তর্কের কোনো বালাই নেই। এখানে পরস্পর বিরোধী কামনা অর্থাৎ ভালোবাসা এবং ঘৃণা একই সঙ্গে পাশাপাশি উপস্থিত থাকতে পারে।

অদস্ যেহেতু সর্বদা সুখ-সূত্র দ্বারা পরিচালিত তাই এখানে যুক্তিতর্কের কোনো বালাই নেই। এখানে পরস্পর বিরোধী কামনা অর্থাৎ ভালোবাসা এবং ঘৃণা একই সঙ্গে পাশাপাশি উপস্থিত থাকতে পারে।

তাই বোঝা গেল অদস্ সম্পূর্ণভাবে বাস্তববোধহীন। এই অদস্ যখন তার কামনা বাসনার তৃপ্তি লাভের জন্য বাস্তবের মুখোমুখি হয়, তখন বুঝতে পারে তার কামনা বাসনা বাস্তবসম্মত নয়। অদসের এই বোধের কারণে তারই একটা অংশ থেকে অহম্-এর সৃষ্টি। শিশুর অহম্ বোধ

গড়ে ওঠার পর শিশুর অহম্ বুঝতে পারে যে বাস্তবের সাহায্য ছাড়া তার কোনো প্রবৃত্তিগত চাহিদাই মিটবে না, দ্বিতীয়ত: সব চাহিদা মিটবে না। অহমের কাজ হচ্ছে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে, প্রবৃত্তিগত চাহিদার ফলাফল কী হতে পারে নির্ধারণ করে, তবেই প্রবৃত্তিগত চাহিদার তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করা বর্তমানে বিশেষ ক্ষেত্রে উচিত কি উচিত নয়। অথবা যদি বুঝতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে সেই চাহিদাকে অবদমিত করে। এভাবেই পরিমিত সুখ-সূত্র ও বাস্তব সূত্র (Reality Principle) দ্বারা অহম পরিচালিত হয়। অবদমন বজায় রাখতে গেলে সামাজিক শিক্ষা, নীতিশিক্ষাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শিশু বড় হবার সাথে সাথে তার অহম্ যত বাস্তবের সংস্পর্শে আসে, তত তার বাস্তববোধ জাগ্রত হতে থাকে। পাশাপাশি বাস্তব জগতের সঙ্গে মানিয়ে চলার শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। মনের ভেতরে যে 'প্রহরী' বসে আছে, যে অদমের কামনা বামনাকে সহজে সংজ্ঞান মনে আসার অনুমতি দেয় না, সেই কাজ অহম্‌ই করে। অহমের মূল কাজ হলো বাস্তবকে বুঝে চলা। অহমের একাংশ নির্জ্ঞান স্তরে থাকে, এবং সেখানে সমাজ যে প্রবৃত্তিগুলো অনুমোদন করে না, তাদের চেপে রাখার চেষ্টা করে, অথবা প্রবৃত্তিগুলো পরিমার্জিত করার চেষ্টা করে। অথবা প্রবৃত্তিগুলো পরিমার্জিত করার চেষ্টা করে। তাহলে বলা যেতে পারে, যে অহম্‌কে আমরা সচেতন বলে জেনেছি, সেই অহম্ যখন মনের নির্জ্ঞান স্তরে বসে কাজ করে, যেহেতু সেই স্তর সম্পর্কে আমরা জানতে পারি না-তাই নির্জ্ঞান স্তরে অহমের কাজও আমরা বুঝতে পারি না। মনের গভীরে এইসব কাজ ক্রমাগত চলছে বলে আমরা সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারি। এখানে একটা বিষয় বোঝা দরকার—প্রবৃত্তিগুলো, যারা নির্জ্ঞানে বাস করে, তারা কখনও তৃপ্তিলাভ করে না! তৃপ্তিলাভ করে অহম্।'.........অহম যখন প্রবৃত্তিগত চাহিদার তৃপ্তিসাধনের জন্য বাস্তবের মুখোমুখি হয়, তখন যদি সে বুঝতে পারে যে চাহিদার তৃপ্তি সাধনের মধ্য দিয়ে কোনো অসুখকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে তাহলে সে উৎকণ্ঠার অবস্থার সৃষ্টি করে।

অদস্ অহমের পাশাপাশি দেখা যায় যে, শিশু যতই বড় হয়ে উঠতে থাকে ততই বাবা, মা, গুরুজন, প্রতিবেশী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলের কাছ থেকে উচিত, অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। তখন থেকে সে পায় তার নৈতিক শিক্ষা। অহমের একটা অংশ এই শিক্ষাকে ধরে ধরে আত্মস্থ করে অধিশাস্তা বা Super Ego-তে পরিণত হয়। অধিশাস্তার নির্দেশ হলো বিবেকের নির্দেশ।"[৪]

মানবমনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে এই বিস্তারিত আলোচনাটির উল্লেখ করা হল এই কারণে যে আমরা যখন শরৎকুমারের বিভিন্ন গল্পের বিশ্লেষণে ব্রতী হব তখন এই আলোচনা-লব্ধ উপকরণগুলি বিভিন্ন চরিত্রের ক্রিয়াকলাপকে বুঝতে সাহায্য করবে। প্রসঙ্গত 'ইচ্ছাপুরম' (১৯৮৭) গল্পটির কথাই ধরা যাক। গল্পটির শুরু হচ্ছে এইভাবে ঃ

"কথায় কথায় ফিগারের কথা উঠল।

রাজা রাও বলে, 'আপনার ফিগার কিন্তু বয়সের তুলনায় অত্যন্ত ভাল আছে। রাখতে হয়।'

রূপা একবার অলকার দিকে তাকায়। তারপর সমুদ্রের দিকে।" দুটি দম্পতিকে আমরা এই গল্পে প্রত্যক্ষ করি। রূপা-পার্থ আর রাজা রাও-অলকা। রূপা-পার্থর ষোল বছর অতিক্রান্ত দাম্পত্যে একঘেয়েমির মরচের আস্তরণ যখন দানা বাঁধতে শুরু করেছে, তারা সিদ্ধান্ত নেয় সংসারের প্রাত্যহিকতা থেকে স্বাদবদলের জন্য-দু-মাসের দীর্ঘ ভ্রমণে শামিল হবে। রূপার সঙ্গে তার কলেজবেলার বন্ধু অলকার দেখা হয়ে যায় ওয়ালটেয়ারের মেরিন ড্রাইভ অঞ্চলে। স্বামী জাহাজের ইঞ্জিনিয়র, ন' মাস বাইরে থাকে, তিন মাস দেশে। তখন একেবারে ছুটি—এখন ওর ছুটি চলছে। বন্ধুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় অলকা। সেখানেই অলকার স্বামী রাজা রাওয়ের সঙ্গে রূপার পরিচয়। অলকাদের চার সন্তান। রাজা রাও সম্বন্ধে রূপা ভাবে সে এক নিষ্ঠুর পুরুষ, সে ন' মাস বাইরে থাকে আর যখন ছুটিতে আসে স্ত্রীকে গর্ভবতী করা, সারাদিন অল্প অল্প মদ্যপান করা আর গান বাজানো ছাড়া তার কোনো কাজ নেই। সংসারের কোনো কাজে সে এগিয়ে আসে না। তার ভাবগতিক, কথাবার্তা রূপার ঠিক সুবিধের মনে হয় না। যখন রাজা রাও রাতে রূপাকে তার হোটেলে ছাড়তে গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়, তখন সে যথেষ্ট শঙ্কিত ছিল—তাকে একা পেয়ে রাজা রাও পাছে কোনো সুযোগ না নেয়। তারপর হোটেলে পৌঁছে রূপা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পার্থ তার জন্য হোটেলে অপেক্ষা করে আছে। রাজা রাও "রূপার ফিগারের প্রশংসা করেছিল সন্ধেবেলা। কেন? খুশি করতে? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রূপা ভাবে একটু অঘটন ঘটলে কী আর ক্ষতি হত? বোরডমের ওষুধ কী, ও নাকি তা জানে। রূপার মনে হয় সব বাজে কথা। লোকটার চরিত্রে নোনা লেগেছে।"

আমরা যদি মনোবিজ্ঞানের আলোকে রূপা চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করি তাহলে হয়তো তার চরিত্রের এই বৈপরীত্যটিকে কিছুটা অনুধাবন করতে পারব। আপাত দৃষ্টিতে পাঠকের মনে হতেই পারে যে রূপা রাজা রাওয়ের সঙ্গে একা গাড়িতে ফেরার ব্যাপারে যথেষ্ট শঙ্কিত ছিলেন, এমনকি হোটেলে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন, তিনি কোনো অঘটন ঘটেনি বলে শুধু আফশোস করেই ক্ষান্ত হন না, রাজা রাওয়ের ওপর যথেষ্ট ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন— এটা কী করে সম্ভব। সমাজনিয়ন্ত্রিত নীতি নিয়মের নিগড়ে, অধিশাস্তা (Super-ego) শাসন করে মানব মনের সংজ্ঞান অংশকে—তাই রূপাও ভয় পায় রাও-এর তরফে অনভিপ্রেত কোনো আগ্রাসনকে—কিন্তু যখনই সেই সম্ভাবনা অতিক্রান্ত হয়ে স্বস্তির পরিসরে প্রবেশ করে সে, তখনই তাঁর নির্জ্ঞান মন থেকে অবদমিত কামনা অদসের তাড়নায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। নিভে যাওয়া দাম্পত্যে ইন্ধন যোগায় একটি সুবর্ণ সুযোগের হাতছানি—ইচ্ছাপূরণের সমূহ উদ্‌যাপন ধূলিসাৎ হয়ে যায় রাজা-রাও-এর উদাসীনতায়—রূপা এই উপেক্ষা সহ্য করতে পারে না। কী বিচিত্র মানবমনের লীলাখেলা। রূপার মানসলোকে গুঞ্জরিত হতে থাকে হয়তো শৈশবে পঠিত কোনো পঙ্‌ক্তি 'রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা/এমন কেন সত্যি হয় না আহা/' পাঠক লক্ষ করুণ শরৎকুমারের অমোঘ ও অভ্রান্ত নামকরণ—'ইচ্ছাপুরম'।

'খেলাঘর' (১৯৭৪)—উচ্চবিত্ত সমাজের গল্প। যৌনতার মধ্যযুগীয় সংস্কার এদের নেই।

দুটি দম্পতি আর দুই নারী একত্রে পানাহারে রত। তারা মুক্তভাবে মেলামেশা করে, যেহেতু এদের সমাজে এটি প্রচলিত রীতি, কেউ কিছু মনে করে না। হঠাৎ বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে—অন্ধকারে বেবি নাম্নী নারীটিকে কেউ পেছন থেকে দু হাত দিয়ে প্রথমে ওর কোমর পরে ওর বুক চেপে ধরে। বেবি বাধা দিল না। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে হাত দুটোকে খেলতে দিল খানিকক্ষণ। তারপর একসময় চলে গেল হাতটা। বেবি কিন্তু ব্যাপারটাকে বরদাস্ত করল না "প্রচণ্ড চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "টেড, তুমি দেখেছ? দেখছ, কে আমায় অপমান করল? এদের মধ্যে কে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আমার বুকে হাত দিয়েছে, তুমি বলতে পারো, টেড? বলতে পারো?" কিছুক্ষণ আগেই উৎপলের সঙ্গে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আলিঙ্গন করেছে যদিও চুম্বনের প্রস্তাবে সে রাজি হয়নি, সেই বেবি এখন ক্রোধে ফেটে পড়েছে—অন্ধকারের সুযোগে তার শরীর স্পর্শ করার জন্য। এর পর রীনা ও জয়তী তাদের স্বামীদের নির্দোষ প্রমাণ করার তাগিদে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সবাই যখন বেবিকে প্রশমিত করতে সচেষ্ট, এমন কী তার গর্ভনেস তথা বন্ধু মীরাদিও, তখন সর্বসমক্ষে বেবি একটি কাণ্ড করে বসে—সে তার উর্দ্ধাঙ্গ উন্মোচিত করে দেয় শার্টের জিপ খুলে।

"কী আছে এতে এ্যাঁ বেবি কাতর স্বরে জানায়, "তোমাদের এত লোভ কীসের জন্যে?

গল্পটির আরো দুটি পর্যায় আছে। বেবির বাবা কার্ডিওলজিষ্ট দীপঙ্কর সরকার, মীরাকে নিয়োগ করেছেন লেসবিয়ান বেবির দেখা শোনার জন্য—যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে তার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে ওঠেন লোকচক্ষুর আড়ালে—এবং বেবির মাতৃত্বের অধিকারেও তিনি অন্য কাউকে ভাগ দিতে নারাজ।

এর পরেও একটি আরশোলা দম্পতির (চিক্ আর তি) গল্প বুনে দিয়েছেন লেখক মূল গল্পটির অন্তরালে। এই আরশোলা দম্পতির একটিই উদ্দেশ্য—অন্ধকারের সুযোগে খাদ্যসামগ্রীর সন্ধান করা—উত্তম সব খাদ্যকণা ও পানীয়ের স্বাদ নিতে তারা তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের বিবাহ বাসরের উৎসব জমে ওঠে তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের সমবেত শুভেচ্ছায়। বাচ্চারা ছোটাছুটি করে প্রচুর খাদ্যকণার সদ্ব্যবহার করে—এতই অপর্যাপ্ত যে তারা শেষ করতে পারবে বলে মনে হয় না, ধাড়িরা কিছুটা সন্তর্পনে চলাফেরা করে।

আমাদের মনে রাখতে হবে পূর্বোদ্ধৃত ভূমিকায় উল্লিখিত লেখকের সাবধান বাণী—আরশোলা নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতীকী উপস্থাপনা—সমাজের সেই বিশেষ শ্রেণির সর্বহারা মানুষ যাদের কাছে উদরপূর্তিই জীবনের প্রধান সমস্যা।

'পানতুয়া' (১৯৮৬)—গল্পের বিষয় একটি জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যা। প্রতিনিয়ত উদয়াস্ত পরিশ্রম করে বাবুদের বাড়ির প্রত্যেক সদস্যের নিজস্ব কর্মকাণ্ডকে যারা সচল রাখে, তারা বিনিময়ে কতটুকু প্রতিদান পায়। কাজের মেয়ে মেনকা তার দুই কন্যাকে নিয়ে মনিবের আবাসনের পুজোয় খেতে এসেছিল। সেখানে তথাকথিত ভদ্রমানুষেরা দুটি বালিকার এভাবে খাওয়া বেআইনি ঘোষণা করে। প্রতিবাদে সরব হয়ে মেনকা এই অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জে

ওঠে—এবং দুই মেয়েকে নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়। বড় মেয়ে মুকুলের আর পানতুয়া খাওয়া হয় না—যদিও তার ছোট বোন দুটি পানতুয়া পেয়েছে।

মুকুল বুঝতে পারে না মা কেন এত রেগে গেল।

"মুকুল জানে না, ওই বয়সের মেয়ের পক্ষে বাবুদের বাড়িতে বাচ্চা খেলাবার চাকরি করারও কথা নয়। ছোট বোন আকুল, তারও কথা নয় হেঁসেল ঠেলার। নেমন্তন্ন না হোক, রোজ দু'বেলা ভাত-ডাল-তরকারি পেট ভরে খাবার জন্মগত অধিকার ওদের আছে. বাপ না থাকলে সে অধিকার চলে যায় না। এসব কিছুই জানে না মুকুল, তাই ফোকটে খেতে পেলে ধন্য হয়ে যায়। মেনকাও কি জানে, সংবিধানে কী লেখা আছে, না আছে/ তবে ও বোধহয় কিছু কিছু টের পায়। ওর অ্যান্টিনা খুব প্রখর।"

'অনুকার আমি' (১৯৮৪) গল্পটিতে নববধূ তনুকা শ্বশুরবাড়িতে ক্রমশ সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে—তার মিশুকে চরিত্রের গুণে। এমন কী তার বড় জা মিতালিকেও সে আপন করে নেয়—তার চরিত্রের গ্রাম্যতাকেও সে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেনা আর পাঁচটা শহুরে মেয়ের মতো। মিতালির বর্ণনায় শরৎকুমার তাই গ্রাম্যভাষাই ব্যবহার করেন—অশিষ্ট শব্দের প্রয়োগেও তাঁর কোনো কুণ্ঠা নেই ঃ

"ফরসা, চিপসি মোটা। গোলপানা মুখ। এত বড় বড় মাই। কালীঘাটের পটের মতো দেখতে। সাত বছর বিয়ে হয়েছে। এখনও সিঁথি জুড়ে লম্বা সিঁদুর পরে, কপালে বিশাল টিপ। প্রতি শনিবার যত্ন করে আলতা পরে পায়।"

তাদের মেয়ে তিন বছরের ফুটফুটে তিন্নিকেও আপন করে নেয় তনুকা। চন্দনের আপত্তি সত্ত্বেও ভোরবেলা সে যখন এসে দখল করে তাদের বিছানা—সে হাসিমুখে প্রশ্রয় দেয় শিশুর অত্যাচারকে। এরপরে একদিন একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল তনুকার নিস্তরঙ্গ জীবনে। শ্বশুরবাড়িতে সবাইয়ের সব আব্দার মেটানোর পরে তনুকা নিজের জন্য বরাদ্দ করে নেয় কিছুটা সময়—সেটা তার বাথরুমে হারিয়ে যাবার সময়। বাথটব গিজার আর মানুষ প্রমাণ আয়নার অমোঘ আকর্ষণে কোথা দিয়ে যে দেড়ঘণ্টা সময় কেটে যায় ও বুঝতেও পারেনা। সে দিন সে হঠাৎই আবিষ্কার করে জানালার কাচে একজনের মুখ। সে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে সবার কাছে জানতে চায় কে সেই অপরাধী। কেউ অপরাধ স্বীকার করে না। অস্বস্তি বাড়তে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবাই ভুলে যায় ঘটনাটি। একজন ছাড়া। "কেবল ভুলতে পারে না চন্দন। কালপ্রিট চন্দনের মনের মধ্যে দৃশ্যটা লেগে থাকে। তনুকার উলঙ্গ শরীরের ওপর নীল-সবুজ কাচের আলো পড়েছে। একটা পা সামনের দিকে বাড়িয়ে দাঁড়ানো, উলঙ্গ এবং বাঁকা পিঠের ওপর চুলের ঝাড় ছড়িয়ে পড়েছে। হাতদুটো মুখখানাকে ধরে রয়েছে ফুলদানির মতো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছে তনুকা। না, দাঁড়িয়ে না, একটু একটু নাচছে যেন। স্তন দুটো দুলে দুলে উঠছে, ওই তো। কী সুন্দর, রাজ হাঁসের মতো বাঁকা ওর গলার কাছটা, লহরিত ওর সমস্ত শরীর। স্বামী হয়েও চারকোণা জগতের মানুষ চন্দন স্ত্রীর এই রূপ কোনও দিন প্রত্যক্ষ করেনি।"

এরপর একদিন, ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তে চন্দন কবুল করে তার কৃতকর্মের কথা।

"মনে হল, তুমি না, আমি কোনও ছবি দেখছি। পেইন্টিং।"

"ও তুমি।" তনুকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে যায়। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর চন্দনের হাতখানা সরিয়ে দিতে দিতে বলে, "আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ সর্বত্র সবই তো তোমার চেনা। তাই না? এই ঠোঁট, নাক, কপাল, বুক, কোমর, এই আমার পা দুটো-এর সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা কম হয়নি। এই আমার শরীর। বিছানার এই আমি শোবার ঘরের আমি তোমার বউ। কিন্তু বাথরুমের আমিটা আলাদা মানুষ। একলা। কেউ তাকে চেনে না। কারুর সঙ্গে তার ভাব নেই।"

চন্দন বলে—"সেদিন উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়ে তাই, মনে হল।"

তনুকা বলে—"সেদিন তুমি তাঁকে অপমান করেছ।"

কী বিচিত্র মানুষের মন! যে তনুকা নিঃশেষে তার শরীর-মন সমর্পণ করেছে তার স্বামীর কাছে, সেই তনুকাই অত্যন্ত আঘাত পায় যখন স্নান ঘরের নির্জন নিভৃতির অবসরে আত্মপ্রেমের ব্যসন উপভোগের মগ্ন মুহূর্তে চন্দন সেই একান্ত উপত্যকার প্রবেশ করে। নার্সিসাস সুলভ মুগ্ধতায় তনুকা পুজো করে তার শরীরকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অর্চনায়—সেখানে কারুর কোনো প্রবেশাধিকার নেই, এমনকী তার স্বামীরও না।

'প্রয়োজন' (১৯৭৬) গল্পটিতেও আমরা লক্ষ করি এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের উদঘাটন। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে চন্দনের সঙ্গে সহসাই এক অভিনব পরিবেশে শ্যামলীর দেখা হয়। "মেয়েটিকে দেখল চন্দন। ওর চোখে কৌতূহল লক্ষ করল। আর লক্ষ করল, যুবতীর সম্মুখীন হলে প্রত্যেক পুরুষ মানুষ প্রথমেই যা লক্ষ করে—শ্যামলীর স্তন দুটি এত বড় ছিল না।"

এই সেই শ্যামলী, বন্ধুর প্রেমিকা জেনেও, যাকে প্রেম নিবেদন করে সে প্রত্যাখাত হয়েছিল। পরবর্তীতে নীতার সঙ্গে বিবাহের পর সে এতদিন সুখী দাম্পত্য উপভোগ করেছে। কোথাও কোনও অপূর্ণতা ছিল না। কিন্তু এই নিটোল পরিপূর্ণতার মধ্যেও তার একফোঁটা কষ্ট ছিল, এক অপ্রত্যাশিত অপমান— লক্ষ্মীটি তুমি দুঃখ পেয়ো না, তোমার সঙ্গে আমি সেই রকম ভাবে মিশিনি। বিষ্ণুর বন্ধু তুমি, আমারও বন্ধু তাই, পরেও থাকবে।.... আমি খুব সাধারণ মেয়ে, আমার চেয়ে ঢের ভাল মেয়ের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হবে, ভালবাসা হবে, বলে রাখছি। মাঝে মাঝে চন্দন এই চিঠিটি খুলে পড়ত—আর তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করত বুকের মধ্যে অর্ন্তলীন এক চিনচিনে কষ্ট। এটিই ছিল তার প্রিয় মর্ষকামী ব্যসন। কিন্তু বাড়িতে আগত অতিথিদের হাতে যখন সেই চিঠিটি পড়ে এবং তা নিয়ে অবধারিত ভাবেই হাসাহাসি হয় তখন স্বভাবতই তার স্ত্রী নীতার পক্ষে তা গ্রহণ করা। অসম্ভব হয়ে উঠল এবং সে চিঠিটি বিনষ্ট করে। এই পরিস্থিতিতে চন্দন অনোন্যপায় হয়ে শ্যামলীকে অনুরোধ করে আর একটি চিঠি লিখতে—শ্যামলী শেষ পর্যন্ত তার পীড়াপীড়িতে রাজি হয়, তবে সেও চন্দনের কাছ থেকে প্রেম প্রস্তাবের চিঠি চায় যেমন সে পেয়েছিল আগে—যার উত্তর প্রস্তুত করবে সে। চন্দন সম্মত

হয় এবং একটি চিঠি পাঠায় শ্যামলীকে কিন্তু তার উত্তরে শ্যামলীর ইতিবাচক চিঠিটি চন্দনকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। কারণ চন্দন শ্যামলীর তরফে তার প্রস্তাবের সমর্থনে কোনো সম্মতির চিঠি চায়নি, সে চায়নি নিজের জীবনে নতুন কোনো অধ্যায়ের সূচনা করতে—তার আকাঙ্ক্ষা ছিল শুধুমাত্র সেই বিনষ্ট চিঠির একটি প্রতিলিপি। যে চিঠির সূত্র ধরে সে কিনা ফিরে যেতে পারে তার হারিয়ে যাওয়া অতীতে যেখানে অপেক্ষা করে আছে প্রত্যাখানের একটুকরো মনকষ্ট—একবিন্দু অশ্রুর নিটোল স্ফটিকে যা উজ্জ্বল। শ্যামলী বুঝতে পারেনি তার প্রয়োজন। তাই "চিঠিটি পড়ে চন্দন স্তম্ভিত। আর একবার পড়ে। চোখের সামনে অল্পক্ষণের জন্যে ভেসে ওঠে এক মহিলার অবয়ব—বয়স্ক একটু স্থুল, অস্বাভাবিক বড় দুটি স্তন, চোখে চশমা। কচি ডাবের মতো মুখের নিম্নভাগ। মাথার পিছনে ছোট একটি খোঁপা। উজ্জ্বল গম্ভীর ব্যক্তিত্ব। পিঠের দিকে ছড়ানো সাদা স্কার্ফ।

"দিলে না", চন্দন তাকে বলে, "এবারেও তুমি দিলে না, শ্যামলী।"

সার্থকনামা এই গল্পটিতে লেখক বর্তমান সময়ের একটি অন্ত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সঙ্কটের ছবি তুলে ধরেছেন। সম্পর্কের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে ফারাক ক্রমবর্ধমান। একের প্রয়োজনের সঙ্গে অন্যের প্রয়োজনের মিল হয়না প্রায়শই, আর সেকারণেই অন্তস্থ রিক্ততা তাকে কুরে কুরে নিঃশেষিত করে দেয় তার অজান্তেই। এই বোধই আজকের মানুষের নিয়তি।

'ঝিনুক' (১৯৯৩) গল্পে আমরা পাই দুই বান্ধবীর জীবনের কথা। একই হোস্টেলে দুজনে একসঙ্গে থাকে। অবিবাহিত। বিবাহের বাসনাও তেমন একটা নেই। যার জন্য কোনও পুরুষকেই তারা একটি নির্দিষ্টি সীমার বাইরে আসতে দেয়নি। হঠাৎই একদিন এক গহনার দোকানে শিখার একটি মুক্তোর সেট ভারি পছন্দ হয়। কিন্তু সেটির দাম এক লাখ পনেরো হাজার টাকা তাদের নাগালের বাইরে। শিখার এতই পছন্দ হয়ে যায় এই মুক্তোর সেট যে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে দোকানে উপস্থিত অতিবৃদ্ধ ধনী অমূল্যভূষণ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করে অলঙ্কারটি কেনা যায় কিনা। অমূল্যভূষণ সম্মত হন, কিন্তু বিনিময়ে শর্ত দেন তার সঙ্গে শিখাকে যেতে হবে। শিখা মুহূর্তমধ্যে নিঃসঙ্কোচে নির্দ্বিধায় ব্রততীকে ছেড়ে অমূল্যভূষণের সঙ্গে চলে যায়, যাওয়ার সময় শুধু বন্ধুকে বলে যায় "আমি যাই। পরে কথা হবে।" এরপর ব্রততীকে লেখা শিখার চারটি চিঠিতে সে তার জীবনযাত্রার কথা ব্রততীকে জানিয়েছে। চতুর্থ চিঠিতে জানায় তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। চিঠিগুলির তারিখ লক্ষণীয়—৩রা মার্চ ১৯৯০, ১লা জানুয়ারি ১৯৯১, ২৭ এপ্রিল ১৯৯২ এবং ১৭ জুলাই ১৯৯৩।

এই গল্পের থেকে কী বার্তা আমরা পাই? একটি অলঙ্কারের আকর্ষণে এক নারী জরাগ্রস্ত এক পুরুষের সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করে—এক লহমায় তার অতীত জীবন, তার প্রিয় বান্ধবী তুচ্ছ হয়ে যায়। ক্রীতদাসীর জীবন বেছে নিতে সে বিন্দুমাত্র পিছপা হয় না। তার কাছে সান্ত্বনা একটাই যে বৃদ্ধের আয়ুষ্কাল সীমায়িত। পঞ্চান্ন বছর বয়সের পার্থক্যটা কোনো ব্যাপারই

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

না। প্রকৃতির নিয়মে শিখা ক্রমশ অমূল্যভূষণের কাছের মানুষ হয়ে ওঠে—তার ব্যবসার সিংহভাগ দায়িত্ব বর্তায় শিখার ওপর এবং শেষপর্যন্ত সে বৃদ্ধের জীবনসঙ্গিনীর মর্যাদাও পায় বিবাহ বন্ধনের ছাড়পত্রে। কত নাটকীয় ঘটনাই না ঘটে মানুষের জীবনে।

আর দুটি গল্পের আলোচনার মাধ্যমে আজকের এই আলোচনায় ইতি টানব। 'জরিমানা' (২০০০) একটি চিত্তাকর্ষক গল্প। বিপত্নীক ক্ষিতীশ আর নিঃসঙ্গ চিত্রার গল্প। চিত্রা ক্ষিতীশের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকবে-ওর নিজস্ব আলাদা ওপরের একখানা ঘরে। খাওয়া দাওয়া একসঙ্গে রাত্রে। দিনের বেলায় যার যেমন প্রয়োজন। কেউ কারুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। প্রথম দিন চিত্রা বলেছিল, বাড়ি ঢোকার একটা চাবি পেলেই হল—এখন যোগ করল, বেরিয়ে যাওয়ার পথটাও খোলা রাখা উচিত।

ক্ষিতীশ আর চিত্রা একটি গোপন চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল, যদি কোনওদিন গৃহস্বামীও পেয়িংগেস্টের শারীরিক সম্পর্ক হয়, তবে যে সেটা প্রস্তাব করবে, তাকে পাঁচশো টাকা জরিমানা দিতে হবে। চিত্রার ইচ্ছাতেই এই চুক্তি হয়। খুব ছেলেমানুষি চুক্তি সন্দেহ নেই।

একদিন ক্ষিতীশ, জরিমানা দেওয়ার প্রস্তাব দিল এবং যা হওয়ার তাই ঘটল। গৃহস্বামী আর পেয়িংগেস্টের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে স্বামী স্ত্রীতে পরিণত হল। ইচ্ছা পূরণের মিষ্টি সরল গল্প; কিন্তু উপস্থাপনায় শরৎকুমারের নিজস্বতা পাঠককে চমৎকৃত করে।

'নেশা' (১৯৭৯) গল্পটি এক নারীর অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠার গল্প। একদিন হঠাৎই প্রতিবেশিনী পাখির ঘরে তার পরিচিত ফনীর সঙ্গে সুব্রতকে যেতে হয়। পাখি এই মদ খাওয়াকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। সে সুব্রতকে মদ ছেড়ে দিতে বলে। সুব্রত মদ খাওয়া থেকে বিরত থাকে। মিতা যখন জানতে পারে পাখির নির্দেশে সুব্রত মদ পরিত্যাগ করেছে—যা সে এতদিন বলেও সম্ভব হয়নি, সে সেটা মেনে নিতে পারে না। প্রায় জোর করেই পারিবারিক বন্ধু মিহিরবাবুর মধ্যস্থতায় সে আবার নিজের স্বামীকে মদ্যপানে প্ররোচিত করে। সুব্রত'র সঙ্গে পাখির কথোপকথনে গল্পের সমাপ্তি "সুব্রত বলল, একমাস বলেছিলেন, চেষ্টা করলাম। পারলাম না।

পাখি বলল শুনেছি

ওর কালো এবং সুন্দর মুখের ওপর কালো অসুন্দর একটা ছায়া পড়ল যেন।

মিতা বলেছে বুঝি

হ্যাঁ-আস্তে আস্তে পাখি বলল—মিতাদি বলছিল, চেষ্টা তো করলে, পারলে?"

মিতার কাছে স্বামীর শুভাশুভ বোধটি তখন গৌণ হয়ে গেছে ঈর্ষার আগুনে অন্ধ মিতার কাছে—অন্য কোনও নারীর নির্দেশে যদি তার স্বামী কোনও কু-অভ্যাসকে পরিহার করতে চায়—তাও অগ্রহণীয়, কারণ নির্দেশটি অন্যের। বরঞ্চ তার থেকে সে মেনে নিতে রাজি আছে স্বামীর মদ্যপানের আসক্তি—কারণ একটাই সে যখন তাকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে সে তো তখন কথা শোনেনি—আজ অন্যের কথা যদি সে (সুব্রত) শোনে তবে সেটা হবে স্ত্রী হিসেবে তার পরাজয়। নিজের স্বামীর ব্যাপারে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তেও সে নারাজ।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলি পড়তে পড়তে আশ্চর্য হতে হয় তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের দক্ষতায়। মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রেক্ষিতের ওপর তিনি আলো ফেলেছেন গল্প কথকের পরম মমতায়। তার গল্পগুলিতে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে এক শুভবোধ—অসহায়, পীড়িত, আর্ত মানবতার প্রতি। তার বিশ্লেষণ নির্মোহ তন্নিষ্ঠ এবং যুক্তিগ্রাহ্য। কখনোই তিনি কোনো রূপকথার আশ্রয় নিয়ে পাঠককে ধোঁকা দেননি। অত্যন্ত যত্নে, আশ্চর্য সংবেদনায় অভিজ্ঞতার উত্তাপে তিনি সেঁকে নিয়েছেন নিজস্ব অনুভব। ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন তিনি সত্যপ্রকাশে ছিলেন অকুতোভয়। নিষ্কম্প, গল্পবলার ক্ষেত্রেও তিনি স্পষ্টবক্তা, প্রত্যক্ষ এবং অমোঘ। আলোচিত গল্পগুলির বাইরেও বহু গল্প বয়ে গেল যা সময়, পরিসরের অভাবে আলোচনা করা সম্ভব হলো না। বারান্তরে প্রচেষ্টা থাকবে সেই অমূল্য মণিমুক্তাগুলিকে স্পর্শ করার।

তথ্যসূত্র :

১। বইয়ের দেশ-জানুয়ারি—মার্চ ২০১৪—সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়—সাক্ষাৎকার শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ: ১৭২
২। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় গল্পসমগ্র—আনন্দ পাবলিশার্স জানুয়ারি২০০৪—ভূমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা
৩। তদেব
৪। বনানী ঘোষ : সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের ভাবনায় স্বপ্নের গতিপ্রকৃতি ও ব্যাখ্যা : পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ : ৬ই মে ২০২২ পৃ ৪৪-৪৬, ৪৮, ৫৮-৬১, ৬২
৫। গল্পের উদ্ধৃতিগুলি ২নং বইটি থেকে উৎকলিত।
৬। গল্পের নামের পাশে ব্রাকেটে গল্পটির প্রকাশ সাল দেওয়া আছে।
৭। উদ্ধৃতি অংশের বানান অপরিবর্তিত।

তিন বিন্দু জল থেকে এক বিন্দু জল, গল্পকার শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

পলাশ দাস

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় কবি। রাতের কলকাতা শাসন করা চার যুবকের (সুনীল, শক্তি, সন্দীপন) অন্যতম শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতার গন্ধে আমোদিত হয়েছে সকল কবিতার পাঠককুল। কিন্তু, কবিতার পাশাপাশি তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য গদ্য। যার ভাব ভাষা কোনো অংশে কোনো গদ্যকারের ভাব ভাষার থেকে কম নয়। তাকে কবি বলে তার গদ্যকে দূরে ঠেলে দেওয়া যাবে না। তাঁর গল্পসমগ্রের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কবিতাও লেখে, তার সম্পর্কে একটা ধারণা থাকে দেখছি যে, ও তো কবি—মানে আত্মমগ্ন, বাস্তবের অনেক ওপর স্তরে কল্পনার জগতে সতত সাঁতার কাটছে, জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে ও আবার কি গল্প লিখবে? বড় করে দেখার নামে তাঁকে ছোট করে দেখাই রেওয়াজ। কিন্তু লোকে ভুলে যায়, কবিও একজন সাধারণ মানুষ, ইচ্ছে করলে সে তার ভাবুক সত্তাকে সংযত করে পর্যবেক্ষক সত্তাকে জাগাতে সক্ষম। আর, মন খুলে দিলে পর জাগতিক সব কর্মকাণ্ডই তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মূলত, এই দুই সত্তা পরস্পরের পরিপূরক। একই প্রেরণা থেকে গল্প এবং কবিতা দুইই রচিত হওয়া কোনও অসম্ভব ঘটনা নয়, কেবল প্রক্রিয়াটা আলাদা"। এই কথা তিনি বিশ্বাস করতেন, নিজ মনে লালন করতেন আর তাকেই আবহমান জীবন ধরে বয়ে বেড়িয়েছেন। এই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে মহীরুহে পরিণত করার নিরন্তর চেষ্টা করে গেছেন। না, মহীরুহ মানে বড় লেখক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক নয়, গল্প লেখার ক্ষেত্রে, কবিতার শব্দদের মতোই গল্পের শব্দদের সঠিক স্থান করে দিতে হয়, সেক্ষেত্রেই এই কথা বললাম। গল্প, উপন্যাস লেখার ব্যাপারে তিনি বিশ্বাস করতেন, "বড় মাপের হলে উপন্যাস, মাঝারি মাপের হলে বড় গল্প আর ছোট মাপের হলে ছোটগল্প — আসলে সবই এক বস্তু, অর্থাৎ কাহিনী বলে যাওয়া, বৃত্তান্ত বর্ণনা করে পাঠকের কৌতূহল মেটানো, এই মতে আমি বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি, উপন্যাস আর ছোট গল্প — দুটো আলাদা জাতের সাহিত্যকর্ম। বড় গল্প বলে কিছু হয় না"।

গল্প পাঠ করা শুধুমাত্র সময় কাটানো নয় বা কৌতূহল মেটানো নয়। যদি শুধুমাত্র সময় কাটানো আর কৌতূহল মেটানোর ব্যাপার থাকত তাহলে খবরের কাগজ পাঠ করে পাঠক সেই কৌতূহল মেটাতে পারতেন। কিন্তু খবরের কাগজ পাঠ করার পরও যেহেতু গল্প পাঠ করতে চাইছেন তাই আমাদের ধরে নিতে হবে পাঠক খবরের কাগজ পাঠ করে সেই সুখ পাচ্ছেন না, তিনি অন্য কিছু চাইছেন। তার জন্যই অন্য মাধ্যম বেছে নিচ্ছেন। যা খবরের কাগজে থাকে না। আর এই অন্য কিছু প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, "বোধহয় রস। বোধহয় ঘটনার মধ্যেকার সত্য"। আর এই ঘটনার মধ্যেকার রস, ঘটনার মধ্যেকার সত্য তিনি তাঁর সব গল্পেই রেখেছেন। যে গল্পগুলি পাঠ করে পাঠক বিমুখ হবেন না। তৃপ্তির রসদ তিনি খুঁজে পাবেন একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

ছোটগল্প লেখার ক্ষেত্রে লেখকের কিছু মুনশিয়ানার প্রয়োজন হয়, শুধু প্রতিভা দিয়ে

ছোটগল্প লেখা যায় না। যেখানে কৌশলের প্রসঙ্গ আসে সেখানে তো বিশেষভাবেই প্রয়োজন হয়ে ওঠে। "চলমান জীবনকে সম্পূর্ণভাবে দেখানো যায় না, ছোটগল্পের এই হল এক প্রধান সমস্যা। আবার প্রধান মজাও"। তিনি অনুভবি পাঠকের হাতে সে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চান। পাঠককে ভাবাতে চান গল্পের মধ্যেকার সত্য, রস। "নিগূঢ় সত্য কখনও ধুলোর নীচে, কখনও সাজগোজের আড়ালে, আবার কখনও সোনার কৌটোর মধ্যে পোকার মতো চাপা থাকে। তাকে খুঁজে বার করতে গবেষকের অনুসন্ধিৎসা দরকার হয়। লেখককে একথাও মনে রাখতে হয় যে, প্রখর আলোর সামনে পড়ে গেলে পাঠক তা সহ্য করতে পারবে না। চোখ বুজে ফেলবে। তাঁর কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া যাবে না। তাই উপস্থাপনে লেখক সাংকেতিকতার আশ্রয় নেন। আভাসে ইঙ্গিতে কাজ সারেন। মনোযোগী পাঠক তাতেই বুঝে ফেলে ব্যাপারটা"। শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে ঘটনার যে বিভিন্নতা, চরিত্র গঠন, তাদের জীবনশৈলী সব দিক থেকেই এক অনন্য অনুভূতির আস্বাদ পাওয়া যায়। আর আছে সেই আড়াল আবডাল। যাতে পাঠককে চোখ বুজে ফেলতে হবে না।

'কলতলার পাশের ঘর' গল্পের বর্ণনা, চরিত্র, ঘটনার ঘনঘটা সব দিক থেকেই অভিনবত্বের ছোঁয়া আর নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। গল্পের শুরুতে দেখা যাচ্ছে শিবশংকর চক্রবর্তী হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে ধুতিতে পা জড়িয়ে পড়ে যাওয়ার জন্য। আসলে তাঁর হৃদযন্ত্রে সমস্যা দেখা গিয়েছিল। রাস্তা থেকে কিছু মানুষ তাকে এখানে ভর্তি করে দিয়ে গেছে। সেখানেই তাঁর পাশের বেডের গুরুপদর সাথে কথোপকথনে জানা যাচ্ছে, "গুরুপদ বলে, কৃতজ্ঞ হবার কিছু নেই, দাদা। ওই বাতানুকূল ঘর আপনার জন্যে নয়, মেশিনগুলোর জন্যে তৈরি হয়েছে। ওই ঘরে ধুলো ঢুকলে মেশিনগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠবে, তাই অত পরিচ্ছন্ন"। আবার পরবর্তীতে গুরুপদ বলছে কিছুদিন ইনটেনসিভে থাকলে মনটা নরম হয়। এই ইঙ্গিতে নিশ্চয়ই পাঠক চোখ বন্ধ করবেন না। ডাক্তার চোকসি ও শিবশংকর চক্রবর্তী-র কথার ফাঁকে শিবশংকর চক্রবর্তী জানায় তাঁর জীবনে কোনো টেনশন নেই। গোল পানা মুখ, গায়ে সিল্কের জামা। টেনশনহীন জীবন। শিবশংকর চক্রবর্তী থাকে মহাত্মা গান্ধী আর বিবেকানন্দ রোডের মাঝ বরাবর একটি বস্তিতে। লেখক অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন এই জায়গায় "হাওড়া থেকে শিয়ালদা অবধি অঞ্চলকে, মহাত্মা গান্ধী রোডকে মাঝখানে রেখে, যদি একটা প্রকাণ্ড পমফ্রেট মাছের কাঁটার মতো ভাবা যায়, তবে মুড়োর দিক থেকে সতেরো নম্বর বাঁয়ে হল হরিহর সাউ লেন। ওই গলি এঁকে বেঁকে নাম বদলে এক জায়গায় বিবেকানন্দ রোডের সঙ্গে মিশেছে। মহাত্মা গান্ধী আর বিবেকানন্দ — এই দুইয়ের মাঝ বরাবর একটা বহুজাতিক বসতি আছে, সেই বস্তির মেয়েপুরুষ যে-কল থেকে জল নেয়, তার দুটো বাড়ি পরে নীচের তলায় শিবশংকরের আস্তানা"।

দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় সে ছোট ছিল তবুও কলকাতার টানে বাড়ি থেকে কলকাতায় এসেছিল। তারপর নানা কাজ করে পরে প্রুফ দেখে নিজের রোজগার করে। তাঁর কেউ নেই। সে বিয়ে করেনি, সুতরাং সংসার নেই। এই অংশে তাঁর কাজের যে বর্ণনা দিয়েছেন লেখক

সেখানে ১৯৮৮ সমকালীন রোজগারহীন মানুষেরা রোজগারের তাগিদে কীভাবে ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয় তাঁর দৃষ্টান্ত আছে। আর আছে এই নিষ্ঠুর শহরে সেই কাজে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পেরে কীভাবে একের পর এক কাজ পরিবর্তন করছে শিবশংকর চক্রবর্তী। এগারো টাকা ভাড়া দিয়ে সে বস্তির ঘরে থাকে। এই বস্তিতে তাঁর ঘরের সামনে একটি কলতলা আছে সেখানে বস্তির সবাই স্নান করতে আসে। সেখানেই রুলি আসত স্নান করতে। বস্তিতে মানুষজনের জীবনযাত্রা, তাঁদের আচার ব্যবহারের এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় লেখকের বর্ণনায়। এই রুলি শিবশংকর চক্রবর্তীকে হাতছানি দিয়ে ডাকত স্নানের সময়। নিঃসঙ্গ অবিবাহিত শিবশংকর প্রথমে দেখেছে তারপর একদিন রুলিকে ঘরে ডেকে নিয়েছে স্নানের পর। এই অংশে লেখকের বর্ণনায় যে দক্ষতা পাওয়া যায় তারপর তাকে শুধুমাত্র কবি বলে পিছে ফেলে রাখা সম্ভব নয়।

নিঃসঙ্গ শিবশংকর চক্রবর্তীকে বাড়ির সামনে ফুটপাথে থাকা হনুমানপ্রসাদ পেশায় সবজি বিক্রেতা পেসমকার কিনতে সাহায্য করেছে। পেসমেকার নিয়ে শিবশংকর চক্রবর্তীর কৌতূহল ডাক্তারের সাথে কথায় ফুটে উঠেছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর শিবশংকর চক্রবর্তীকে দেখাশোনার ভার নিয়েছে এই হনুমানপ্রসাদ। বদলে সে পেয়েছে ঘর। শিবশংকর চক্রবর্তী তাকে আশ্বাস দিয়েছে সে মরে গেলে এই ঘর তাঁর হবে। কিন্তু গল্পের শেষ অংশে পাঠকের চমক লাগে যখন শিবশংকর চক্রবর্তী মারা গেছে বুঝতে পেরে ডাক্তার ডেকে আনা, শবদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাড়ার ছেলেরা আসলে তাদের শব নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রসঙ্গে পাঠক অভিভূত হবেন, কিন্তু মনে খটকাও থেকে যাবে হনুমানপ্রসাদের তাঁদের সাথে না যাওয়া প্রসঙ্গে। কিন্তু কেন সে এত কিছু করছে? পাঠককে ভাবতে এখানেই সুযোগ দিচ্ছেন লেখক। কিন্তু পাঠক যখন অন্য কিছু ভাববেন তখন শব বাহকদের টাকার জন্য মরা মানুষকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে বুক কেটে পেসমেকার বার করে নিতে চাওয়ার যে লালসা সেখানেই ১৯৮৮ সালের শহরের বেরোজগার মানুষের মননের ছবি ফুটে ওঠে। আরও চমক লাগে যখন বুক কাটতে গিয়ে দেখা যায় আগেই সেই পেসমেকার কেটে বার করে নেওয়া হয়েছে এবং তা নিয়ে হনুমানপ্রসাদ বাড়ি রওনা দিয়েছে। নতুন করে শহরে এসে সংসার পাতবে এই স্বপ্ন নিয়ে। গা শিউরে ওঠে পাঠকের সমকালীন মানসিকতার এই বহিঃপ্রকাশ দেখে। অসাধারণ বর্ণনায় আর দক্ষতায় লেখক সফলভাবে এই গল্পে তা রূপদান করেছেন। পাঠকের জন্য রেখেছেন অসাধারণ সাংকেতিক শব্দ ও বর্ণনার আয়োজন।

'তনুকার আমি' গল্পে তনুকা, যার নতুন বিয়ে হয়েছে, সে কীভাবে তাঁর শ্বশুর বাড়িতে নতুন পরিবেশে এসে মানিয়ে নিচ্ছে তাঁর সংসারের নান ওঠা পড়া, স্বামীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ফুটে উঠেছে লেখকের নিপুণ বর্ণনায়। ১৯৮৪ সালে লেখা এই গল্পে দেখা যায় এখনকার মতো তখন স্বামী স্ত্রী-র এত সরল এবং খোলামেলা মেলামেশা করার সুযোগ ছিল না সংসারে অনেক মানুষের উপস্থিতিতে। দেখা যায় বাথরুমের বিশাল ঘরে তনুকা একা পরীর মতো প্রাণ খুলে বাঁচে। এই বিশাল ঘর করার জন্য সে তাঁর স্বর্গত শ্বশুরকে মনে মনে ধন্যবাদ জানায়।

বাথরুম, বাথটাব, শাওয়ার, গিজার আর মানুষ প্রমাণ বিরাট আয়নার মধ্যে তনুকা নিজের স্বর্গ রচনায় ব্যস্ত থাকছে। এই বাথরুমের জানলা দিয়ে চন্দন তনুকার স্বামী লুকিয়ে তাকে পরীর মতো উড়তে দেখে এবং সে এই তনুকাকে চিনতে পারে না। "আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সবই তো তোমার চেনা। তাই না? এই ঠোঁট, নাক, কপাল... এই আমার শরীর। বিছানার এই আমি, শোবার ঘরের আমি তোমার বউ। কিন্তু বাথরুমের আমিটা আলাদা মানুষ। একলা। কেউ তাকে চেনে না। কারোর সঙ্গে তাঁর ভাব নেই"।

'বাচ্চা হনুমানের সুবর্ণজয়ন্তী' গল্পে তিনি দেখিয়েছেন কলকাতায় নবতম সংযোজন টেলিফোন এবং তা নিয়ে মানুষের অপার কৌতূহল দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন।" কালো যন্ত্রটার ছোট ছোট ফোকর থেকে ভোঁ ভোঁ শব্দ হচ্ছে? কানে চেপে ধরলেন। তাই তো, এ যে ডায়াল টোন। ওঁয়া ওঁয়া করে ডাকছে"। এই যন্ত্রকে ঘিরে বাড়ির মানুষদের নানা কৌতূহল, তাকে ঘিরে নানা ইচ্ছে জমে উঠছে, আবার একে ঘিরে একটা উৎসবের দিনও রচনা হচ্ছে। যেদিন ডেড ফোন আবার ঠিক হচ্ছে। তাতে কথা বলা যাচ্ছে। তেমনই কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক —

"টেলিফোন?
সেরে গেছে। এ কি মানুষ, যে ডেড মানে একেবারে ডেড?"
"কী যেন বলব ভাবছিলাম, ভুলে গেলাম।
শ্যাম্পু করেছিস আজ।
কী করে জানলি?
গন্ধ পাচ্ছি।
টেলিফোনে বুঝি গন্ধ পাওয়া যায়"।

"একবার টেলিফোনটা ঠিক হয়ে গেলে বুঝি জীবনটা বদলে যায়। পৃথিবীর দরজা খুলে যায়। রবিবার আসার আগের দিনগুলো টেলিফোনে টেলিফোনে ছয়লাপ হয়ে গেল"।

"আহার্যের ত্রুটি হবার কথা নয়। ...দু কিলো পাঁঠার মাংস... এক চ্যাঙারি গাজরের হালুয়া"।

"তাকিয়ে দেখেন, কালো রঙের রিসিভারটা বাচ্চা হনুমানের মতো টিভি-র ওপর বসে আছে, তাঁর লম্বা লেজ ঝুলছে মেঝে অবধি। ... তাই তো! ওর জন্যেই এত কাণ্ড, আরকেই বাদ দেওয়া হয়েছে। কী মনে হল, গীতা মাসিমা চুপি চুপি ফ্রিজ থেকে একটু একটু করে বিরিয়ানি, মাংস আর পায়েস বার করলেন। তারপর বাচ্চা হনুমানটাকে কোলে বসিয়ে খাওয়ালেন। একসময় ওর প্যাঁক প্যাঁক নালিশ বন্ধ হয়ে গেল। তখন ওকে আর যন্ত্রটার বোতামের ওপর উপুড় করে না শুইয়ে টেবিলের একপাশে কাত করে শুইয়ে দিলেন"।

গল্পের শেষে দেখা যায় ললিত সরকার যখন শোয়ানো ফোনটা হাতে তুলে দেখছে ডেড, আর তার মধ্যে থেকে মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে। "একেবারে ডেড। এ আর কোনদিন বেঁচে উঠবে না"। এই ব্যাপারে যে পুরো বাড়ি শোকময় হবে তা জানেন বলেই ললিত সরকার শান্তি খুঁজে নিতে চান পার্কার বেঞ্চে বসে। "সংসার মানেই ঝামেলা আর অশান্তি। ... শেষকালে মনে হল,

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

সভ্যতা মানুষে জীবনে অভিশাপ"। আকাশের নীলের মধ্যে তিনি শান্তি খুঁজতে লাগলেন। "আকাশের একটা দিক ঝকঝকে পরিষ্কার নীল। অন্য দিকটায় প্রায় অর্ধেক দিগন্ত জুড়ে সাদা থোকা থোকা মেঘের সারি। যেন দেব দেবীদের কাপড় শুকচ্ছে।... একটা চিল উড়তে উড়তে ওই মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেল। ... ওই দিকটায় কোনও তাড়াহুড়ো নেই"। অসাধারণ এই সংকেতের মাধ্যমে লেখক যেন যান্ত্রিকতার থেকে প্রকৃতির দিকে নিয়ে যেতে চান পাঠককে।

"ও ক্যালকাটা" গল্পে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপতি ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যেকার বিরোধ এবং সেই বিরোধ বাঁধিয়ে যে কূট রাজনৈতিক জুয়াখেলা চলেছে অনেক বছর ধরে তার চিত্র অংকন করেছেন। "শহীদ" গল্পে আছে দুষ্টচক্র দমন করতে গিয়ে কলকাতার এক সৎ ও সাহসী পুলিশ অফিসারের নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার ঘটনা।

"অমিতাভ, আপনাকে নিয়ে" গল্পে মুন্সীয়ানার সাথে লেখক পৃথক বাচনভঙ্গিকে বেছে নিয়েছেন। এই গল্পে অমিতাভ এক বিধবা মহিলা রেখাকে বিয়ে করেছে—তাঁর জীবনের নানা ঘটনা এখানে ফুটে উঠেছে। ফুটে উঠেছে অমিতাভের বিবাহ প্রসঙ্গে ১৯৭৪ সালের সমকালীন মানসিকতা। এখানেই এক বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন মেয়েদের জীবনের কথা, "প্রেমিকা ছিল এরা, আবার প্রেমিকা হয়ে যাবে, মাঝখানে একটা আরোপিত অসুস্থতা এসে কাতর করে রেখেছে। নারী নর্মসহচরী, কিন্তু এই নরম কাণ্ডের মধ্যে ঢের বেদনা লুকোনো থাকে। কেন থাকে, কেন নারীই কেবল সে-বেদনা বহন করবে..."। লেখক হিসাবে তিনি শুধু অমিতাভকে শুধু জিজ্ঞাসা করেননি, যেন আমাদের দিকেই ছুঁড়ে দেওয়া প্রশ্নবাণ। এই গল্পের শেষে দেখা যায় অমিতাভ তাঁর স্ত্রী রেখাকে নিয়ে তাঁদের বিবাহবার্ষিকী উৎযাপন করতে চাইছে। এ যেন নারীকেই স্বীকৃতি দেওয়া। সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে তার জন্য একটি দিনকে ধার্য করা।

"ছুট" গল্পটি ১৯৯৯ সালে লেখা। গল্পটিতে একটি মেয়ে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিচ্ছে। যে মেয়েটি তাঁর মায়ের সাথে কলকাতায় বাবুদের বাড়িতে কাজ করে। সেই সময়ের তাঁর মনে চঞ্চলতা, মুগ্ধতা, নিজেকে নিয়ে যে অপার কৌতূহল জেগে উঠছে মনের ভিতর তার বর্ণনা করেছেন লেখক অসাধারণ গল্প শব্দচয়নের মাধ্যমে। "বাবুদের বাড়ি থেকে শাড়ি দিয়েছে ওকে। হলুদ শাড়ির সঙ্গে হলুদ ব্লাউজ। আর একটি বডিস"। এরই পরে এগরোল বিক্রি করে স্বপন যে যখন লতার যৌবন আগমনের খবর দিচ্ছে লজ্জায় তখন দৌড়ে পালাচ্ছে এবং বাবুর বাড়ি ফিরে গিয়ে চুপি চুপি আয়নায় দেখছে "শুধু ঠোঁট না, সারা মুখটাই ওর কেমন লাল হয়ে গেছে। নিজেকে চিনতে পারছে না"।

"কন্যাপক্ষ" গল্পটিতে সমকালীন সময়ের পারিবারিক সাংসারিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যেখানে সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনদের মধ্যে নোটিস চালাচালি হচ্ছে। বোনেরা মাকে নোটিস পাঠাচ্ছে সম্পত্তির ভাগ নিয়ে। স্বামীহীন একাকী মহিলার জীবনে সম্পত্তি নিয়ে যে উদ্বেগ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার মধ্যের টানাটানি লেখক দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পে একাকী মৃদুল সারাজীবনের কাজের পর অবসর নিয়েছে এবং সংসারে তাকে সঙ্গ দেওয়ার কেউ নেই, একমাত্র নাতনি ছাড়া। মৃদুলের সাথে শুভামাসির কথোপকথনে

শুভামাসি জানায় তাঁর জীবনে কোনোদিন জন্মদিন পালন করা হয়নি। তখনকার দিনে সংসারে মেয়েদের তেমন মান্যতা দেওয়া হত না তা এই সংলাপেই লেখক তা ফুটিয়ে তুলেছেন। "আগে কখনও আমার জন্মদিন হয়নি। মেয়েদের জন্মদিন হওয়ার রেওয়াজ তো ছিল না তখন। আমরা তোর মাকে নিয়ে পাঁচ বোন, এক ভাই। ওই, দাদার জন্মদিনে আমরা সবাই একবাটি করে পায়েস পেতাম"। পরবর্তীতে দুটি সংলাপ শোনাচ্ছেন লেখক তাতে আরও পরিষ্কার হয়ে যায় সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট "বিয়ের পর তো মা। মায়ের জন্মদিন কে কবে মনে রাখে?" বা "আমরা তো জানতাম, জন্মদিন শুধু বাড়ির ছেলেদেরই হয়। আশা না থাকেল না পাওয়ার কষ্ট থাকে না"। কথাগুলির মধ্যে দিয়ে লেখক সমকালীন অবস্থার কথা যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন, ঠিক তেমনই নির্মাণ করেছেন এক স্বার্থক চরিত্র। সুবিচার করেছেন গল্পের নামের সাথেও।

"চারকোণা" একটি চমৎকার গল্পের পরিবেশন। যেখানে শান্তিনিকেতনের পরিবেশে লেখক গল্প সাজিয়েছেন, এই গল্পের কথক আমি। দেবীপ্রসাদ মিত্র নামের এক আমেরিকান সিটিজেন যে অবসরের পর সংসার ছেড়ে এসে থাকছে শান্তিনিকেতনে। এখানে তাকে দেখার জন্য তিনজন চাকর। "আমেরিকা কাজের দেশ। বুড়ো বয়সে কেউ দেখে না। সব কাজ নিজেকে করতে হয়। কী দরকার? এখানে বহাল তবিয়তে আছি। ওই রিকশাওয়ালা আমার বাঁধা। ওই পানু, সাঁওতাল, স্বামী পরিত্যক্তা, আমার হাউসকিপার-যে কফি এনে দিল।... আমার বাঁধা। ওর মেয়ে পেয়ারা — বাঁধা। আমি একজন লোক, তিনজন আমার সাহায্যকারী"। কথায় কথায় সে জানায়, মশায় তাঁর অসুবিধা নেই। ওখানের এক টাকা এখানে তেতাল্লিশ টাকা। তাই সে প্রতিষেধক কিনে নিয়েছে। এই সংলাপ থেকে ও তাঁর জীবনযাপন থেকেই বুঝে নেওয়া যায় তাঁর চরিত্রটি লেখক কী রঙে আঁকতে চেয়েছেন। গল্পের শেষে তাই কথক বাড়ি ফেরার নিশ্চিত ভরসা তাঁর ভাড়ার রিকশা পাবে না ভেবে তাঁর সাথে কোনো তর্কে যেতে চায়নি।

লেখক শরৎকুমারের গল্প যে কোনোভাবেই পাশে ফেলে রাখার নয়, তা তাঁর গল্প সামান্য পরিসরে পাঠ করলেই বোঝা যায়। সমকালীন সময়, মানুষ এবং তাদের ব্যবহার জীবনযাপন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি যা তিনি বর্ণনা করেছেন তাতে কোনো ফাঁক নেই। তাই তাঁর কথায়, "আমাদের জীবনকাল — এই যে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ — একে আমি এক দীর্ঘ মলমাস বলে মনে করি। একুশ শতকে অনেক কিছুই বদলে যাবে, যেতে শুরু করেছে। এই দীর্ঘ মলমাস আমি কীভাবে কাটালাম, কীভাবে দেখলাম আর পেলাম জীবনকে, তার একটা দলিল থেকে যাক"। একথা বলতেই হয়, তাঁর সমগ্র (কবিতা,গল্প,উপন্যাস সমগ্র)তিন বিন্দু জলের মধ্যে থেকে এই এক বিন্দু জল পেরিয়ে যেতে গেলে আরও অনেক পথ আমাদের হাঁটতে হবে। প্রয়োজন পড়বে নিবিড় পাঠের, তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না!

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে বিশ শতকের নগর কলকাতার চালচিত্র

টুম্পা নস্কর

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার। তাঁর কবিতা, উপন্যাস, গল্প পড়ে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। তাঁর 'গল্পসমগ্র'-তে যে-গল্পগুলো আমরা পাই সেখানে দেখা যায় নিষ্ঠুর সময়ের অভিঘাত, মূলত বিশ শতকের টানাপোড়েন আর অস্থিরতার ইতিহাস। তাঁর গল্পে বিধৃত হয়েছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের চিত্র, পটভূমি মূলত নগর কলকাতা। এই নগর কলকাতার শ্রেণি-সংগ্রাম, বিদ্রোহ, মিছিল, নগর-যন্ত্রণা, নাগরিক নিষ্ঠুরতা, নাগরিক যৌনতা; সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে। লেখকের জীবনকাল তথা বিশ শতকের নগর কলকাতার যে যন্ত্রণা তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর গল্পে। তাই প্রতিটি গল্পের চরিত্র তাঁর নিজের চোখে দেখা আর গল্পের কাহিনির সাক্ষী তিনি নিজেই। লেখক তাঁর 'গল্পসমগ্র'-তে 'লেখকের কথা' অংশে বলেছেন—

"আমাদের জীবনকাল—এই যে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ—একে আমি এক দীর্ঘ মলমাস বলে মনে করি, একুশ শতকে অনেক কিছুই বদলে যাবে, যেতে শুরু করেছে। এই দীর্ঘ মলমাস আমি কীভাবে কাটালাম, কীভাবে দেখলাম আর পেলাম জীবনকে, তার একটা দলিল থেকে যাক।"

মলমাস মানে যে মাসে কোনো শুভ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় না। লেখক তাঁর সময়কালকে মলমাস অর্থাৎ অশুভের মাস বলে উল্লেখ করেছেন। তাহলে কি বিশ শতকের সময় ছিল অশুভ, এক অস্থিরতাময়!

কলকাতা শহরের নিষ্ঠুর চেহারাই ফুটে উঠেছে 'কলতলার পাশে' গল্পে। এই গল্পে দেখা যায় শিবশংকর কলকাতা শহরের একজন পুরানো বাসিন্দা। বিয়ে করেনি, ভাড়া ঘরে থাকে। ঘর ভাড়া এগারো টাকা, শিবশংকরের বউ নেই, ছেলেপুলে নেই, সম্পত্তি নেই, কাজের লোক নেই, কিচেন নেই, টয়লেট নেই, গাড়ি নেই, চাকরি নেই, দেনাদার নেই, তার উচ্চাশাও নেই। বই পাড়ায় ঘুরে ঘুরে প্রুফ দেখে তার দিন চলে যায়। এই কলকাতা শহরের নিষ্ঠুর চেহারা শিবশংকর নানাভাবে দেখেছে —

"এ এমন একটা শহর যাকে কেউ ভালোবাসে না। শুধু ভোগের জন্য আর ভোগের পর ছাই-খোসা ফেলতে ব্যবহার করে। এখানে মানুষ একটু গায়ে আঁচড় লাগলেই খ্যাঁক করে ওঠে। আগে নাকি এমনটা ছিল না। পার্টিশনের পর থেকে ক্রমে জনসংখ্যার চাপে নাকি শহরটার চরিত্র নষ্ট হয়েছে।"[১]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যখন ভারতবর্ষ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়, তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রচুর মানুষ এসে ঠাঁই নেয় শহর কলকাতার বুকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থানের চাহিদা ও সংকট দেখা দেয়। বহু মানুষ ধান্দাবাজি করে লোক ঠকিয়ে

পয়সা ইনকাম করে পেট চালাবার জন্য। ধর্মের নামে লোক ঠকিয়ে, তো কেউ আবার গ্রহ রত্নের দোহাই দিয়ে জ্যোতিষী সেজে পয়সা ইনকাম করে। শিবশংকর এমন একটা জ্যোতিষীর কাছে কিছুদিন কাজ করত, যে মা-কালীকে দেওয়া সোনার জিভ আর সোনার নোয়া ভেঙে দ্বিতীয় পক্ষের বউয়ের জন্য গয়না গড়াত।

একদিন হঠাৎ শিবশংকর ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। রাস্তার লোক ধরাধরি করে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। ডাক্তার বলে, 'বুকে পেসমেকার বসাতে হবে'। শিবশংকর টাকার জন্য চিন্তা করলে, ডাক্তার চেকসি বলে, তার একজন শুভার্থী আছে, যে টাকা দিতে রাজি আছে'। হাসপাতালে শিবশংকরের সঙ্গে হনুমান প্রসাদ দেখা করতে আসত। হনুমান প্রসাদ টাকার ব্যবস্থা করে পেসমেকার বসানোর জন্য। হিন্দুস্থানি হনুমান প্রসাদ পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তরি-তরকারি বিক্রি করে। বিবেকানন্দ রোডের ওপর এক গাড়ি বারান্দার নীচে রাত কাটায়। তার কোনো নিজের বাসস্থান নেই। হনুমান প্রসাদের সহায়তায় শিবশংকর বুকে পেসমেকার লাগিয়ে বাড়ি ফেরে। অসুস্থ শিবশংকরের দেখাশুনা করে হনুমান প্রসাদ—তার সেবা করে, রান্না করে। তাদের মধ্যে চুক্তি হয় যে- শিবশংকর মারা যাওয়ার পর তার এই ছোটো ঘরখানা হনুমান প্রসাদকে দিয়ে যাবে। শিবশংকর হনুমান প্রসাদকে বলে,

"টাকাটা তুই বৃথাই খরচ করলি। কবে মরব ঠিক নেই। এই ঘরখানা পেতে পেতে তুই বুড়ো হয়ে যাবি। তোর বউ গ্রামে থেকে পচবে।"[২]

কলকাতা শহর ভণ্ডামির শহর। লোক ঠকানোর শহরে, শিবশংকর হনুমান প্রসাদের ভালোমানুষির আড়ালে তার ভণ্ডামিটা ধরতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যে শিবশংকরের মৃত্যু হয়। হনুমান প্রসাদ ডাক্তার চেকসিকে ডেকে আনে, ডেড সার্টিফিকেট লিখে দেয় ডাক্তার। হনুমান প্রসাদ মিথ্যা অশ্রুপাত করে। পাড়ার নেতৃস্থানীয় ছোকরা চামু আর তার শাগরেদরা শিবশংকরের মৃতদেহ দাহ করতে যায়। হনুমান প্রসাদ তাদের হাতে ডেড সার্টিফিকেট আর একশো টাকা দিয়ে বলে—

"রাখ বাবু দরকার হবে। আমি আর যেতে পারছি না বাবু। তোমরা দেখো, যেন বাবুর সদ্গতি হয়। ভারী পুণ্যাত্মা ছিলেন।"[৩]

নিষ্ঠুর শহরের জনগণও নিষ্ঠুর। সবাই নিজের স্বার্থটা বোঝে। ধূর্ত চানুর মাথায় অন্য চিন্তা, ডেড বডির বুকে নতুন ব্যান্ড নিউ পেসমেকার, চিতায় তোলার আগে ওটা খালাস করে বিক্রি করার চিন্তা। একটা ডাক্তার ডেকে চানুর দল শিবশংকরের বুকের পেসমেকার বার করতে উদ্যত হয়-

" 'ছ'জোড়া চোখের সামনে শিবশংকরের বুকের কাপড় যখন খোলা হল, তখন সবাই দেখে পুরনো কাটা দাগটার পাশে নতুন একটা কাটা দাগ, নতুন সেলাই। খানিকটা লাল মাংস বেরিয়ে আছে।"[৪]

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

চানু রাগে লাফিয়ে চিৎকার করে ওঠে-

"কিন্তু তখন আর রাগ করে কী লাভ! মিথিলা এক্সপ্রেস ধরে হনুমান তখন মজঃফরপুরের পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। কিছুদিন ঠান্ডা হয়ে খেতি বাড়ির একটা ব্যবস্থা করবে সে। তারপর বালবাচ্চা নিয়ে কলকাতার বাড়িতে এসে উঠবে। এই রকম তার প্ল্যান।"[৫]

শহর কলকাতার মিথ্যা ভণ্ডামি জালিয়াতির নিষ্ঠুর চিত্র লেখক এই গল্পে দেখিয়েছেন।

নাগরিক উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন পরিলক্ষিত হয় 'খেলাঘর' গল্পে। ডাক্তার দীপঙ্কর সরকার নামকরা কার্ডিওলজিস্ট। মানুষের হৃদয়ের চিকিৎসা করা তাঁর একমাত্র পেশা। কিন্তু তাঁর একমাত্র মা মরা মেয়ে বেবির হৃদয়ের খবর তিনি রাখেন না। মেয়ের কাছে গোছা গোছা টাকা আর দামি দামি জিনিস সাজিয়ে দেন। একমাত্র মেয়ে বেবি কাজের লোকেদের কাছে মানুষ হয়। বাড়ির দোতলায় বেবির খেলাঘর। নানান দামি দামি জিনিস দিয়ে সাজানো এই খেলা ঘরে সময় কাটাবার অনেক ব্যবস্থা আছে। তার বন্ধু-বান্ধব আসে এ ঘরে। বেবি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, নানান রঙিন পত্র-পত্রিকা পড়ে, জুয়া খেলে। বেবির বন্ধু জয়ন্তী, উৎপল, রীনা অতনু আসে এই আড্ডার আসরে। এখানে সিগারেট, মদ, গাঁজা সবই খাওয়া চলে। বড়োলোক মেয়ের উদ্দাম যৌনতাময় উচ্ছৃঙ্খল জীবনের লীলা খেলা চলে এ ঘরে। এ আসরে রীনা সিগারেটে টান দেয়, অতনু সিপসিপ করে তাড়ি খায়। জুয়া চলে, বেলবটস আর খাটো শার্ট পরা বেবির কোলের সামনে এককাঁড়ি কারেন্সি নোট জমে গেছে। হঠাৎ-

"ওর বাঁ পাশে মেজেতে একটা বড় ভাঁড়। তার মধ্যে ভরতি সবুজ পানীয়। টাকা জেতার নেশায় অনেকক্ষণ এদিকে নজর পড়েনি বেবির। এবার ঢক ঢক করে খেয়ে নিল সবটা।"[৬]

আর বেবির বন্ধু উৎপল নির্বিকারভাবে সিগারেটের খোল খালি করে দেশলাই কাঠি দিয়ে গাঁজার গুঁড়ো ভরছিল, দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে বসে আছে মীরাদি। চোখ লাল, মীরা একসময় বেবির গভর্নেস ছিল। এখন বন্ধু, সেও এদের দলে যোগ দিয়েছে। জুয়ায় অনেক টাকা জিতেছে বেবি, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পয়সা বেলবটসএর পকেটে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। উৎপলও দাঁড়িয়েছে কারণ—অনেক পরিশ্রম করে তৈরি করা জিনিসটা এবার ধরাবে, এমন সময় বেবি ওর দিকে এগিয়ে এসে হাত দুটো তুলে বলে,

"আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো তো।"[৭]

উৎপল বেবির কথা শোনে, দাঁড়ানো অবস্থাতেই ওরা অনেকক্ষণ পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। একসময় উৎপল বেবির তুলতুলে মুখটা তার মুখের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে। আর তখন বেবি বলে,

"না, এখন ইচ্ছে করছে না, এবার ছেড়ে দাও।"[৮]

মিউজিক চালানোর জন্য বেবি রেডিয়োগ্রামের তালা খুলে ডিস্কটা লাগাতে যাচ্ছে,

ঠিক এমন সময় লোডশেডিংয়ে সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়। বেবি অনুভব করে দুটো হাত তার কোমর জড়িয়ে ধরে বক্ষ পর্যন্ত উঠে এসেছে। বেবি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বিদ্যুৎ আসলে বেবি বুঝতে পারে না, কে তার গোপন অঙ্গে হাত রেখেছিল। আড্ডা শেষে সবাই বাড়ি চলে যায়। মীরা থেকে যায় বেবির কাছে। মাতৃহারা বেবিকে অনেক আদর করে মীরা। কিন্তু এ আদরে কোনো স্নেহ, ভালোবাসা থাকে না। থাকে শুধু লালসা আর উচ্ছৃঙ্খল যৌনতা। বেবির মুখখানা দু'হাতে ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে এনে মীরা বলে—

"আমি তোমায় কত ভালবাসি, তুমি বোঝো না?

তারপর রাগে ও অভিমানে ফোলা ওর নিচের ঠোঁট মুখের মধ্যে নিয়ে গভীর চুমো খায় মীরাদি। বেবি চোখ বোজে।"[৯]

বেবি ঘুমিয়ে পড়ে। মীরা খেলাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ডাক্তার দীপঙ্করের চেম্বার শেষ। পেশেন্টরা সব চলে গেছে, এখন উনি একা। বেবি ঘুমিয়ে গেলে মীরা বাড়ি যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়। সারাক্ষণ পেশেন্ট দেখে ক্লান্ত ডাক্তার দীপঙ্কর মীরাকে কিছুক্ষণ থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। কারণ, তাঁর রাত বারোটার আগে ঘুম আসবে না। তাই মীরার সাথে একটু বকবক করবেন, ক্লান্ত জীবনে একটু আনন্দ উপভোগ করতে চান। ডাক্তার দীপঙ্করকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য মীরা থেকে যায়। এই জগৎসংসার খেলাঘর মাত্র তো আর কিছুই নয়। এ জগৎসংসারে মানুষ জন্মায়, জীবনের খেলা সাঙ্গ হলে এ সংসার ছেড়ে চলে যায়। বেবির ওই সাজানো খেলাঘরটার মতো, যেখানে অপার আনন্দ কিন্তু সে আনন্দে কোনো সুখ নেই- এ আনন্দে আছে শুধুই যন্ত্রণা।

বিশ শতকের সময় বড়ো উত্তাল সময়—স্বার্থপর মানসিকতা, কালোবাজারি, মানুষের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি করা মন্বন্তর। একদল মানুষ ফুলে ফেঁপে বড়ো হতে থাকে, তাদের গুদামে জমা হতে থাকে খাদ্যবস্তু। আর যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এ পৃথিবীকে শস্য-শ্যামলা করে তোলে, এ পৃথিবীকে সচল করে রাখে—তারা এতটুকু খাদ্য পায় না। তারা না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরে নগরে-প্রান্তরে। লেখক শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ গল্প 'তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক'। এই গল্প ইতর প্রাণীকে কেন্দ্র করে লেখা। আসলে এই ইতর প্রাণী হল শোষিত মানুষ। যারা এতটুকু খাবারের জন্য হন্যে হয়ে ঘোরে। এতটুকু খাবারের জন্য মানুষে মানুষে লড়াই, শুধু মানুষ নয় নগরের ডাস্টবিনে মানুষের সঙ্গে কুকুরের লড়াই। শুধু তারা একটু খেয়ে বেঁচে থাকতে চায়। তাই এই গল্পে দেখা যায়—

"বড় রাস্তার দিক থেকে এসেছে ছোট-বড় মাপের কিছু মানুষ। তারা শুরু করে দিয়েছে খাওয়া। ওই তো কলাপাতার ডাঁইয়ের উপর বসে হাড় চুষছে একজন।... ওই তো, জিভ বার করে ভাঙা ভাঁড় চাটছে ওদের কেউ। গব গব করে গিলছে পাশাপাশি বসা

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

দুটো বুড়ো মানুষ, তাদের হাত-পা সরু সরু। তাদের মুখে দাঁত নেই। এ অন্যায়! মানুষ এখানেও কুকুরের খাদ্যে ভাগ বসাবে।"[১০]

কুকুরের খাবারে মানুষ ভাগ বসালে, কুকুর আর মানুষে লড়াই বেঁধে যায়। আসলে কুকুর এখানে শোষিত মানুষের প্রতিনিধি, যারা মালিক পক্ষের থেকে নিজেদের প্রাপ্যটুকু বুঝে নিতে চায়। কিন্তু মালিকশ্রেণি কিছুতেই সে অধিকার দেয় না, ফলে মালিক-শ্রমিক বিরোধ বাঁধে। মালিকশ্রেণি পিষে মারতে চায় শ্রমিকশ্রেণিকে। যেমন কুকুরগুলোকে লাঠিপেটা করে মানুষের দল। আর তখনই শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি ইতর কুকুরের দল বলে, এর বিহিত চাই—

"বিহিত মানে বিদ্রোহ নয়। খুনখারাপি ময়। সকলের জন্য সমান অধিকার চাই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, এঁটোকাঁটা খেয়ে মানুষের দয়ায় বেঁচে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে। সকল মানুষের সঙ্গে সকল কুকুরের সমান অধিকার চাই।"[১১]

সকল জাতির মানুষ, সকল শ্রেণির মানুষ, একদিন সমান মর্যাদা পাবে সমান অধিকারের মাধ্যমে। তার জন্য মানুষকে একজোট হতে হবে। কিন্তু শোষক শ্রেণি এই সমস্ত মানুষকে মাথা তুলে বাঁচতে দেয় না। সমান অধিকারের দাবিতে শোষিত শ্রেণি বিদ্রোহ করলে, তা কঠোর হাতে দমন করে শোষক শ্রেণি। শোষিত শ্রেণির মুখ বন্ধ করার জন্য তাদের তাজা প্রাণগুলো কেড়ে নেয়, নিজেদের পোষা গুণ্ডা দিয়ে। প্রাণ ত্যাগ করেও শোষিত শ্রেণি বিদ্রোহ করে যায়। নিজেদের খাদ্যের দাবিতে, নিজেদের অধিকারের দাবিতে।

কলকাতা- সিটি অফ জয়। কলকাতা মানে মিটিং-মিছিল আন্দোলন, বেকার রক জীবন। বিশ শতকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে, কলকাতার এমন অনেক চিত্র ধরা পড়েছে লেখক শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন গল্পে। যেমন 'ওরা অপেক্ষা করছে' গল্পে দেখা যায় পূষণ তার ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকে। কারণ তাদের পৈতৃক বাড়িতে ঘর অপেক্ষা মানুষ অনেক বেশি। অতটুকু জায়গার মধ্যে তার বউ নীপা থাকতে চায়নি। যে বাড়িতে তারা ভাড়া থাকে সেটা খুব একটা বড়ো নয়। তবুও লোক গিসগিসে কলকাতা শহরে ওটাই ভালো। এক সময় বহু লোক কলকাতা থেকে পালিয়েছিল শ্রেণি নিধনকারীদের ভয়ে। নিরাপত্তা ফিরে আসতে ক্রমে তারা ফিরতে থাকে। এর পর থেকে বহুতল বাড়ি তৈরি করার ধুম পড়ে যায়। আর তার সাথে সাথে বাড়ি ভাড়াও বাড়তে বাড়তে মধ্যবিত্তদের নাগাল ছাড়িয়ে যায়। পূষণ ঠিক করে একটা নূতন ফ্ল্যাট বা বাড়ি কিনবে। একদিন বাড়ি দেখার জন্য পূষণ এমন একটা বাড়ির সন্ধান পায়, যে বাড়িটা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাস বহন করে চলেছে। বারো কাঠা জমির ওপর এই বাড়ি দাঁড়িয়ে। প্রায় আশি বছর বয়স বাড়িটার। অনেক ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে বাড়িটার ওপর দিয়ে। এক সময় এই বাড়ির কর্তা মশাইরা পাটের দালালি করতে রয়্যাল এক্সচেঞ্জে যেতেন। কলকাতার প্রথম দশটি অস্টিন গাড়ির একটা ছিল এই বাড়ির মালিকের। রেস

খেলে মালিক সর্বস্বান্ত হয়। কিন্তু বাড়িটা বেঁচে যায়। এ বাড়িতে তিনটে আত্মহত্যা, একটা খুন, দুটো নিরুদ্দেশ আর একুশটা স্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এ বাড়ি—

"গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন, রাজধানী স্থানান্তর, বোমাবাজ তরুণ বিপ্লবীদের পাশাপাশি বড়লোক বাঙালিদের নেতৃত্বে স্বদেশী সংগ্রাম, মন্বন্তর, যুদ্ধকালীন গোরা পল্টনের আধিপত্য, সুভাষ বোস, স্বাধীনতা, দেশবিভাগ, দাঙ্গা, শরণার্থীদের বন্যা, কংগ্রেসের পতন থেকে নকশাল আন্দোলনের নামে আবার এলোপাথাড়ি মানুষ খুন পর্যন্ত অনেক উত্তেজনার গরম বাতাস এই বাড়ির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এ-বাড়ি সব ঘটনার নীরব সাক্ষী।"[১২]

বৃদ্ধ এ-বাড়িটা এখন নিজের জন্ম সাল কপালে পরে দাঁড়িয়ে আছে। পুরানো কলকাতার ইতিহাস বহন করে চলেছে।

'আতর' গল্পের প্রভঞ্জন আর শুভা দুজনে পুরানো কলকাতায় ঘটে যাওয়া বহু ইতিহাসের সাক্ষী। দাম্পত্য জীবনে নানান ব্যস্ততার কারণে শুভা এখন স্বামীকে সময় দিতে পারে না। অথচ তারা একে অপরকে ভালোবেসে বিয়ে করে। দুজনের প্রেম সেই কলেজ জীবন থেকে। শুভা আর প্রভঞ্জন স্কটিশচার্চ-এ পড়তো। কলেজে পড়াকালীন ওরা মাইলের পর মাইল রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে গল্প করেছে। প্রভঞ্জনের মনে পড়ে শুভার সঙ্গে কাটানো কলেজ জীবনের কথা। আরও মনে পড়ে, তার তরুণ জীবনের স্বাধীনতার সময়কালের দুই বিখ্যাত মানুষের মৃত্যুর কথা—

"খুব ছোটবেলায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু দেখেছে। বিশেষ কিছুই তেমন মনে নেই। শুধু মনে আছে কলকাতার রাস্তা জুড়ে এক প্রবহমান জনতার দৃশ্যটা। আর ট্রাকের পর ট্রাক বোঝাই স্তূপাকার ফুল।"[১৩]

পরে আরো বড়ো হয়ে প্রভঞ্জন দেখেছিল ডাক্তার বিধান রায়ের অন্তিম যাত্রা। সেও কী বিপুল জনস্রোত, কী বিশাল ফুলের পাহাড়। তার মনে হয়েছিল পশ্চিম বাংলায় মানুষের জীবন বুঝি স্তব্ধ হয়ে যাবে। প্রভঞ্জনের মনে পড়ে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের গৌরবগাথা। যিনি সপ্তাহে একদিন করে বিনা পয়সায় রোগি দেখতেন। দূর থেকে রোগি দেখে তিনি, কী রোগ ধরে ফেলতেন। প্রেসক্রিপশন লিখে দিতেন, রোগি দ্রুত সেরে উঠতেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে এমন জনস্রোত দেখে প্রভঞ্জনের মনে হয়েছে—

"চিফ মিনিস্টারের চেয়ে ডাক্তার বিধান রায়ের সুনাম অনেক বেশি। কিন্তু আজকের এই ভিড় রাজনৈতিক কারণে।"[১৪]

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে 'শুধু শহীদদের জন্য' গল্পে। এ গল্প থেকে জানা যায় মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানের ইতিহাস। জানা যায় ১৯৪২ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা। গান্ধিজির করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গের ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশবাসী। যদিও শেষ পর্যন্ত এ-আন্দোলন অহিংস থাকেনি। অসমসাহসী যুবকের দল টেলিগ্রাফের তার কেটে, রেললাইন উপড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করে। সরকারি

অফিসে, থানায়, কাছারিতে জাতীয় পতাকা পুঁতে দিয়ে আসে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর জেলার অবদান অনেকখানি। এ-গল্প থেকে ইংরেজদের চরম নিশংসতার ইতিহাস জানা যায়—

"সেই বিয়াল্লিশের জাতীয় আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকার রেল চালু রাখার উদ্দেশ্যে পথের দু"পাশে গ্রামগুলোয় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছিল। গুলিবর্ষণে নিহতের সংখ্যা নশো চল্লিশ। আহত ষোলশো তিরিশ। এ তথ্য ইতিহাস বিধৃত।"[১৫]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নানাভাবে অর্থ সাহায্য করেছিল ভারত সরকার। অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর হাত-পা কাটা গিয়েছিল, তাদের সেলাই মেশিন উপহার দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে সাহায্য করেছিল সরকার। শুধু তাই নয় তাদেরকে অর্থ সাহায্যও দিয়েছিল সরকার। এই গল্পে দেখা যায়, হাত-পা কেটে যাওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রমথেশ মিত্রকে সেলাই মেশিন উপহার দেয় সরকার, সঙ্গে ভাতাও দেয়। আবার দেখা যায় এমন অনেক মানুষ আছে যারা স্বাধীনতায় অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু নেতা সেজে নিজের আখের গুছিয়ে গেছে। এমন একটা চরিত্র হল বংশীধর জানা। বংশীধরের হাত দিয়ে নানান সরকারি অনুদান বিতরণ হয়েছে, আর সেই অনুদান থেকে বংশীধর জানা টাকা মেরে নিজের নামে তেল কল করে তুলেছে। তার বিড়ির ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। বলা বাহুল্য লেখক এই গল্পে প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামী আর ভণ্ড স্বাধীনতা সংগ্রামী, উভয়ের চিত্র সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ও ক্যালকাটা' গল্পটি অসাধারণ গল্প। এই গল্পে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কারখানার মালিক ও শ্রমিকশ্রেণির ইতিহাস চিহ্নিত হয়েছে। এ-গল্পে দেখা যায় বিপিকো এন্টারপ্রাইজ একটা মাঝারি মাপের বাঙালি শিল্প প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে আড়াইশো লোক কাজ করে এই কারখানায়। এখানে বিদ্যুৎ চালিত পাখা, যেমন সিলিং ফ্যান ও টেবিল ফ্যান তৈরি হয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে এই সমস্ত কোম্পানিগুলোর মালিক ছিল ইংরেজ সাহেবরা। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন কারণে তারা এই কোম্পানিগুলো বিক্রি করে দিয়ে চলে যায়। এমন একটা কোম্পানি কিনে নেয় সোমেশ মল্লিক, রবার্ট পারকিন্স নামে এক বুড়ো সাহেবের কাছ থেকে। রবার্ট পারকিন্স নিজে ছিলেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। বিপিকো কোম্পানির পাখার সুনাম ছিল খুব। স্বাধীন ভারতে বসবাস করা রবার্ট পারকিন্সের পক্ষে কষ্টকর ছিল। তাই তিনি সাধের বিপিকো কোম্পানি বিক্রি করে দেন। ইংরেজ আমলে শ্রমিকদের মধ্যে কোনো ইউনিয়ন ছিল না। শ্রমিকরা তাদের দাবি মুখ ফুটে বলতে পারত না অত্যাচারের ভয়ে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শ্রমিকদের মধ্যে একজোট হয়ে ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। তারা তাদের দাবি মালিক পক্ষকে জানায়। মালিক পক্ষ দাবি না মানলে স্ট্রাইক করার হুমকি দেয়। বিপিকো এন্টারপ্রাইজের শ্রমিকরা, মালিক সোমেশ মল্লিককে চিঠি দেয়। সেই চিঠিতে তারা তাদের দাবি জানায়। কিন্তু মালিক সোমেশ মল্লিক

তাদের দাবি মানতে নারাজ। সোমেশ মল্লিক বলেন—

"কীসের ইউনিয়ন? কার ইউনিয়ন? আমার হাতে-গড়া এই কারখানা। প্রত্যেকটি ওয়ার্কারকে, স্টাফকে আমি চাকরি দিয়েছি। তারা এখানে কাজ শিখেছে। কতগুলো বাইরের গুন্ডা এসে তাদের উসকানি দেবে, আমি সহ্য করবো না।"[১৬]

এই ইউনিয়নের লিডার সুধীর খাস্তগীর। সমস্ত শ্রমিককে একজোট করে আন্দোলন করে। সোমেশ মল্লিক শ্রমিকদের দাবি মেনে নেন না, ফলে কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায়। অনেক শ্রমিক না খেতে পেয়ে মারা যায়। এতে মালিক শ্রেণির কিছু আসে যায় না, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণির সংসার অচল হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন কারখানা বন্ধ থাকার পর, সোমেশ মল্লিকের ছেলে প্রকাশের সঙ্গে ইউনিয়ন লিডার সুধীর খাস্তগীরের চুক্তি হয়। সুধীর খাস্তগীর বলে—

"মাথা পিছু আপনার খরচ বাড়বে মাসে একশো টাকা। আপনার লাভের দশ শতাংশের ওপর হাত পড়বে না। প্রোডাকশন কস্ট ধরে দেখলে- মোট মজুরির হার এখনও পনেরো শতাংশের মধ্যে রইল।"[১৭]

এই সমস্ত ইউনিয়নের নেতারা শ্রমিকদের টাকায় সুখে জীবনযাপন করে। তারা শুধু শ্রমিক আর মালিককে মধ্যস্থতায় আনতে পারলে মালামাল হয়ে যায়। তাই মালিক প্রকাশ যখন সুধীর খাস্তগীরকে প্রশ্ন করে- আপনার ফি কে দেবে? তখন সুধীর খাস্তগীর সহাস্যে বলে—

"ম্যানেজমেন্ট না। আমি ট্রেড ইউনিয়নের সর্বক্ষণের চাকর। ওরা আমার সমস্ত খরচ পুষিয়ে দেয়।"[১৮]

লেখক শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে বিশ শতকের নগর কলকাতার চিত্র এত সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, আমরা বর্তমান সময়ের পাঠকরা যেন সেই সময়ের কলকাতায় বিচরণ করতে পারি। অনুভব করতে পারি বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়কে।

তথ্যসূত্র :

১. শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, গল্পসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, কলিকাতা, পৃ. ৪-৫
২. তদেব, পৃ. ৭
৩. তদেব, পৃ. ৮
৪. তদেব
৫. তদেব
৬. তদেব, পৃ. ১৯

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

৭. তদেব, পৃ. ২০
৮. তদেব
৯. তদেব, পৃ. ২২
১০. তদেব, পৃ. ৩০
১১. তদেব, পৃ. ৩১
১২. তদেব, পৃ. ৭০
১৩. তদেব, পৃ. ১০৪
১৪. তদেব
১৫. তদেব, পৃ. ১৪৫
১৬. তদেব, পৃ. ১৮৩
১৭. তদেব, পৃ. ১৯৮
১৮. তদেব

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ :

১. শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, গল্পসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০০

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বিনয় ঘোষ, মেট্রোপলিটন মন.মধ্যবিত্ত.বিদ্রোহ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জুন ২০২০
২. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা, র‍্যাডিক্যাল প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০

বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা : "আরেক মুঠো অথৈ আকাশ"

প্রীতম চক্রবর্তী

[বিষয় চুম্বকঃ বিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে যে কজন উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়। মেধাবী এই কবির কাব্যচর্চার প্রধান বৈশিষ্টই হল বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন ভঙ্গির বৈচিত্র্য। একজন নারী হিসাবে নারীর মনন-চিন্তন নিয়েই মরমী কলমে রচনা করেছেন কবিতা। কখনোই তিনি ঘোষিত নারীবাদী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেননি। উচ্চকিত প্রতিবাদে বিশ্বাসও করতেন না। অথচ সেই মৃদু প্রতিবাদও কোনো কোনো সময় তীব্র ব্যঙ্গ বক্রোক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। কেবল মেয়েদের যন্ত্রণা, সমস্যা বা সে-সব বিষয়কে নিয়েই নিজের কাব্যচর্চাকে কেন্দ্রীভূত রাখেননি, সমকালীন নগ্ন ও আদর্শহীন রাজনীতি, ভোগবাদের প্রাচুর্য কবিকে যন্ত্রণায় কাতর করেছে। নাগরিক সভ্যতার আগ্রাসী মনোভাব, তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা, প্রযুক্তির অমানবিক ব্যবহার প্রভৃতির কথা যেমন তাঁর কবিতায় আছে, তেমনই নিপুণ হাতে নিটোল প্রেমের কবিতাও রচনা করেছেন কবি বিজয়া মুখোপাধ্যায়]

বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আমার প্রভুর জন্য' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭তে। সেদিক থেকে তিনি ষাটের দশকের কবি। কৃত্তিবাস পত্রিকার অন্যতম কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় সহধর্মিনীও বটে। ১৯৬৩তে তাঁর লেখা কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়। ১৯৬৪ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত থেকেছেন লেখালিখিতে। এর পাশাপাশি এই মেধাবী কবি ছিলেন আর এস এম বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছিলেন The Dept. of Indological Studies & Research– রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা নিকেতনের সঙ্গে। বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকেও নিভৃতে নিজের কবিতাচর্চা অব্যাহত রেখেছেন কবি। বাংলা ছাড়াও তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষাতেও গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রথম কাব্য প্রকাশের পর আর কলম থামেনি, ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়ে চলেছে তাঁর একের পর এক কাব্যগ্রন্থ, - 'যদি শর্তহীন', 'ভেঙ্গে যায় অনন্ত বাদাম', 'উড়ন্ত নামাবলী', 'দাঁড়াও তর্জনী', 'অশ্লেষা তিথির কন্যা' প্রভৃতি। সর্বশেষ প্রকাশ পেয়েছে 'আজন্ম হস্টেলে আছি" কাব্যটি। 'এসো আমরা নাটক করি', 'মাঝখানের দরজা' প্রভৃতি তাঁর অন্যতম গদ্যগ্রন্থ। ইংরেজী ভাষায় লিখেছেন, 'No Symbol No Prayer', 'Shadow in the Seed' প্রভৃতি বইগুলি।

বিজয়া মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কবিতা সংগ্রহ'-এর প্রাক কথনে লিখেছিলেন - 'পরিণত বয়সে পৌঁছে পিছন ফিরে দেখেছি জীবনটা সুখে দুঃখে, বেদনা ও অহংকারে মিলেমিশে অন্য অনেকের থেকে ভালো কেটেছে। ১৯৬৪ সাল থেকে নির্দিষ্ট লেখালেখি শুরু, আজ অবধি ১৬টি বইও প্রকাশিত হয়ে গেছে। তার অধিকাংশই কবিতা। আত্মপ্রকাশ ও আত্মগোপন, লিখনশৈলীর বিবর্তন ও উত্তরণ ভাষা ব্যবহারের অন্তহীন পরীক্ষা- এসব কবিতায়ই সম্ভব বলে আমি মনে করি।'

কবি শুধু মনে করে ক্ষান্ত হননি, সেই সম্ভাব্যতাকে নিজ কাব্যচর্চায় মিশিয়ে দিয়েছেন। তাই কবির প্রভু হয়ে উঠেছেন কবিতা। 'আমার প্রভুর জন্য" কবিতায় লিখেছেন :

হে জ্ঞানী পিতৃকুল
তোমাদের আভূমি প্রণাম
কন্যাকে ত্যাগ করো অন্ধকারে।
তোমাদের ঘৃণাঞ্জন আমার অঙ্গলেপ, বিস্তৃত তমস্থান উত্তরীয়
ধিক্কারে রাত্রিস্তোম সংকলিত হোক।

বিষয় বৈচিত্রে ভরা তাঁর কবিতার ভুবন। একই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বিভিন্ন কবিতায় ঘটেছে বৈচিত্রের সমাহার। বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা রচনার কালের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে ১৯৬৩তে কৃত্তিবাস পত্রিকার যোড়শ সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। হাংরি আন্দোলন ক্রমশ বিশাল আকার ধারণ করেছে। বাংলা কবিতায় শ্রুতি আন্দোলনের শুরু। অশ্লীল কবিতা লেখার দায়ে জেল হয় মলয় রায়চৌধুরীর। এরই মাঝে রাজনৈতিক সংকট, - ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙ্গন, পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন, সমগ্র রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাস, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন এবং সর্বোপরি নকশাল আন্দোলন সমগ্র বাংলাকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন এবং স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে বাংলাদেশের জন্ম হয়। কবি নিজেও জন্মেছিলেন ১৯৩৭এ, ঢাকার বিক্রমপুরে। ১৯৪৭ এর দেশভাগের যন্ত্রণাও কবির রচনার এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তাল সেই সময়ের কলরব খুব উচ্চকিত না হলেও স্পষ্ট শোনা গেছে বিজয়া মুখোপাধ্যায় কবিতায়—

ভোর হলে রক্তপাত থামাবার বন্দোবস্ত হবে
তাঁর আগে সামনে এস, বেজেছে সাইরেন
নারকেল পাতার ফাঁকে নক্ষত্ররা সজ্জিত হয়েছে
নিঃশব্দ উপনিবেশ, যাও
সাজো। (বেজেছে সাইরেন)

'নৃশংসতা তুমি' কবিতাতেও ফুঠে উঠেছে এই চিত্র। কবিতা শুরু করেছেন শেষের মধ্য দিয়ে - 'নৃশংসতা, বন্দনা তোমাকে', এই কথা বলে। তবে নৃশংসতার বর্ণনায় কেবল বাহ্যিক ঘটনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, এর গভীরে কবির মৃত্যু সম্পর্কে জীবনদর্শনও প্রকাশ পেয়েছে। তাই এই পরিণতি কোন নিয়মনীতির বশ্যতা স্বীকার করে না। কবি এই কবিতায় শেষ স্তবকে লেখেন :

নৃশংসতা, তুমি কোনো চিকিৎসা জানো না?
জিহ্বামূলে বিঁধে আছে কাঁটা

বিবেক দংশন
উপড়ে নাও আলজিভ কিংবা কন্টকারি

মধ্যপন্থা আমি তো শিখিনি।

"পক্ষী", 'বাঘ'প্রভৃতি কবিতাগুলির নামকরণে মানবেতর প্রাণী থাকলেও আসলে মানব সমস্যাকেই তুলে ধরেছেন রূপকের আড়ালে। যেমন "পক্ষী" কবিতায় দুটি স্তবকের পংক্তিগুলি হল :

পৃথিবীতে যত খাদ্য আছে, চাই তাঁর সুষম বন্টন
সমস্ত প্রাণীরই চাই একটি করে নিজস্ব বসত

'বাঘ' কবিতাতেও প্রান্তিক মানবজীবনের জীবনচর্চার এক অস্পষ্ট আভাস ফুটে উঠে। রাজনীতির যে আগ্রাসী রূপ, আধিপত্যকামিতা ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে দেশকে, অধিকার করে নিচ্ছে সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে মানবিক মূল্যবোধগুলিকে— এদিকে দৃষ্টিপাত করেছেন কবি কয়েকটি কবিতার মধ্য দিয়ে। এই ধরনের অন্যতম একটি কবিতা 'বোঝাপড়ার খেলা'। 'জনতা ও জননেতার বোঝাপড়ার খেলা' ই এই কবিতার বিষয়বস্তু—

যারা দাপিয়ে বেড়ায়, তাদের মধ্যে

একটাই হুলো, জননেতা।
গায়ে সাদাকালো ছোপের জামা, যাকে বলে স্মার্ট।

কেবল জননেতা নয়, অস্থির সময়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তোষামোদকারী মানুষের কপটতার মুখোশেও টান দিয়েছেন কবি। 'শান্তি পুরস্কার' কবিতায় 'বোকাসোকা' লোকেদের চালাক হওয়ার পথটুকুই দেখিয়েছেন। সুবিধাবাদের পথ বেয়ে তারাই অর্জন করেছে 'শান্তি পুরস্কার'। আর অন্যদিকে সমগ্র বিশ্ব ভীত আন্তর্জাতিক সংকটে :

আগুন অস্ত্র জামাবার ঠাঁই নেই।
যুদ্ধ না হোক, দমচাপা সন্ত্রাস
বাড়িয়ে তুলেছে উত্তেজনার পারা
যুদ্ধ-যুদ্ধ, খেলাও অবিশ্বাস।

কেবল বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন সমস্যা নয়, আমাদের নিকট সমাজের সমস্যার দিকেও আলোকপাত করেছেন কবি বিজয়া মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে। কন্যাভ্রূণহত্যা থেকে শিল্পায়ন, বৃক্ষছেদন থেকে চিকিৎসার গাফিলতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি থেকে জুয়াচুরি - সবই সমালোচিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' কবিতায় লিখেছেন,

ইশকুলে লাবড়ার ঘ্যাঁট — ছিল তাতে সাপের খোলস ?

প্রসন্নবাবুকে বলো, উনি খুব দয়া পরবশে।
এ রাজ্যে মেয়েরা মুক্ত, লবণহ্রদের কটা পাড়া ....
আরও যে ঝকমকে পল্লি, তারা বুঝি এই রাজ্য ছাড়া?

কবি যশোধরা রায়চৌধুরি, বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "বিজয়া মুখোপাধ্যায় যখন লেখেন, তাঁর কাছে সমস্ত কবিতাই আসলে মানুষেরই কবিতা,

একই সঙ্গে সেই কবিতার একেবারে ভেতরে থেকে যায়। হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠে এমন এমন সব মেয়েমানুষের কথা, মানুষ হিসাবে অস্বীকৃত হয়ে অপমানিত বিক্ষুব্ধ মেয়ের মনের কথা, এমন সব সত্য হঠাৎ করে ভেসে ওঠে কবিতার মধ্যে যে আমরা স্তম্ভিত হই, পুষ্ট হই ঋদ্ধ হই।"

ঘোষিত নারীবাদী তিনি নন। অনুভাবী মন নিয়ে নারী জীবনের সীমাবদ্ধতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই ভাবনাকেই ছড়িয়ে দিয়েছেন কবিতায়। মেয়েদের জোর করে আটকে রাখা হয়। গণ্ডীবদ্ধ জীবনে। একেবারে প্রথম পর্বের কবিতা "পুঁটিকে সাজে না" কবিতাটিতে নারী জীবনের সে ভাষ্য প্রকাশিত। দৃপ্ত কণ্ঠে কোনো প্রতিবাদ সেখানে নেই, শুধু বিষয়টুকু প্রকাশ করে গে সাধারণ রূপচর্চা, সংসার সেবা — এই মহৎ কাজই নারীজীবনের চরম সাধনা। সমা বক্তব্যকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। "ঘর হতে তার "আঙিনা, বিদেশ" স মেয়েদের এমন শিক্ষাই দিয়ে আসছে

তুই তোর ঘর গুছিয়ে নে
প্রদীপের সলতে পাকা
মনে রাখিস পুঁটি
এই তোকে ছেলে মানুষ করতে হবে
ধিঙ্গিপনা তোকে কি সাজে, ছি।

প্রতিবাদ সবসময় এতখানি মৃদু নয়। কোথাও কোথাও উচ্চকিত, কোথাও ব্যঙ্গ এমনই শাণিত যে লিঙ্গরাজনীতির ওপর তীব্র কষাঘাত করে। এই ধরনের কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'পুরুষ'। পরাক্রমী পুরুষের ক্রোধ-উল্লাস-অভিমান-অবজ্ঞা- সবই সমাজের কাছে কাঙ্ক্ষিত। খ্যাতিসম্পন্ন পুরুষের কুৎসা মুহূর্তে ঢেকে যায়। পূজ্য হয়ে ওঠে তারাই। আর অন্যদিকে —

আঙুল ঘোরালে যারা ছুটে আসে
উচ্ছিষ্ট হতেই ভালোবাসে, ধর্ষণে কৃতকৃতার্থ হয়
তারা জানে রমণী কামিনী নারী
অঙ্গনা বনিতা চিররমা।

বধু নির্যাতন, বধুহত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা—আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীর পত্র' এ মৃণালের জবানীতে লিখেছিলেন সে কথা। বিন্দুর মৃত্যুতে —

'দেশশুদ্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশন হয়েছে। ... তোমরা বললে এ সমস্ত নাটক করা! তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির ওপর দিয়েই হয় কেন আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার ওপর দিয়ে হয় না। কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।"

সেটা ভেবে দেখেই কবি বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের 'শ্মশানে শোয়ানো আপদমস্তক শাদা চাদরে ঢাকা" লাশকে মনে হয়েছে মহিলাই। "লোকালয় থেকে বহুদূরে, একটি ঘর, একা। মৃতদেহ দেখে স্মরণে এসেছে' 'জীবিত ও মৃত' গল্পের কাদম্বিনীকে, যাকে মরে প্রমাণ করতে

হয়েছিল যে সে মরেনি। ভয় আর শঙ্কার মাঝে থেকেও তাদের বার বার ভালো থাকার অভিনয় করে যেতে হয়। অথচ সেই মানবী প্রতিাদের "ভাসানের আগেই ভাসান" হয়ে যায়। ঘাটে ভেসে আসে ভাসানের নৌকা, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বিদায় নেয় সে—

কেন শুধু শুয়ে থাকে? — জিজ্ঞেস করেছে এক শিশু
কেউ তাকে সত্য জানাবে না,
কেন শুধু শুয়ে থাকে মাতৃনামে বীতবদ্ধ প্রমা
শুয়ে থাকে বাক্যহীন অশ্রুবিন্দু হয়ে
আমাদের সকলের ক্ষমা। (প্রতিমার মতো মুখ)

নিতান্ত সাধারণ/প্রত্যয় গ্রামের মেয়ে টুকাই গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে উন্নত প্রযুক্তির জগতে সে হয়েছে 'অসামান্য মহিলা'। পরিবারে সে এনে দিয়েছে আর্থিক স্বচ্ছলতা। তার বাহ্যিক আচরণেও গর্ব ফুটে ওঠে, কিন্তু—

এখন শ্রেয়সী নামে জিনস পরে জিমে যায় টুকু
রাতের হোটেল-নাচে যৌন অভিনয় সারা করে
ক্লান্ত হয়ে ফেরে, অচেতন
দুঃখিনী টুকাই (টুকাই)

শুধু টুকাই নয়, এই সর্বনাশের সুখের আশায় উনিশ-কুড়ি বছরের লক্ষ্মীও বস্তি থেকে চলে যায়। উকুন ভরা মাথা আর ময়লা আঙুল চোষা মেয়েটির দেহে জৌলুস এলেও জীবন যায় অন্ধকারেই।

'তাঁতবস্ত্র' কবিতায় মেয়েদের সংস্কারের নিগড়ে বন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে আছে প্রতিবাদ। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক বা উৎপাদন ক্ষেত্রে পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ এই কবিতায় স্পষ্ট। 'তাঁতঘর' এখানে উৎপাদন ক্ষেত্রের রূপক :

শাড়ী পরে স্বামীগৃহে যাও মেয়ে, জানবে যা বুনট
জানলে ফাঁস হয়ে যাবে, চক্ষুদান দেখবে না কন্যারা।
....
জানা অপরাধ তোর ও তির্যক ধানছাড়া, বিছা -
কলাচর্চা পুরুষের, উপার্জনও পুরুষের হাতে।

শুধু অর্থনৈতিক কারণ নয়, শারীরিক শুচিতা হেতু দেখিয়েও মেয়েদের উৎপাদনশীল কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় —

তা ছাড়া, তুমি তো মেয়ে শুদ্ধ দেহ থাকো না সর্বদা
গৃহদেবতার মতো বস্ত্র, তাঁর পবিত্র বয়ন
টানাপোড়েনের গরমিলে তুমি এসো না কখনও সোনা মেয়ে।

সেই মেয়ে সংসারে গেল "বুকে অপরাধ বয়ে"। বেসামাল সংসারকে অপটু হাতে সোনার সংসারে পরিণত করার আপ্রাণ করার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, নিজেকে সেই সংসারে বন্দিনী

হিসাবে দেখতে দেখতেই 'অসম্ভব অহংকারী হয়ে ওঠে। আবার কেউ একেই "নির্বাসন" বলে মেনে নেয়। যেমন "যোগ্যতার জন্য" কবিতার কথক মেয়েটি। "ভুল" আর "অহংকার"কে সরিয়ে, সোনালি রিবন, রেশমি ঝালর, মুক্তোর কাঁটা ফেলে নিরাভরণ বেশে যেতে চায় নির্বাসনে। "এই পৃথিবীর যোগ্য" এবং "এই মহীয়ান জন্মের যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য নতশিরে অপেক্ষা করবে মেয়েটি। এই যাত্রায় কাঙ্ক্ষিত তার মায়ের আশীর্বাদ :

আমার মাথায় রাখো তোমার পাঁচ আঙুলের ছাপ
সিথিতে সমান্তরাল করো তোমার অক্ষয় তর্জনী।

'শুনতে শুনতে' কবিতাতেও আছে এমন এক মেয়ের কাহিনী, ছোট থেকে না শুনে যার বেড়ে ওঠা—

শুনতে শুনতে মেয়েটা কুঁকড়ে কালো হল
কুঁজো হল, মাথায় বাড়াল না।

শেষ পর্যন্ত লগ্ন মেনে সেও হয়ে উঠল পরিণীতা বধূ, জন্ম দিল আরেক কন্যার। মেয়েটি অন্ধ বধির। এটির ব্যঞ্জনা দ্বর্থবোধক ভাবনা বহন করে। সারা জীবন সমস্ত নিয়মের বেড়াজাল মেনেও ভাগ্যের পরিহাসে তাকে জন্ম দিতে হয় এক প্রতিবন্ধী সন্তানের। আবার এই সংস্কারবদ্ধ সমাজে নারীর অবস্থান তো অন্ধ বধিরের মতো। যুক্তিকে অস্বীকার করে যাকে নির্বিবাদে, নিঃশব্দে শাসনের গণ্ডিতে নিষ্পেষিত হতে হয়। শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী মেয়ে নীপার কথা আছে 'প্রতিবন্ধী' কবিতায়। সেই 'হাবা তরুণী' নীপা— যার রাগ, ঈষা, আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার মতো স্বাভাবিক বৈশিষ্টগুলো কারোর চোখে পড়ে না। প্রকট হয়ে ধরা দেয় কেবল খুঁত। তার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষিত হলেও সহজে মনে না সেই মেয়ে। মুক্তি পায় না সংস্কারের বাঁধন থেকে -

যোলো বছরের নীপার প্রত্যঙ্গ পুষ্ট হয়ে উঠতেই
ঠাকুরঘরে গোপালের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হল তার।

প্রতিবন্ধী মেয়ে জন্মের এই পরিণতি। কিন্তু জন্মানোর আগেও তো শেষ হয়ে যায় কত প্রাণ। 'ছ-সপ্তাহের নষ্ট গর্ভ বউ' কাদলে তাকে ভর্ৎসনা করা হয় তীব্র ভাবে। 'বিজ্ঞাপন' কবিতায় কবি দেখেন,

ভ্রূণহত্যা ফিরবে বার বার
বার বার উন্মুখ তোকে
যেতে হবে দুর্গন্ধ ক্লিনিকে।

এই ভ্রূণহত্যার হিসাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'পরিসংখ্যান, ২০০২' কবিতায় -

একশ পুরুষে
মেয়ে তিরানব্বুই
সমস্যাগুলি
পাশে রেখে ফিরে শুই।

কবি পাশ ফিরে স্থির হয়ে শুতে পারেন না। তাই সেই সাতজন মেয়ের খোঁজ করতে

বেরোন। খুঁড়তে থাকেন কবরের মাটি। সমাজপতিরা নির্দিষ্ট করে দেন এই অসাম্যের হেতু। অকল্যাণ বা কপালের দোষ দেখিয়ে পুরুষতান্ত্রিক ভিতকে আরও মজবুত করে দেয়।

কেবল প্রতিবাদ, শ্লেষ- ব্যঙ্গ বা নেতিবাচক বিষয়ের চর্চাই বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ঠ্য নয়। প্রতিবাদকে যেমন মরমী কলমের ছোঁয়ায় প্রকাশ করেছেন তেমনই স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিসঞ্জাত প্রেম রূপ পেয়েছে তাঁর কবিতায়। 'একটি ঘোষণাও আমি' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ যদি শর্তহীন এর অন্তর্গত। কবিতায় প্রথম পংক্তিতেই কবি জানিয়ে দিলেন --

ভালোবাসার কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

এখানে যে ভালোবাসার পরিচয় দিলেন, তা স্থিতধী মনের পরিণত ভালোবাসা নয়। সেই ভালোবাসা নিয়তির মতো গ্রাস করে নেয় মন হৃদয় সবকিছুকে। এমনকি এই নারকী প্রেম বিনাশের দিকেও এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই কবিতার শেষ স্তবকে গিয়ে কবি লেখেন,

ভালোবাসা, সর্বনাশ
আমাকে গ্রহণ করো
সহমরণের জন্য আমিও প্রস্তুত।

কৈশোরকালীন বা উদ্ভিন্ন তারুণ্যের যে প্রেম তাও ধরা আছে 'দুজন" এর মতো কবিতায়। অল্পবয়সে প্রেমের ছেলেমানুষি, লুকোচুরির সঙ্গে ভালোবাসা যে মানুষকে সহজেই নত করে তার ইঙ্গিত খুব সূক্ষ্মভাবে কবি দেখালেন এখানে—

রানির মতো সেই মেয়েটি, তবু শখ
দুহাত ছুঁয়েছিল
মেজাজী ছেলেটির
পায়ের কালো নখ।

বিবাহপূর্ব এক নিবেদিত প্রেম এটি। বিবাহ পরবর্তীকালে দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে ঘটে প্রেম ও প্রেমহীনতার দ্বন্দ্ব। যেমন—'মধুবিষে ভরা' কবিতায় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ও তার মাঝে সন্তানের অবস্থান, - এই বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপিত :

মধু বিষে ভরা ও দাম্পত্য।
সন্তান, তুমি অধিকার ভ্রমে গণ্ডি পেরিয়ে
এদিকে এসো না।

দাম্পত্য সম্পর্কের অলি-গলি সন্তানের অনুধাবনের বিষয় নয়। তবু সেই গণ্ডি পেরিয়ে সন্তানের উঁকি দিতে ইচ্ছা করে। সেখানেই কুণ্ঠিত দম্পতি—

দম্পতি যেন হঠাৎ পাথর। সন্তান, তার
বুক ভেসে যায় উথাল পাথাল
বাইরে পাথর, ভেতরে কি মধু, ভেতরে কি বিষ?

প্রত্যহের ম্লান স্পর্শে প্রেমে আর স্নিগ্ধতা থাকে না। সারাক্ষণের সঙ্গী তখন কেবল মনে জাগিয়ে তোলে উদ্বেগ, এরই সঙ্গে নিত্য বসবাস। আর অন্য দিকে—

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

প্রেম অতিথির মতো
কখনও ঢুকে পড়ে অল্প হেসে,
সমস্ত বাড়িতে স্মৃতিচিহ্ন ফেলে রেখে
হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। (সঙ্গী)

২০০২এ প্রকাশিত 'সামনে আপনারা' কাব্যগ্রন্থে বিজয়া মুখোপাধ্যায় এনেছিলেন মিলি নামের চরিত্র। অবশ্য চরিত্র না বলে সম্বোধন বলাই শ্রেয়। মিলিকে সম্বোধন করে কবি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করে চলেছেন। 'মিলির সঙ্গে সংলাপ' কবিতায় তিনটি অংশ আছে। তিনটি অংশ জুড়েই প্রকৃতির এক বিশেষ ভূমিকা আছে। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোবার জন্য কবিমন উন্মুখ হয়ে আছে। কখনও গভীর দার্শনিক ভাবনার ছোঁয়াও লাগে সেখানে। এই কবিতাগুলি কেবল গদ্যছন্দেই লেখা হয়েছে এমন নয়, সম্পূর্ণ গদ্যের আঙ্গিককেও ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতির দীর্ঘ বর্ণনার পাশাপাশি শোনা যায় নিঃসঙ্গতার সুর। শব্দচয়ন ও বাক্য নির্মাণও সাধারণ গদ্যের মতো। তবে মিলিকে সম্বোধন করে রচিত 'যাঁরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যান', 'গড়িয়াহাট রোড, ১৯৯৯, 'রাত্রির ডায়রি' বা 'চৈত্রবনের গন্ধ' কবিতাগুলি সাধারণ কবিতায় আঙ্গিকেই রচিত। কখনও মিলি কবির কাছে যন্ত্রণার উপশম—

আপ্রাণ লড়াই করছি। তুমি বুঝতে পারো?
ফালাফালা করে ফেলছে নষ্ট পরিবেশ
টলে যাচ্ছে মাথা, শিরদাঁড়া, উপড়ে যাচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা, খুঁটি।

'চৈত্রবনের গন্ধ'কবিতায় প্রকৃতি অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। মধ্যচৈত্রে অর্থাৎ গ্রীষ্মের দুপুরে গ্রামে গিয়ে সেখানকার রূপ-রস-গন্ধ অন্তরে ধারণ করেছেন। হাতে নিয়ে ফিরেছেন 'গ্রীষ্মফুল'। রাতে সেই ফুল কলমদানি থেকে "পাগলকরা সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। নগরজীবনের কাঠিন্য কবির মনে জাগিয়েছেন বেদনা। শহরের রাস্তার ধারে ফুটপাত ঘেঁষে কাঁচা জমি নেই"। বিশ্বায়ণ এসে শহরের বাড়ি ভেঙে তৈরি করেছে সৌধ মাল্টিস্টোরেজ বিল্ডিং বা শপিং মল। কিমপেটা আওয়াজে ঢেকে গেছে 'মানুষের স্নায়ু, মগজ, চোখ, নাক"। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়েও —

তবু আজ এই ভবিতব্য ভুলে, এ মুহূর্তে মিলি, তোমাকে
পাঠাতে চাই একমুঠো সুগন্ধ বাতাস।

নাগরিক সভ্যতার এই আগ্রাসী মনোভাব কবিকে বার বার আতঙ্কিত করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণের নামে যে কপটতা চালিয়ে যায় শিক্ষিত শহুরে সমাজ কবি ধিক্কার জানান তাকে। প্রতিবাদ করেন তীব্র কণ্ঠে—একের পর এক গাছ কাটা হয় যেখানে রাস্তা চওড়া করার নামে। শহর জুড়ে হবে ফ্লাইওভার। আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপন উৎসবে লাগানো গাছ 'কিছু মর লুটোবে ধূলোয়'। এই ইট-কাঠ-কংক্রিটের মাঝে বেড়ে ওঠা শৈশব নিয়ে কবি চিন্তিত—

বিভ্রান্ত বালকের চোখে এখন শুধু প্লাস্টিক পর্দা, ইলেকট্রিক কারিগরি
জল নেই, স্বপ্ন নেই, শুধু ফোটোগ্রাফ।

এই নিয়ে তথাকথিত শিক্ষিতমহলে চলে ফলহীন কিছু দীর্ঘ আলোচনা—
বুদ্ধিজীবিতের দল শুধু ফন্দি আঁটে
সেমিনার শুধু দীর্ঘ হয়। ("গড়িয়াহাট রোড, ১৯৯৯)

তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা সংকটের মাঝেও কবি স্বপ্ন দেখতে চান মিলিকে :

রাতে ঘুম আসে না, ভোরে ঘুমোই একটু—তোমাকে তো স্বপ্ন দেখতে দেখতে হবে।
দেখতে হবে কপালের ব্রুণ আর মস্ত নাকের নীচে একসমুদ্র হাসি। (আরও মিলি)

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বলোককে গ্রাস করে নিয়েছে। স্বদেশ-বিদেশের দূরত্ব গেছে ঘুচে। অন্তর্জালে আহ্বান আর মানুষের মৌখিক বা হার্দিকভাবে স্বাগত জানানোর মধ্যে তফাৎ রয়েছে- এই বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে কবির 'অন্তর্জাল ও পিপড়ে' কবিতাতে। সেই অন্তর্জাল পৃথিবীর আবহাওয়ার সংবাদ দেয়, কিন্তু 'সাগরের দিকে থাকে যে সব মাঝিবউ' তাদের কাছে সেই সাবধানবাণী পৌঁছয় না সব সময়। তাই কবি বিশ্বাস করতে বলেন ওই উদ্বাস্তু পিপড়ে সারিকে। 'টুলির জন্য' কবিতাতে প্রযুক্তি কীভাবে শিশুমনকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিয়েছে তার ছবি ধরা পড়েছে। মোবাইল, ডিটিপি মানুষকে সরিয়ে দিয়েছে কবিতার কথা, কবিতার ক্লাস, ছন্দের বারান্দা বা বাংলা ছন্দ পরিক্রমা'র মতো বইয়ের কাছ থেকে। অনেক সুবিধা এই টেকনোলজির জগতে। কিন্তু 'ঘাসে রক্তপাতে/অসম্মানে উদাসীন ফুটেছে অক্ষর' —সেই যাত্রার সঙ্গী হতে পারেনি প্রযুক্তি নির্ভর মানুষ। বিজ্ঞাপনের চাকচিক্য ও বিনোদনের প্রদর্শনকামিতা গ্রাস করে নিয়েছে শিল্প, সাহিত্য — সব কিছুকে।

এই যান্ত্রিক জীবনই কবিকে বার বার টেনে নিয়ে গেছে প্রকৃতির কাছে। কবি হারিয়ে ফেলেছেন শুদ্ধতার ভাষা। প্রকৃতির অনুসঙ্গে কবি মানবসমাজের মূল্যবোধ্যহীনতার দিকেও দৃষ্টিপাত করেছেন,

আজকের ভোর মলিন, আজকের সন্ধ্যা
ধোঁয়াটে। দেখা যায় না জলে প্রতিচ্ছবি, সকালের সূর্য্য
আর সন্ধ্যার তারামন্ডল। (চাওয়া)

বিভ্রান্ত মানব সমাজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবির কাতর অনুনয়—

মরতে মরতে বলে যেতে চাই,
বন্ধ হোক লজ্জা রক্তপাত,
আবন্ধ, অব্যর্থ হোক মানবজীবন। (চাওয়া)

'ঐশ্বরিক' কবিতা ও কবি চেয়েছিলেন 'ক্রন্দনহন্তারক' পুত্র। তিনি চেয়েছিলেন পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে তুলতে। কিন্তু সেই দৃঢ় অঙ্গিকার রাখতে ঈশ্বরও অক্ষম :

ঈশ্বর প্রথমে হাসলেন,
তারপর তাঁর নিরুপায় চোখ থেকে
বিশাল অশ্রু ঝরে পড়ল।

তবুও 'আয়ুষ্মতী পুত্রবতী মায়ের স্বপ্ন নেভে না। 'তেলচিটে লাথি' সহ্য করে মা শুয়ে থাকে

ফুটপাতে

ওর ছেলে কী করে, কজন,
অয়াগন ব্রেকার কিংবা বেশ্যার দালাল
কিংবা খঞ্জ অথবা ভিখারি। (আয়ুষ্মতী পুত্রবর্তী)

কিন্তু বাঁচার ইচ্ছে বড় ভয়ংকর, তাই সমস্ত প্রত্যাখ্যানকে অস্বীকার করে তাকিয়ে থাকে জীবনের দিকে। 'ধুলোর কার্পেট ছিঁড়ে' কবিতায় আছে তেমনই এক নাবালিকার কথা। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকা যে মেয়েটির হাতের মধ্যে থেকে ফসকে গেছে শৈশব। সেও অপেক্ষা করে সেই জাদুকরের, যে

'কোনদিন এসে, হেসে
ফিরোজা আলোর নীচে, খেলাচ্ছলে
দিয়ে যাবে চাবি .....'

শুধু তাই নয় ভবিষ্যতের স্বপ্ন আঁকা হয়ে যায় তার চোখে, উচ্চাকাঙ্খী মেঘ এসে অবসান ঘটাবে তাদের অপাংক্তেয় জীবনের।

'রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা' তাঁর প্রথম কাব্যের অন্তর্গত কবিতা। সেখানে সরাসরি রবীন্দ্রনাথের স্তুতি উচ্চারিত হয়নি। যে গভীর জীবনদর্শন, যে ইতিবাচক মনোভঙ্গি অন্ধকারের মাঝেও মানুষকে আলোকমুখী করে তোলে তারই নিদর্শন এ কবিতা। শেষ জীবন পর্যন্ত বিশ্বাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে গভীর আস্থা তা এখানে দ্যোতিত। শেষেও যে শুরুর ঈঙ্গিত ধ্বনিত হয়, 'প্রতায়ী অঙ্কুর' জেগে ওঠে সেখানেই :

এমনকী অন্তিমেও
জন্ম তার অনায়াসে ধন্য হতে পারে
দিব্য করুণার মত স্নেহে অলৌকিক।

'এখন রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটির দুটি অংশ - 'তার জলরং' এবং 'তাঁর গান'। প্রথম অংশে প্রকৃতির অনুসঙ্গ কীভাবে তাঁর 'ম্যাজিক জলরং' এ প্রকাশ পেয়েছে সেই চিত্রকল্প কবি নির্মাণ করেছেন। আর দ্বিতীয় অংশে রবীন্দ্রনাথের গান মানবমনের কোন গভীরে স্পর্শ করে সেই অনুভুতিই ব্যক্ত হয়েছে :

তোমার সর্বস্ব কাড়তে এসে ফিরে গেছে
সুর। তাই রেখে গেছে উন-কাঁটা শরীরের তাপে।

'স্মরণ জীবনানন্দ দাশ' কবিতায় জীবনানন্দকেই ঈশ্বর ভেবেছেন বলে জানিয়েছেন কবি। তবুও তাঁর জটিল জগতের 'জাতিদ্বেষ' নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কবি।

'চতুর্বর্ণা নারীদের কী এত দরকার ছিল প্রতিবাদে।'

আবার সংকটকালে তিনিই কবির ত্রাতা। 'বিপুল চিৎকারকালে' হয়ে ওঠেন কবির কঠিন ঈশ্বর। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখা কবিতাটি অনেক আগে রচিত হলেও সন্দীপনের মৃত্যুর পর তা প্রকাশ পায়। শিল্পীর বিনয়ের সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর পোশাকের মালিন্য, যা

'নীরবে আবৃত করে 'পরিচ্ছন্নতাকে'। সেই ধুলোবালি প্রহরীর পরোয়া করে না। এভাবেই কবিতা লিখেছেন তারাপদ রায়, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখকে নিয়েও। বিতর্কিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসকে নিয়ে রচিত 'তার মৃত্যু' কবিতায় লেখেন -

ব্রাত্য তাঁকে করেছে যে গান
সেই থাক। ধুপ চন্দনের বহুলতা
তারবৃত্তে নামাঙ্কিত ফুল
মিথ্যাভাষণের মালা
মানায় না তাকে।

দেশভাগ জনিত বেদনা, স্মৃতিমেদুরতা বার বার ফিরে এসেছে বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়। কবি কোনো রাজনৈতিক সীমারেখায় বন্দী নন। পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ ভিন্ন দেশে পরিণত হলেও তার গাছপালা-প্রকৃতি তাঁর কবিতায় জায়গা করে নিয়েছে। 'দুঃখী কালো মেয়ে' কবিতাটি লেখা পূর্ববঙ্গের কোনো কালীমন্দিরের অনুষঙ্গে। কবি ধর্মের ভাষ্য রচনা করেননি এ কবিতায়। নারীত্বের চিরন্তন যন্ত্রণার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন দেশমাতৃকার বিভাজন যন্ত্রণাকে—

তোমাকে জড়িয়ে ধরে ভাগ করে নেব কন্ঠহিম
চোখে জল মুছে বলব, ছি!
আসলে তুমিও এক পরিত্যক্ত দুঃখী কালো মেয়ে,
এপারের দিকে চেয়ে আছ।

আটত্রিশ বছর পর জন্মভূমিতে পৌঁছে সব অচেনা লেগেছে কবির। 'একুশে ফেব্রুয়ারি তিরানব্বুই' কবিতায় সেই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে—

রাস্তা হারিয়ে দেয় শহর, এলিফ্যান্ট রোডের সরু গলি।
দুপাশে আছে এসব কী — সোনার গাঁ প্যালেস,
পলাশবাড়ি, মহানগর প্রভাতী।

শুধু তাই নয়, দেশভাগ জনিত তাৎক্ষণিক অভিঘাতও ধরা আছে তাঁর একেবারে প্রথম কবিতায়:

একদিন রাতে
পদ্মানদী চুরি হয়ে গেল।
তার সঙ্গে
গোয়ালন্দ ঢাকা মেল
তারপাশা খাল নৌকো
বিকেল বিকেল বাড়ি—
সব চুরি হয়ে গেল। (হিমঘরের মাছ)

প্রকৃতির অনুষঙ্গে নানা চিত্রকল্পের সুনিপুণ ব্যবহারে বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা হয়ে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

উঠেছে হৃদয়গ্রাহী। 'নামাবলী উড়ে যাচ্ছে ঝড়ে' কবিতায় বাঘের ডোরাকাটা দেহের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন নামাবলীকে। 'ফিলম' কবিতাতে নাগরিক নিম্নবিত্ত সমাজের চিত্রকল্প অঙ্কিত। 'ঐতিহ্যের আলকা পলকা' কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির যে ছবি এঁকেছেন, খুব সাধারণ হয়েও কবিতায় তা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে—

মন্দিরের পেছনে ছাইগাদা, ফাটলে অশ্বথ শিশু
রঙিন ছাতার মতো নয়নতারা আর
শাদা ভেলভেট দোলনচাঁপা
এখন অভিবাদন করে সূর্যাস্তকে

বাংলা ভাষার প্রতি গভীর অনুভব প্রকাশ পেয়েছে 'বাংলা ভাষা' কবিতায়। সেই ভাষার অবক্ষয় নিয়ে বেদনাতুর হয়েছেন কবি—

কিন্তু হঠাৎ বর্ণমালা
ডিটিপি ছাড়িয়ে কেন যে দাঁড়াও
আঙুল শরীরে ভুল ইংরিজি, সস্তা হিন্দি দাগড়া দাগড়া।

এই কবিতার অনেক আগে লেখা 'ফিলম' কবিতাতেও সংবাদপত্রের শব্দ ব্যবহার নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন—

"আজকেই কাগজে লিখেছে 'সখ্যতা' ও 'প্রসারতা' শব্দ দুটো
আমি আর কেয়ার করি না।"

প্রকৃত কবির দায়িত্ব নিয়েই সারাজীবন কাব্যসাধনা করে চলেছেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়। প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে তাঁর কাব্যচর্চা যেমন সমৃদ্ধ করেছে বাংলা কবিতাকে, তেমনই কবিতার বিচিত্র গতিপথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাঁর কবিতার পরতে পরতে আছে 'সহজ লাবণ্যময়-প্রসাধিত' এক অনন্য রূপ। আজও তাই সেই প্রিয় কবির কাছে তাঁর পাঠককুল আশা রাখেন 'আরেক মুঠো অথৈ আকাশ' এর।

আকর গ্রন্থ ঃ

গ্রন্থপঞ্জি

(১) বিজয়া মুখোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০

সহায়ক গন্থ ঃ

১) সন্দীপ দত্ত, বাংলা কবিতার কালপঞ্জি (১৯২৭-১৯৮৯), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৩।

২) সুতপা ভট্টাচার্য্য, মেয়েলি পাঠ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০০।

৩) সুতপা ভট্টাচার্য্য, মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা :

১) অনন্দা, নারীর কলমে কবিতা সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ,প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪২০

২) বনানী, ছয় কবি সংখ্যা, ২০১৪

শেলির যাপন ও কাব্যে স্ববিরোধ : মৃত্যুর দুশো বছরে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

জয়দীপ চক্রবর্তী

শেলি তখন থাকছেন স্পেৎসিয়া নগরের কাছে যে সমুদ্র উপকূল, তার কাছাকাছি যে বাড়ি ছিল তাঁর, সেইখানে। সমুদ্র এবং সমুদ্র-উপকূল তাঁর ভারি প্রিয়, বরাবরই। কবিতার বহু পংক্তিতে তিনি শুনিয়েছেন সে কথা। জল তিনি ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন ঝড়কেও। নিজের জীবনেও তো অসংখ্যবার ঝড় এসেছে। সে ঝড় সামলেছেনও তিনি নিজের মতো করেই। সমাজ তাঁকে দেখে শিউরে উঠেছে, চোখ নাক কুঁচকে ছি ছি করেছে বারংবার; কিন্তু তিনি বিচলিত হননি একবারের জন্যেও। পরিণাম না জেনেই, ভবিষ্যতের সমস্যার কথা না ভেবেই জীবনে বারংবার ঝুঁকি নিয়েছেন তিনি। সেই ছোট্টবেলা থেকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে চলেছেন, হোঁচট খেয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন মনে মনে। তবু পিছনে ফিরে তাকাননি। অনুতপ্ত হয়ে পিছু হাঁটেননি একবারও। মনে মনে তিনি যে চিরবিপ্লবি। যা কিছু প্রাতিষ্ঠানিক, যা কিছু সাধারণগ্রাহ্য তার বিপ্রতীপে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন তিনি বুক চিতিয়ে। কাজেই ঝড় তাঁর প্রিয় হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিপদের ঝুঁকি নিতে ভালোবাসবেন তিনি, এতেও বিস্মিত হওয়ার কথা নয়। সুকুমারদর্শন, দীর্ঘ শরীর ছিল তাঁর। কৃশ ও ঈষৎ কোলকুঁজো সে শরীরের সহ্যক্ষমতা ও দৃঢ়তাও ছিল উল্লেখ করবার মতোই। এই সামর্থ্য ও সাহস ছিল বলেই তিনি তুষারপাতের মধ্যেই একলা চলে গিয়েছিলেন আল্পসে, বিপজ্জনক পাহাড়ের চূড়ায়। শেলির অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু টমাস জেফারসন হগ্ লিখেছিলেন, ‘শেলির প্রধান আনন্দ হল, লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘন্টায় পাঁচ মাইল বেগে হাঁটা। এবং যতক্ষণ সূর্যের আলো থাকে, ওই ভাবে হেঁটেই চলা।’ কিন্তু শেলির এই ধরণের অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তার মধ্যে কি শুধু সাহসই দেখব আমরা? এই সাহসের আড়ালে কি খানিক খামখেয়ালিপনা এবং হঠকারিতাও ছিল না? নাকি মনে মনে নিজের জীবন সম্পর্কে এক চরম ঔদাসীন্য পুষে রেখেছিলেন তিনি? যে ঔদাসীন্য আত্মহননের ইচ্ছাও জাগিয়ে তুলেছিল তাঁর মনে? জীবন সম্পর্কে উদাসীন না হলে, মাত্র উনত্রিশ বছরের জীবদ্দশায় যে সংক্ষিপ্ত কবিজীবন পেয়েছিলেন তিনি, তাতে বার বার কেন মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন তিনি? তাঁর বন্ধু ও অনুজ কবি কিটস্ অসুস্থ ছিলেন। তিনি জানতেন, জীবন ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। ‘ওড টু দা নাইটিঙ্গল’ কবিতায় তিনি স্পষ্ট করছেন এই জড় জগতের ভয়ংকর বাস্তবতা,

‘Here– where men sit and here each other groan—
Where palsy shakes a few– sad– last grey hairs–
Where youth grows pale– spectre-thin– and dies—
Where bat to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs—
Where beauty can not keep her lustrous eyes–
Or new love pine at them beyond tomorrow’.

কাজেই কিটস-এর কবিতায় মৃত্যুর প্রসঙ্গ থাকতে পারে, স্বাস্থ্যহানির কথাও থাকতে পারে, কিন্তু শেলি কেন বার বার মৃত্যুর কথা বলবেন! তিনি তো জগতকে এমন নিরাশার মধ্যে দেখতে চান না। তিনি যে আশাবাদের কবি হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন বহু সমালোচকের মূল্যায়নে। ‘ওড টু দা ওয়েস্ট উইন্ড’ কবিতায় তিনি তো সেই আশাবাদকে আরও উজ্জ্বলতর করছেন, যখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করছেন, ‘If winter comes– can Spring be far behind’; তবে শেলির কবিতায় আসা মৃত্যুর অনুষঙ্গ কি কেবলই প্রিয়জনদের মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার বেদনাসঞ্জাত? এই যে বহুচর্চিত পংক্তিটি, যে পংক্তি শেষ হল একটি প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে, সে কি সত্যিই ‘rhetorical question’? তিনি সত্যিই কি শীত শেষে বসন্ত যে আসবেই এই আশ্বাস দিতেই চাইছেন, অথবা তিনি নিজেই সংশয়দীর্ণ? উত্তর খুঁজছেন, আদৌ শীত শেষে তাঁর জীবনে বসন্ত আসবে তো? বসন্ত শীতের পরে আসে, প্রকৃতির এই স্বাভাবিক ধর্মের মধ্যে কি তিনি সান্ত্বনা খুঁজছেন? এ কবিতায় এতবার, এত ভাবে ঝোড়ো বাতাসে নিজেকে মিশিয়ে দেবার, বিলিয়ে দেবার কথা বলছেন তিনি, আমাদের মনে সন্দ জাগা কিন্তু অমূলক নয় একটুও।

‘Oh– lift me as a wave– a leaf– a cloudœ
I fall upon the thorns of lifeœ I bleedœ
A heavy weight of hours has chained and bowed
One too like thee— tameless– and swift– and proud’.

কিটস তাঁর ‘ওড টু অটাম’ কবিতায় পরিপূর্ণতার আড়ালে ঝরে পড়া বা এগিয়ে আসা মৃত্যুর বিষণ্ন বিবরণ দিয়েছিলেন। শেলিও যতই এ কবিতায় পশ্চিমি ঝঞ্ঝাকে ধ্বংস ও সংরক্ষণ উভয়ের কারণ বলুন না কেন, মনে রাখতে হবে শুরুতেই তাকে বর্ণনা যথেষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অস্বস্তিকর একটি চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে,

‘O Wild West Wind– thou breath of Autumn’s being–
Thou– from whose unseen presence the leaves dead
Are driven– like ghosts from an enchanter fleeing–
Yellow– and black– and pale– and hectic red–
Pestilence-stricken multitudes’

তাঁর কবিতার আশাবাদও কি তাহলে মুখোশ? তিনি নিজে ব্যক্তিজীবনে বার বার ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছেন। যা আদর্শগতভাবে বিশ্বাস করেন না, তাই করেছেন পরিস্থিতির চাপে অথবা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে। এই সবকিছুরই অভিঘাত ছায়া ফেলেছে তাঁর মনে। পারিবারিক সম্পদের অংশীদারিত্ব হারিয়েছেন। সামাজিকভাবে অনেকাংশেই পরিত্যক্ত হয়েছেন তিনি। এই সবকিছুর নিরাময়ক হিসেবে তিনি নিজেও কি তাহলে সঙ্গোপনে মৃত্যুর কাছে আশ্রয় চাইতেন? মনে রাখতে হবে, শেলি সাঁতার জানতেন না। অথচ বার বার, এমনকি ঝড়ের মধ্যেও, সমুদ্রে নৌকোবিহার করতে ভালোবাসতেন তিনি। কেন?

আঠেরশো বাইশ সালের আট জুলাই। অর্থাৎ যে কালখন্ডে বাস করছি আমরা এখন, তার থেকে ঠিক দু'শো বছর আগের এক দিন। ইতালির উত্তর-পশ্চিম সমুদ্র-উপকূলের লিভর্নো শহরে আগত বন্ধু লী হান্টকে স্বাগত জানিয়ে নিজের প্রিয় ইয়ট ‘ডন জুয়ান’-এ চেপে বাড়ি

ফিরছেন শেলি। সঙ্গী বন্ধু এডওয়ার্ড উইলিয়মস এবং এক নাবিক। যাত্রাপথ দীর্ঘ। তাতে অবিশ্যি অসুবিধা কিছু ছিল না। যথারীতি এই নৌকোযাত্রা উপভোগ করছিলেন শেলি। বরাবর যেমন করেন। কিন্তু ঘন্টা দুই পরেই তুমুল ঘূর্ণিঝড়ে পড়ল তাঁর ইয়ট। ঝড় ও আগ্রাসী ঢেউয়ের ধাক্কায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল শেলির শখের 'ডন জুয়ান'। নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে সে নৌকোর যাত্রীরাও তলিয়ে গেল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলে।

আট দিন পরে দেহ ভেসে এসেছিল সমুদ্রের তীরে। সে দেহ সনাক্ত করা সহজ ছিল ছিল না। শেলির জামা এবং সেই জামার পকেটে গলিত কাগজপত্র দেখে তাঁকে সনাক্ত করা হয়। প্লেগ সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সমুদ্রে ভেসে আসা যে কোনো দেহই তখন দাহ করবার আদেশ বলবৎ ছিল ইতালিতে। শেলিকেও তাই দাহই করা হয়। কয়েক মাস পরে তাঁর দগ্ধাবশেষ সমাহিত করা হয় তাঁর প্রিয় বন্ধু কবি কিটসের সমাধির পাশে। তাঁর মৃত্যু নিয়ে সে সময়ে ইংরেজি সাহিত্য মহলে তেমন একটা শোকের ছায়া নামতে দেখা যায়নি। দেখতে পাওয়ার কথাও অবিশ্যি ছিল না। কিটসের মতোই, সমকালে শেলিও কবি হিসেবে প্রাপ্য মর্যাদা তো পানইনি, বরং উপেক্ষা এবং ঘৃণাই কুড়িয়েছেন এক শ্রেণীর সমালোচকের কাছ থেকে। তাঁর মৃত্যুর পর, আঠেরশো বাইশ সালের পাঁচ অগাস্ট 'লন্ডন কুরিয়ার'-এর ঘোষণাটি বরং এই প্রসঙ্গে শুনে নেওয়া নেওয়া যাক। সেখানে বলা হচ্ছে, 'Shelley– the writer of some infidel poetry– has been drowned— now he knows whether there is a God or no'.

অর্থাৎ মৃত্যুর দু'শ বছর পরেও যে কবি উজ্জ্বল, ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের সবচেয়ে গৌরবময় রোম্যান্টিক যুগের একজন প্রতিনিধিস্থানীয়, সেই কবিই সমকালীন সাহিত্য সমালোচকদের কাছে নিতান্তই 'the writer of some infidel poetry'.

প্রকৃতপক্ষে সমকাল একজন প্রকৃত কবিকে কিছুতেই মূল্যায়ন করতে পারে না। কারণ একজন সত্যিকারের কবি সবসময়েই তাঁর নিজের সময়ের থেকে অনেকখানিই এগিয়ে থাকেন। এ কথা যেমন কিটসের ক্ষেত্রে সত্য, শেলির ক্ষেত্রে সত্য, তেমন সত্য আমাদের মধুসূদন, জীবনানন্দ এমনকি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। জনপ্রিয়তা কখনই একজন কবির চিরস্থায়ী হওয়ার মানদন্ড হতে পারে না। নিজের সময়ের অনেক জনপ্রিয় কবি ও সাহিত্যিকই তাই মৃত্যুর পরে হারিয়ে গেছেন। পাঠক তাঁদের মনে রাখেননি। তাঁদের সময়কে অতিক্রম করতে না পারার একটি কারণ নিশ্চিতভাবেই আগামীর পাঠকের কাছে প্রাসঙ্গিকতা হারানো।

শেলির কবিতার ক্ষেত্রে কিন্তু এই কারণটি খাটে না। তাঁর কবিতার একটি বড় অংশ, এমনকি আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতেও প্রাসঙ্গিকই শুধু নয়, বাস্তবও। এমনকি তাঁর জীবনদর্শন এবং যাপনের যে চিত্র আমরা দ্বিশতাধিক বর্ষ আগে প্রত্যক্ষ করেছি, তা সেই সময়ে নিন্দার যোগ্য মনে হলেও আজকের সময়ে স্বাভাবিকতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এই কথার সত্যতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে তাঁর প্রাথমিক জীবনের দিকে একবার ফিরে তাকানো যাক। শেলির

জীবনের এই সময়কালটি শুধুমাত্র তাঁর যাপনের আধুনিকতার জন্যেই নয়, তাঁর প্রতিভাকে চাপা দিয়ে রাখার যে দীর্ঘ চক্রান্ত, তার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। এমনকি শেলির জীবনচর্চায় তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিগত যাপনের যে বৈপরিত্ব, তাও এই সময়টি থেকেই শুরু বলে মনে করে নিতে পারি আমরা। ইচ্ছা এবং বাস্তবের মধ্যে তৈরি হওয়া বৈপরিত্বের টানাপড়েনে বার বার ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন শেলি। মনে মনে অস্থিরও হয়েছেন। এই বিপন্নতাবোধ সারা জীবন তাড়া করে বেড়িয়েছে তাঁকে। মনে মনে থিতু হতে দেয়নি কখনও। তাঁর কবিতার মধ্যেও বার বার এই স্ববিরোধ, এই টানাপড়েনের ছায়া এসে পড়েছে। সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে সেই বিপন্নতাজনিত ছটফটানি এবং চিন্তা ও যাপনের বৈপরিত্ব আমরা খোঁজার চেষ্টা করব তাঁর জীবন এবং কবিতা, দুই ক্ষেত্রেই।

বিত্তবান পরিবারে জন্মানোর জন্যে ছোট্টবেলা বেশ আরামে এবং নিরুপদ্রবেই কেটেছিল তাঁর। পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে তাঁর বিখ্যাত ইটন স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকে। ইটনের পাঠ্য বই তিনি পড়েছিলেন নিশ্চিত, কিন্তু পাশাপাশি তিনি এই সময়েই পড়তে শুরু করেছিলেন বেশ কিছু নিষিদ্ধ বই। উইলিয়ম গডউইনের 'Political Justice' এই বইগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেকালের কম বয়েসিদের মধ্যে অনেকের মনেই ঝড় তুলেছিল বইটি। শেলিও ব্যতিক্রম ছিলেন না। মুখ্যত এই বই পড়ার পর থেকে ক্রমশ তীব্র সংস্কারবাদী এবং প্রতিষ্ঠানবিরোধী হয়ে উঠতে শুরু করেন তিনি। পরিস্থিতি এতই ঘোরালো হয়ে ওঠে যে ইটন স্কুলে পড়াকালীনই তিনি 'পাগলা শেলি', এবং নাস্তিক শেলি' নামে পরিচিত হয়ে উঠতে থাকেন। এ সময় তিনি 'গোথিক' গল্প লিখতেও শুরু করেন। তাঁর জীবনের এই পর্যায়টি পরিপূর্ণতা পায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর। সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় বন্ধু টমাস হগের সঙ্গে। দুই বন্ধু কিছু কালের মধ্যেই প্রকাশ করেন 'The Necessity of Atheism' শীর্ষক পুস্তিকাটি। বইটি প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলেন না তাঁরা। সে সময়ে সমাজের মাথা যাঁরা, বইটি তাঁদের হাতে গিয়ে যাতে পৌঁছয়, সে ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেন।

আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করার বিপদ এতটাই কম, সেদিনের দুই কিশোরের ওই ভয়াবহ দুঃসাহস দেখানোর অভিঘাত অনুধাবন করা কঠিন শুধু নয়, প্রায় অসম্ভবই। এ ঘটনার ফলশ্রুতি উল্লেখ করলে বোধহয় সেই ফরাসি বিপ্লব উত্তর নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি খানিক অনুমান করতে পারব আমরা।

'নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা' প্রকাশের পর পারিবারিক এবং সামাজিক উভয় দিক থেকেই শেলির ওপরে প্রবল চাপ আসতে শুরু করে। এই লেখা প্রত্যাহার করে ক্ষমা টমা চেয়ে নিয়ে পরিস্থিতি মিটিয়ে নিতে না পারলে একদিকে পিতৃপুরুষের বিশাল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়, আর অন্যদিকে অক্সফোর্ড বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হওয়ার সম্ভাবনা। শেলি অবিশ্যি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় এই দুই সম্ভাবনাকেই হেলায় উপেক্ষা করেছেন। অনড় থেকেছেন তাঁর পুস্তিকায় প্রচারিত মতবাদে। যা কিছু প্রাতিষ্ঠানিক, তা সে ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মীয় অনুশাসন হোক কিংবা যাপন সংক্রান্ত সামাজিক বিধিসমূহ, সবের বিরুদ্ধেই প্রায় সোচ্চার তিনি। কাজেই

তাঁর এই অনড় অবস্থান প্রত্যাশিতই ছিল। ফলস্বরূপ মাত্র পাঁচ ছ' মাসের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ইতি। অক্সফোর্ড থেকে বিতাড়িত হলেন তিনি। আজ এই সময়ে যদিও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শেলির মূর্তি স্বমহিমায় বিরাজমান, কিন্তু সেই কালে ওই শিক্ষাঙ্গন থেকে তাঁর বিতাড়ন নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেননি। কেউ আপত্তি করেছিলেন, এমন কথাও শোনা যায়নি। শেলি এই ঘটনায় আদৌ বিচলিত হননি, বরং সতেরো বছরের হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুককে নিয়ে পলায়ন করেন। সে সময় তাঁর বয়েস মাত্রই উনিশ।

হ্যারিওট শেলির এক বোনের স্কুলের বন্ধু ছিলেন। এই হ্যারিয়েটকেই তাঁর 'কুইন ম্যাব' উৎসর্গ করেছিলেন শেলি। শেলির প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ কিশোরীর পরিবার সঙ্গত কারণেই ভালো চোখে নেয়নি। নির্যাতিত হ্যারিয়েটের শেলির প্রতি আর্ত আহবান, 'আমাকে উদ্ধার করো', এড়াতে না পেরে তাকে নিয়ে গৃহত্যাগ করে স্কটল্যান্ডে পাড়ি দিলেন শেলি। সঙ্গী হলেন হ্যারিওটের এক দিদি এলিজা।

এই পর্যায়ে যেটা বিস্ময়ের তা হল শেলির হ্যারিয়েটকে অমন তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করে ফেলা। কারণ বিবাহ নামক সামাজিক প্রথাটির তীব্র বিরোধী ছিলেন তিনি। শেলির ব্যক্তিজীবনে স্ববিরোধ এবং আত্ম-অসন্তুষ্টিরও সূত্রপাত এই ঘটনাটি থেকেই। আর্থিক অনটন ছিল। প্রায় যাযাবরের মতো হ্যারিয়েটকে সঙ্গে নিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। তবু কেন তাকে অমন তড়িঘড়ি বিয়ে করলেন? শুধুই কি হ্যারিওটের সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য? যে শেলি নিজের বিশ্বাস এবং আদর্শগত অবস্থান থেকে এক চুলও না সরে গিয়ে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হতেও পিছু পা হন না, এই মর্যাদা রক্ষার অজুহাতটি সেক্ষেত্রে খুব একটা শক্তপোক্ত মনে হয় না। আসলে মনে মনে কোথাও একটা অস্থিরতা, একটা বিপন্নতা ও দুর্বল সিদ্ধান্তহীনতাও শেলিকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছিল জীবনভোর। দৃঢ় আদর্শ ও ঋজুতার খোলসে যে বিপন্নতাকে তিনি ঢাকতে চেয়েছেন প্রাণপণ, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন বারংবার।

হ্যারিয়েট নিজেও বাবা মা-র সব পরামর্শ উপেক্ষা করে বেরিয়ে এলেন শেলির বৈপ্লবিক মতবাদের প্রেমে পড়েই। মনে রাখতে হবে, শেলির মতাদর্শে বিশ্বাসী হ্যারিয়েট নিজেও বিয়েতে তেমন একটা বিশ্বাসী ছিলেন না। এই বিয়ে নিয়ে সেই অপরিণত দম্পতির বক্তব্য ছিল, ' in deference to anarch custom.' এই 'unbalanced couple'- এর মোহভঙ্গ হতে অবিশ্যি খুব বেশি দেরি হয়নি।

বিয়ের পর থেকেই অপরিণত এই যুগলের অর্থসংকট ছিল। দুই পরিবার থেকে পাঠানো অর্থসাহায্য যথেষ্ট ছিল না। তার ওপরে সেই অর্থটুকু নিয়েই শেলি দান খয়রাত চালিয়ে গেছেন আয়ার্ল্যান্ডে বিদ্রোহ প্রচার করতে অথবা ওয়েল্‌সের জনকল্যাণের কাজে। হ্যারিয়েটকে তাঁর এই কর্মযজ্ঞে সামিল করতে চেয়েও তেমনভাবে সফল হননি শেলি। হ্যারিয়েটের সঙ্গে মনের দূরত্ব ক্রমশই বেড়েই চলেছে শেলির। অথচ 'কুইন ম্যাব'-এর উৎসর্গপত্রে এই শেলিই একসময় লিখেছিলেন,

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

'Harrietœ On thine-thou wert my purer mind—
Thou wert the inspiration of my song—
Thine are these early wilding flowers–
Though garlanded by me'.

Then press into thy breast this pledge of love–
And know– though time may change and
    Years may roll–
Each flow-ret gathered in my heart
It consecrates to thine'.

১৮১৩ সালে হ্যারিওটের গর্ভে কন্যা সন্তানের জন্ম হয় শেলির ঔরসে। কিন্তু ততদিনে ছেলেবেলার 'আইকন' উইলিয়াম গডউইনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। গডউইন পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে। গডউইনের কন্যা মেরি গডউইনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্রমশ নিবিড় থেকে নিবিড়তর প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। নিজের লেখায় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের হয়ে তুমুল গলা ফাটালেও নিজের মেয়ের সঙ্গে শেলির এই অবাধ মেলামেশা এবং যৌন সংসর্গ গডউইন মেনে নিতে পারেননি। শেলির মোহভঙ্গ হতেও দেরি হয়নি ছোটবেলার আদর্শপুরুষটি সম্পর্কে। ১৮১৪ সালে শেলি এবং মেরি নিজের নিজের পরিবার পরিত্যাগ করে ইউরোপে চলে গেলেন এবং নিশ্চিন্তে সহবাস শুরু করলেন। এক্ষেত্রে অন্তত শেলি বিয়ের ক্ষেত্রে তাড়া দেখাননি। দীর্ঘদিন লিভ ইন সম্পর্কেই থেকেছেন মেরির সঙ্গে। ইতোমধ্যে হ্যারিয়েটের গর্ভে শেলির আরেকটি পুত্রসন্তান জন্ম নিয়েছে।

মেরির সঙ্গে শেলির এই সংসর্গ স্বাভাবিকভাবেই হ্যারিয়েটকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ক্রমশই তাঁর নিজের জীবনও উচ্ছৃঙ্খল হতে শুরু করে। ১৮১৫ সালে ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে মাসিক আটশ পাউন্ড বৃত্তি পেতে শুরু করেন শেলি। আর্থিক নিরাপত্তা আসে খানিক। হ্যারিয়েটকেও মাসিক একশ পাউন্ড বৃত্তি পাঠাতে শুরু করেন শেলি। কিন্তু জীবন সম্পর্কে হ্যারিয়েট ততদিনে বিতৃষ্ণ। কুসংসর্গে পড়েছেন। নেশাগ্রস্ত হয়েছেন। অবশেষে ১৮১৬ সালে টেমস নদীতে ডুবে মৃত্যু হয় তাঁর। যে মৃত্যু আত্মহননই, সন্দেহ নেই। একসঙ্গে থাকেননি ঠিকই, কিন্তু হ্যারিয়েটের গর্ভে জন্মানো কন্যা ও পুত্রের প্রতি শেলির স্নেহের ঘাটতি ছিল না। হ্যারিয়েটের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর এই পুত্র-কন্যার অভিভাবকত্ব দাবি করে আদালতে যান। এজন্য মেরিকে সামাজিকভাবে বিয়ে করেন তিনি। হ্যাঁ, আবারও বিয়েই করেন তিনি, আনুষ্ঠানিকতা মেনে নিয়েই। কিন্তু হ্যারিয়েটের গর্ভজাত পুত্র কন্যার অভিভাবকত্ব তিনি পাননি। ততদিনে মেরির গর্ভে পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে তাঁর।

শেলির জীবনের এই হ্যারিয়েট পর্বটির জন্যে সবচেয়ে নিন্দিত হয়েছেন তিনি। হ্যারিয়েটের মৃত্যুর জন্যে তাঁর অনিয়ন্ত্রিত যৌনজীবন, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, হ্যারিয়েটের প্রতি চরম ঔদাসীন্য এবং উপেক্ষাকেই দায়ী করেন অধিকাংশ সমালোচক। কিন্তু শেলির কিছু চিঠিপত্র থেকে অনুমান করা যায়, হ্যারিয়েটের সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্বের মূল অনুঘটক ছিলেন

হ্যারিয়েটের দিদি এলিজা। এই মহিলার প্রতি শেলির তুমুল বিতৃষ্ণা ও ঘৃণাই তাঁকে হ্যারিয়েটের থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করেছিল। মুখ্যত এই মহিলাকে সহ্য না করতে পারার জন্য এবং তাঁর সংসর্গ এড়িয়ে চলার প্রয়োজনবোধেই মেরিকে সঙ্গে নিয়ে ইতালিতে থিতু হয়েছিলেন তিনি। কারণ জানা যায় না, কিন্তু এলিজার প্রতি এতটাই বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন শেলি যে তাঁর মেয়েকে এলিজা কোলে নিলেও আতঙ্কে শিউরে উঠতেন তিনি। এই আতঙ্ক, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এই তুমুল বিদ্বেষও শেলির আশৈশব আদর্শবোধের সঙ্গে বেমানান সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে শেলির 'এপিসাকিডিয়ন' কাব্যের কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করা যাক যেখানে তিনি দ্বিধাহীনভাবে জানাচ্ছেন,

'Who travel to their home among the dead
By the broad highway of the world– and so
With one chained friend– perhaps a jealous foe–
The dreariest and the longest journey go'
True love in this differs from gold and clay–
That to divide is not to take away'.

বহুগামিতা নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ছুৎমার্গ ছিল না। কিন্তু বহু নারীর প্রেমে পড়েও কোথাও যেন তিনি অতৃপ্ত। অতৃপ্তি প্রেমেও। কী চাইছেন নিজেই যেন বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি জীবনভোর। যে হ্যারিয়েটকে আঁকড়ে বাঁচবেন ঠিকি করলেন, সে দাম্পত্য নিস্ফল বিচ্ছেদে পর্যবসিত। মেরিকে নিয়ে লিভ টুগেদার এবং পরে বিবাহ ভালোবাসার তাগিদেই। মেরি আমৃত্যু তাঁর সঙ্গীও বটে। তবু তিনি কি পরিতৃপ্ত? যদি মেরির প্রেম তাঁকে শান্তি দিতই তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর বন্ধু এডওয়ার্ড উইলিয়ামস-এর পত্নী জেন উইলিয়ামসের উদ্দেশে এমন ভুরি ভুরি প্রেমের কবিতা কেন লিখছেন শেলি? জেনের সঙ্গে তাঁর যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা সেখানেও তিনি যেন খানিক দ্বিধাগ্রস্ত। মৃত্যুর এক বছর আগে, ১৮২১ সালে 'One Word is Too Often Profaned' কবিতায় তিনি দেহাতীত প্রেমের কথা বললেও (not love– but worship of the heart) তার পরের বছরেই, অর্থাৎ শেলির মৃত্যুর বছরে জেনেরই উদ্দেশে লেখা তাঁর প্রেমের কবিতা 'I Arise From the Dreams of Thee' তে তিনি লিখছেন,

'Oh lift me from the grassœ
I die– I faint–I failœ
Let thy love in kisses rain
On my lips and eyelids pale
My cheek is cold and white alasœ
My heart beats loud and fast—
Ohœ press it close to thine again
Where it will break at last'.

সমগ্র জীবনব্যাপী এই অদ্ভুত দোলাচলে বার বার দ্বিধাজড়িত হয়েছেন তিনি। অন্তরে রক্তাক্ত হয়েছেন। পারিবারিক দুঃখ এই বেদনাভারকে আরো বাড়িয়েছে বারংবার। জীবনের

একেবারে শেষপ্রান্তে এসেও আঘাত এসেছে পারিবারিক ক্ষেত্রে। মেরির গর্ভপাত প্রকৃতই বেদনার্ত করেছে তাঁকে। তার সঙ্গে ছিল হ্যারিয়েটের সন্তানদের অভিভাবকত্ব না পাওয়ার যন্ত্রণা। ক্রমশ নিজের প্রথম জীবনের তীব্র বৈপ্লবিক সত্ত্বা, সমাজের প্রচলিত সবকিছুকে নস্যাৎ করার প্রবণতা থেকে সরে এসে গীতিকবিতায় মন দিচ্ছেন তিনি। জীবন ও অভিজ্ঞতা তাঁকে তখন বিপ্লবের দিনগুলোর ত্রুটি দেখিয়ে দিচ্ছে চোখে আঙুল দিয়ে। শেলি লিখছেন,

'O world– O life– O time'
On whose last steps I climb–
Trembling at that where I stood before—
When will return the glory of your prime'
No more----oh– never more'

Out of the day and night
A joy has taken flight—
Fresh spring– and summer– and winter hoar–
Move my faint heart with grief– but with delight
No more --- oh– never more!'

জীবদ্দশায় কবিখ্যাতি পাননি শেলি। সে অভিমান বুকে নিয়েই পথ চলেছেন শেলি, সঙ্গোপনে। মৃত্যুর কাছেই শেষ আশ্রয় খুঁজেছেন বার বার। নিজের উদ্দামতার সঙ্গে মিশিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন প্রকৃতির উদ্দামতাকে। কেননা দিনের শেষে দুজনেই যে স্রষ্টা। সেই প্রকৃতির মধ্যেই মিশেছেন তিনি ত্রিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই। যে সমালোকরা বলেন, 'Wordsworth found and Shelley lost himself in nature', তাঁদের কথাকেই সত্য প্রমাণ করেছেন তিনি জীবন দিয়ে।

পরবর্তীকালেও, তাঁর সমাজকে অস্বীকার করা উদ্দামযাপনকে আড়াল করা হয়েছে যত্ন করে। কেউ তাঁর জীবনকে শিশুর সারল্য দান করতে চেয়েছেন কেউ বা আবার শুধুই গীতিকবি হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন তাঁকে। আজ তাঁর মৃত্যুর দুশো বছর অতিক্রান্ত। তবুও তাঁর সঠিক মূল্যায়ণ হল কই! কবি বায়রণ শেলির জীবনের শেষ কয়েক বছর কাছ থেকে দেখেছেন তাঁকে। নিবিড়ভাবে মিশেছেন শেলির সঙ্গে। শেলিরই মতো উদ্দাম ও বিতর্কিত জীবনযাপন করেছিলেন তিনিও। এমনকি এ ক্ষেত্রে তিনি হয়ত শেলিকে ছাপিয়েই গিয়েছিলেন। শেলির শ্যালিকার সঙ্গে অতিঘনিষ্ঠ সম্পর্কেও জড়িয়েছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে সহবাসের ফলে গর্ভবতী হয়েছেন সেই নারী। শেলি সম্পর্কে এই বায়রনের মূল্যায়ন, ' The most gentle– the most amiable– and the least worldly-minded person I ever met'

আজ সমাজ বদলে গেছে। দুই শতাব্দী আগের পৃথিবীতে যা ছিল অশালীন উচ্ছৃঙ্খলতা, তা আজকের সমাজে স্বাভাবিক, গ্রহণযোগ্য। এই নতুন দিনের আলোয়, আমাদের বদলে যাওয়া পৃথিবীতে শেলির জীবন ও কাব্য আবারও একবার যদি নতুন করে মূল্যায়িত হয়, সে প্রয়াসটি মন্দ হবে না আশা করি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : স্রষ্টা-আলোচক যখন সম্পাদক

অনির্বাণ মান্না

১.

একজন সফল সম্পাদক হওয়া মুখের কথা নয়। পত্রিকা কিংবা গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা এবং তার প্রতিষ্ঠার পিছনে সম্পাদকের ভূমিকাই অন্যতম। যথার্থ সম্পাদক তাঁর পত্রিকার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ এবং দায়বদ্ধ হবেন। প্রথমেই প্রকাশিতব্য পত্রিকা কিংবা গ্রন্থের উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং অভিমুখ ঠিক করে নেন সম্পাদক। নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সময়োপযোগী বিষয় নির্বাচন করতে হয়। বিষয়-অনুসারী লেখক নির্বাচনও করা হয়। এখন অবশ্য আগে লেখক নির্বাচন হয়ে যায়। পরে বিষয়। এতে সমস্যা হল এই যে, যিনি যে বিষয়ে দক্ষ, সেই বিষয়ে তাঁকে দিয়ে লেখানো হয় না। ফলে অনেকসময় সেরা লেখাটা গ্রন্থে অনুপস্থিত থাকে।

শুধুমাত্র বিষয় নির্বাচনেই নয়, বিষয়-বিন্যাসেও সম্পাদককে সচেতন থাকতে হয়। সুবিন্যস্ত অনেকগুলি ফুলের সমারোহে যেমন একটি সুন্দর মালা গড়ে ওঠে তেমনই অনেকগুলি লেখা সুবিন্যস্তভাবে একটি মূলভাবনাকে প্রকাশ করে। একজন সুসম্পাদকের পরিমণ্ডলে একদল দক্ষ লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠেন। এছাড়াও বহুমুখী অভিনব ভাবনার আবহে সম্পাদক নতুন নতুন লেখকদেরও খুঁজে বের করেন।

সম্পাদককে নিরপেক্ষ হতে হয়। বিষয়ের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেদিকে সম্পাদক সচেতন থাকেন। এছাড়াও মুদ্রণ-প্রমাদ যাতে না হয় সেদিক থেকে শুরু করে প্রচ্ছদ, এমনকি শেষপাতা পর্যন্ত সম্পাদকের সার্বিক পর্যবেক্ষণ থাকে। একজন দক্ষ সম্পাদকের গ্রন্থ কিংবা পত্রিকাটি অসংখ্য গ্রন্থের মাঝে হারিয়ে না গিয়ে নিশ্চিতভাবে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

সম্পাদকের সাধারণভাবে ক্রিয়েটিভ না হলেও চলে। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুবিধা হল, তিনি একইসঙ্গে অ্যাকাডেমিক এবং ক্রিয়েটিভ। কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-সূত্রে অনেকের সঙ্গে তাঁর যেমন পরিচয় তেমনই সৃজনশীল সাহিত্যিকদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ বেশি। ফলে কাকে দিয়ে কোনবিষয় লিখিয়ে নিতে হবে কিংবা কার কোনগল্প, কবিতা ভালো তাঁর থেকে আর কেই বা ভালো জানেন ? তাই প্রাসঙ্গিক ভালো লেখা পেতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অসুবিধা ছিল না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খ্যাতিমান সাহিত্যিক, স্বনামধন্য অধ্যাপক, তিনিই আবার নিষ্ঠাবান সম্পাদক।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খুব বেশি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন তা কিন্তু নয়। মোট ছ'টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। কালানুক্রম অনুযায়ী গ্রন্থগুলি হল :

(ক) '১৩৫১-র সেরা গল্প' (১৯৪৫)

(খ) 'আমার প্রিয় গল্প' (ডিসেম্বর, ১৯৪৮)

(গ) 'সরস গল্প' (চৈত্র, ১৩৬৬)

(ঘ) 'অর্ধশতাব্দী' (২৫ বৈশাখ, ১৩৬৭)

(ঙ) 'পঞ্চসায়ক' (আশ্বিন, ১৩৭৩)

(চ) 'প্রেমের গল্প' (আষাঢ়, ১৩৭৮)

এই ছ'টি গ্রন্থের মধ্যে 'অর্ধশতাব্দী' বাদ দিলে বাকি পাঁচটিই হল গল্পগ্রন্থের সম্পাদনা। 'অর্ধশতাব্দী' হল কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের (মৌমাছি) পঞ্চাশবছর পূর্তিতে রচিত স্মারকগ্রন্থ। মূলত কবিতা, এছাড়াও প্রবন্ধের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষকে। যৌথ সম্পাদক হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব বসু। বাকি পাঁচটি গল্পগ্রন্থের প্রথম তিনটি অর্থাৎ '১৩৫১-র সেরা গল্প', 'আমার প্রিয় গল্প', এবং 'সরস গল্প'এগুলি এককভাবে সম্পাদনা করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। অন্যদিকে সহধর্মিনী আশাদেবীর সঙ্গে যৌথভাবে 'পঞ্চশায়ক' ও 'প্রেমের গল্প' গ্রন্থ দুটির সম্পাদনা করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকটি গ্রন্থের সম্পাদনাতেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর জাত চিনিয়ে দিয়েছেন।

২.

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হলেও ছোটগল্পকার হিসাবেই যেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। শুধ তাই নয়, ব্যক্তিগতভাবে ছোটগল্পের প্রতি তাঁর আকর্ষণও ছিল বেশি। তাঁর গবেষণার বিষয়ও এই ছোটগল্প। 'সাহিত্যে ছোটগল্প', 'বাংলা গল্প বিচিত্রা', কিংবা 'ছোটগল্পের সীমারেখা' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই সম্পাদনার ক্ষেত্রে ছ'টি গ্রন্থের মধ্যে পাঁচটিই ছোটগল্প হবে এটাই স্বাভাবিক।

গবেষণার সূত্রে বহু গল্প তাঁর পড়া। এছাড়াও ছোটগল্পকার হিসাবে অন্যান্য গল্পকারদের লেখা সম্পর্কেও খোঁজখবর রাখতে হয়। ফলে একজন শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারের দৃষ্টিতে নিজের এবং অন্যান্য গল্পকারের শ্রেষ্ঠ গল্প কোনটি পাঠকের তা জানার কৌতুহল হয়। পাঠকের কাছে গ্রন্থটির চাহিদা তৈরি হয়ে যায়।

'১৩৫১-র সেরা গল্প' গ্রন্থ দিয়েই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনার কাজ শুরু। একটু পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায়, সম্পাদক হিসাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কতটা সফল, ব্যতিক্রমী এবং একনিষ্ঠ। আপাতভাবে মনে হতে পারে, '১৩৫১-র সেরা গল্প' গ্রন্থটি শুধুমাত্র ১৪টি গল্পের সংকলন। এতে সম্পাদকের বাহাদুরি কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে সামগ্রিকভাবে খুঁটিয়ে বইটির পর্যালোচনা করতে হয়।

গল্প-সংকলনটির শুরুতেই 'প্রারম্ভে'এই নামে সম্পাদকের লেখা অসাধারণ একটি ভূমিকা আছে। ভূমিকাটি আলোচনা করলেই স্পষ্ট হবে সম্পাদকের পরিশ্রম, পরিকল্পনা এবং সাহিত্য ও সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ। ১৩৫১ বঙ্গাব্দ একটা ঐতিহাসিক সময়ের চিহ্ন বহন করে। সম্পাদক শুরুতেই জানিয়েছেন,

"বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প সংকলনের অভাব নেই এবং তাদের অনেকগুলিই যথোচিত যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে। তবু ১৩৫১ সালের সেরা গল্প নির্বাচন করবার একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন ও কর্তব্য আছে বলে মনে করি। বাংলার দরজায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পদধ্বনি আমরা শুনেছি। সর্বগ্রাসী মন্বন্তর এবং মৃত্যুর যে করাল রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি,

ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা সন্ধি-লগ্ন এসে দেখা দিয়েছে এখনো কারা-প্রাচীরের অন্তরালে প্রহর গুণে চলেছে 'নূতন প্রভাতে'র 'তামস তপস্যা'। ১৩৫১ সালের কথাশিল্পীদের রচনায় দেশের এই বেদনা ও বিপ্লব-বিধুর রূপ পংক্তিতে রেখায়িত হয়ে উঠেছে।"১

এক একটি বিশিষ্ট সময় আসে যা সাহিত্য-নির্মাণের অনুকূল হয়। ১৩৫১ সেরকমই গুরুত্বপূর্ণ। সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সৃষ্ট গল্পে কীভাবে আলোড়িত জীবন উপস্থাপিত হয়েছে তার একটা সুস্পষ্ট রূপ পাঠকের কাছে তুলে ধরা একান্ত কর্তব্য বলে মনে করেছেন সম্পাদক। অর্থাৎ এই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে সংকলনটির উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন সম্পাদক। এরপর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সুমধুর ভাষায়, যুক্তি-বিশ্লেষণে দেশ-বিদেশের ছোটগল্পের বিবর্তনের ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন। শুধুমাত্র বিষয়ে নয়, আঙ্গিকের দিক থেকেও ছোটগল্পের মৌলিক সত্তার যে উল্লেখ করেছেন এককথায় তা চমৎকার—

"আঙ্গিকের অপূর্ব নির্মাণ-কৌশল, ভগ্নাংশের মধ্যে পূর্ণতার অপরূপ ব্যঞ্জনা, স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে বিরাটতম সত্যের ইঙ্গিতবর্তমান কালের প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্পগুলি এই সব সম্পদেই সমৃদ্ধ। বস্তুত পৃথিবীর সাহিত্যে আজ ছোটগল্পেই সব চাইতে নিখুঁত perfection ফুটে উঠেছে। সে এখন আর উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নয় আত্মসম্পূর্ণ একটা বিশিষ্ট শিল্পবস্তু। তাই যে কোনো প্রতিষ্ঠাবান ঔপন্যাসিকই আজ ইচ্ছে করলে সার্থক ছোটগল্প লেখক হতে পারেন না এবং স্বনামধন্য গল্পকারমাত্রেই আজ সিদ্ধকাম ঔপন্যাসিক নন। দু'একজন 'সব্যসাচী' যাঁরা আছেন, তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।"২

সম্পাদকের মতে এই 'সব্যসাচী' অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। ছোটগল্প বিষয়ে সম্পাদকের এই মন্তব্য দীক্ষিত পাঠকের অন্তর্দৃষ্টি জাগরণে বিশেষ সহায়ক হবে সন্দেহ নেই।

প্রকৃতপক্ষে '১৩৫১-র সেরা গল্পগ্রন্থ' কর্তব্যপালনের ফসল। গ্রন্থের পরতে পরতে চিত্রিত হয়েছে 'মন্বন্তরপীড়িত বাংলার মর্মভেদী কান্না'। সমাজচেতনার এই সুর গ্রন্থের আগাগোড়া। এটা দুর্ভিক্ষ-ম্যানিয়া নয়। সম্পাদকের কথা অনুযায়ী, কলকাতা শহরে যদি মড়া ডিঙিয়ে চলতে হয়, ফ্যানের জন্য সমস্ত আকাশ যদি তীব্র কান্নায় বিষাক্ত হয়ে ওঠে, ব্ল্যাক-আউট, চোরা কারবারসবকিছু দেখে "জীবনাতিরিক্ত কোনো নিরঞ্জন সত্যের সন্ধান সাহিত্যিক পাননি। খবরের কাগজ যখন শ্মশান বাংলার মর্মভেদী চিত্র বয়ে আনে, বাংলার মাতৃজাতির শারীরিক ও নৈতিক অপমৃত্যুর কলঙ্কময় ইতিহাস পড়ে লজ্জায় অপমানে যখন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়, তখন যুগের উর্ধে উঠে যিনি মানস-বিলাসের মধ্যে পাখা মেলে দিতে পারেন তিনি সাহিত্যিক ননতপস্বী। কিন্তু ১৩৫১ সালের সাহিত্যিক যদি এই বিশেষ গণ্ডীর মধ্যেই বাঁধা পড়ে থাকেন, তবে তাঁর কর্তব্যই পালন করেছেন।"৩

স্বাভাবিকভাবেই যুগের দাবী মেনেই 'আর্টসফর আর্টসসেক' নয়, সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন 'আর্টসফর লাইফ সেক'-এ বিশ্বাসী। তাই একদিকে সমসাময়িক লেখকদের সমাজের প্রতি

কর্তব্যবোধ এবং সম্পাদকের সমকালের প্রতি দায়বদ্ধতাতারই যুগ্ম ফসল এই গ্রন্থটি। সম্পাদক স্পষ্ট করেছেন, কোনো দলগত মতবাদকে পরিস্ফুট করার জন্য এই সংকলন নয়। বরং"১৩৫১সালের চরম সন্ধিক্ষণে বাংলার কথাশিল্পীদের চিন্তাধারার পরিচয়কে পরিস্ফুট করে তোলাই এর লক্ষ্য।"৪

সম্পাদনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অকপট স্বীকারোক্তি সম্পাদকের মহৎ গুণ। এই বিষয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পাঠকের কাছে মার্জনা ভিক্ষা যেমন চেয়ে নেন তেমনই কিছু লেখা সংকলনে স্থান না পাওয়ার ব্যাখ্যাও করে দেন,

"কোনো কোনো প্রখ্যাতনামা লেখকের রচনা এই সংকলন থেকে বাদ পড়ে গেল। তার কারণ ১৩৫১ সালে এমন কোনো গল্প তাঁরা লেখেননি যা তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। অতিদীর্ঘ রচনার জন্যেও আমরা স্থান সংকুলান করতে পারিনি।"৫

নবীন ও প্রবীণ লেখকদের বিষয়-অনুসারী রচনাগুলিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করা হয়েছে। গ্রন্থে প্রকাশিত গল্পকার ও গল্পের কয়েকটি নাম হল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কেরোসিন', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'শেষকথা', নবেন্দু ঘোষ 'বাঁকা তলোয়ার', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'পুষ্করা', পরিমল গোস্বামী 'রূপান্তর', সুবোধ ঘোষ 'তিন অধ্যায়' ইত্যাদি। গ্রন্থটি শেষপর্যন্ত একটি সময়ের ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে। লেখকসূচী নির্দিষ্ট হয়েছে নামের আদ্যক্ষর-অনুযায়ী।

৩.

'আমার প্রিয় গল্প' গ্রন্থটি মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ থেকে ডিসেম্বর, ১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল—

৬ + ২৭২। মোট ১৫টি গল্পের সংকলন। প্রতিটি গল্পই প্রেমের। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পাঠকের মনস্তত্ত্ব বুঝতেন। বুঝতেন বলেই গল্পগুলিকে বিষয়-অনুযায়ী সাজিয়েছেন। গল্প কিংবা গল্পকারের নামের আদ্যক্ষর-অনুযায়ী নতুবা গল্পকারের বয়স-অনুযায়ী নয়। ফলে স্বতন্ত্র গল্পগুলি যৌথভাবে প্রেমের একটি পরিপূর্ণ ভাবনাকে প্রকাশ করার সহায়ক হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটিতে গল্পকার ও গল্পের সূচী এইরকম :

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'মেঘদূত', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মেঘমল্লার', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি শত্রুর কাহিনী', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'খেলাওয়ালী', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'গোলাপী রেশম', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী', প্রবোধকুমার সান্যালের 'গুহায় নিহিত', আশাপূর্ণা দেবীর 'আমায় ক্ষমা করো', গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'আত্মহত্যা', সুমথনাথ ঘোষের 'অভিমান', বনফুলের 'অদ্বিতীয়া', সুবোধ ঘোষের 'তিন অধ্যায়', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভস্মশেষ', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়. 'পিতাপুত্র'।

দ্বিতীয় সংস্করণে তিনজন গল্পকারের গল্প সংযোজিত হয়। সেগুলি হলপরশুরামের 'নির্মোক নৃত্য', প্রমথনাথ বিশীর 'মহেনজো-দড়োর পতন' এবং বিমল মিত্রের 'যে-গল্প লেখা হয়নি'।

শ্রাবণ, ১৩৭১-এর পরিবর্ধিত সংস্করণে আরও তিনজন গল্পকারের গল্প যুক্ত হয়ে মোট একুশটি গল্প নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৩১৪। এই পরিবর্ধিত সংস্করণে আরও তিনজন গল্পকার ও গল্পের নামগুলি হলমনোজ বসু 'প্রতিহিংসা', জরাসন্ধ'আলাদা জাত' এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়'সন্দেশ'।

'আমার প্রিয় গল্প'এই গ্রন্থটির সূচী এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করে সরোজ দত্ত বন্ধনীর মধ্যে বলেছেন "বইটির আর কোন বিবরণ পাওয়া গেল না।"৬

অথচ দেখা যায়, প্রত্যেক গল্পের সূচনায় সেই গল্পকারের একটি অসাধারণ লেখক-পরিচিতি আছে। সংক্ষিপ্ত অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ এই পরিচায়িকায় ফুটে উঠেছে সংশ্লিষ্ট গল্পকারের রচনানৈপুণ্য ও বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর অবদান-প্রসঙ্গ। আর এখানেই ফুটে ওঠে সত্যকার সম্পাদকের অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তি এবং সম্পাদনার প্রথা ভাঙার একনিষ্ঠা। সম্পাদনায় একটু ভিন্নভাবে ভাবা, পাঠকের কাছে সাহিত্যিক ও সাহিত্যকে অভিনব উপায়ে উপস্থাপন করাসম্পাদক হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা সত্যিই অতুলনীয়।

গ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই পাঠকের একটা কৌতূহল তৈরি হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কোন কোন গল্পগুলি প্রিয় তা জানার ইচ্ছা যেমন পাঠকের থাকে তেমনই ভিন্ন ভিন্ন গল্পকারের নিজের নিজের কাছে তাঁর কোন গল্পটি প্রিয় সেটিও জানা হয়ে যায়।

লেখক-পরিচিতি অংশে সম্পাদকের কৃতিত্বের দু'একটি নমুনা দেওয়া হল :

(ক) বনফুল—"নানা রসের বিচিত্র গল্প, সামান্য কয়েকটি ছত্রে, অত্যন্ত সংক্ষেপে লেখেন। ভাষা অনাড়ম্বর, বাহুল্য বা অলঙ্কার-বর্জিত। বক্তব্যের অনেকখানিই পাঠককে অনুমান করে নিতে হয়, যদিচ তাতে অসুবিধা হয় না। অল্প কয়েকটি তুলির টানে এঁর হাতে যে চিত্র ফুটে ওঠে তা অন্য চিত্রকর পরিশ্রম করলেও ফোটাতে পারতেন কিনা সন্দেহ।"৭

(খ) আশাপূর্ণা দেবী—"কোনো কোনো সমালোচক এঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, পুরুষের চোখে ইনি মানুষকে দেখেছেনএটা কম কথা নয়। স্ত্রীলোক হয়েও যদি পুরুষের চোখে পুরুষকে ও মেয়েকে দেখতে পেরে থাকেন ত সেটা তাঁর অসাধারণ মনীষারই পরিচায়ক। সাধারণ গৃহস্থঘরের বধূ হয়ে গৃহিণীপনার সব দায়িত্ব বহন ক'রেও আশাপূর্ণা এ পর্যন্ত প্রচুর লিখেছেন, এবং অনেক ভালো লেখা লিখতে পেরেছেন ইতিমধ্যেই।"৮

৪.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'সরস গল্প'-এর দায়সারা সম্পাদনা করেননি। একটি দীর্ঘ ভূমিকায় বাংলা কৌতুক গল্পের ঐতিহাসিক পরিক্রমা করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর রাবলে থেকে শুরু করে জোনাথান সুইফট চার্লসল্যাম্বের কৌতুক-দক্ষতা আলোচিত হয়েছে নিপুণ দক্ষতায়। পাশাপাশি এসেছে রামমোহন রায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ত্রৈলোক্যনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকের হাস্যরস সৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনা। হাস্যরসের প্রকারভেদ সম্পর্কেও লেখকের সরস আলোচনা ছোটগল্পের মতো সুখপাঠ্য। মোট ছত্রিশজন লেখকের গল্প স্থান পেয়েছে

সংকলনটিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'পলিটিকস দিয়ে শুরু করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইদু মিঞার মোরগা' দিয়ে সংকলনটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। একটু লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হয় যে, সাহিত্যিকদের অবস্থান কালানুক্রমিক শুধু নয়, বিষয়বৈচিত্রে গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন জুগের প্রতিনিধিত্ব করেছে। হাস্যরসাত্মক সাহিত্য যে 'inferior art' নয়, গল্পগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়। প্রতিটি গল্পেই স্থান পেয়েছে কার্টুন চিত্র। এগুলি হাস্যরস সৃষ্টিতে অনুঘটকের কাজ করেছে। এই কৃতিত্ব সম্পাদকেরই প্রাপ্য।

'সরস গল্প' গ্রন্থের সম্পাদনা-প্রসঙ্গটি বিস্তৃত আলোচনার দাবী রাখে। গ্রন্থটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় নতুন সাহিত্য ভবন থেকে প্রকাশিত হয় চৈত্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে। ৪৪৭ পৃষ্ঠার জনপ্রিয় এই গ্রন্থটি সম্পাদকের সুপরিকল্পনার ফসল। রসশাস্ত্রের নবরসের দ্বিতীয়টিকে অবলম্বন করে হাস্যরসের সম্ভার সাজিয়েছেন সম্পাদক। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত মোট ছত্রিশজন লেখকের গল্প স্থান পেয়েছে সংকলনটিতে। প্রত্যেক গল্পের শুরুতে গল্পকারের নামের পাশে তাঁর জীবনকাল উল্লিখিত হয়েছে। সংকলনের গল্পগুলি আরও বেশি শোভনসুন্দর ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে প্রাসঙ্গিক চিত্র অলংকরণে। সম্পাদক অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন,

"চিত্রশিল্পী অহিভূষণ মল্লিক বইখানিকে চমৎকার করে সাজিয়ে আরো শোভন করে তুলেছেন তাঁর গুণপনার বিচার পাঠকেরাই করবেন।"৯

'সরস গল্প' আরও বেশি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এর দীর্ঘ মূল্যবান ভূমিকার সমন্বয়ে। শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারাটি নয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে হাস্যরসের ক্রমবিবর্তিত রূপটিকে তুলে ধরেছেন এই ভূমিকায়।

হাসি মনের রোগ দূর করে। দুর্ভাগ্যকে জয় করে মনে শক্তি জোগায়। সুস্বাস্থ্য আনে। যে মানুষ হাসতে জানে না, সে বাঁচতেও জানে না। রাবলের এই কথা দিয়েই ভূমিকার শুরু। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় উঠে এসেছে বিভিন্নধারার হাস্যরস। নির্বিকার হাসির কথা বলেছেন রাবলে। যার দার্শনিক নাম 'পাঁতা গ্রুয়েলিজিম'। যে হাসিতে লুকিয়ে আছে তীব্র ব্যঙ্গ, চাবুকের মার, সাপের বিষজোনাথান সুইফট, চার্লস ল্যামের রচনা কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের দপ্তর' সেইজাতীয়।

বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের ইতিহাসে অবগাহন করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অনুভব করেছেন—'ভারতচন্দ্রের হাসি কলঝংকৃত', 'দাশরথির কৌতুক তখনো জীবন্ত' কিংবা রামমোহনের কৌতুক তীক্ষ্ণ হলেও "এর রুচি মার্জিত, এতে বিদগ্ধ রসিক মনের অভিব্যক্তি।"১০

এর পরবর্তী সময়ে অবশ্য বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত হয়েছে পাঁকঘাঁটার পালা।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ঐতিহাসিক পরিক্রমা শেষে এই বিষয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুসিদ্ধান্তটি বেশ মূল্যবান—'ইন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ব্যঙ্গ রচনায় প্রেরণা পেলেন প্রমথ চৌধুরী, এল 'নীল লোহিত'; বৈঠকী গল্পের আসর বসালেন 'ঘোষালের' গল্পমালায়। ত্রৈলোক্যনাথের মেজাজ নিয়ে, অথচ প্রভাতকুমারের পারিবারিকতা আশ্রয় করে গল্পের বৈঠক

জমিয়ে তুললেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যঙ্গ-কৌতুকে পসার সাজিয়ে বসলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ বসু। ত্রৈলোক্যনাথের কল্পনাবিলাস আরো সুমার্জিত এবং নাগরিক হয়ে দেখা দিল পরশুরামের লেখায়; এলেন রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, সজনীকান্ত দাস, প্রমথনাথ বিশী, বনফুল। ত্রৈলোক্যনাথ-পরশুরামের পথে খানিকদূর এগিয়ে এলেন সম্বুদ্ধ। সূক্ষ্ম কৌতুকের বৈদগ্ধ্যে সংযত মৃদু হাসি বিকীর্ণ করলেন পরিমল গোস্বামী। 'রাণুর' ঘরোয়া গল্প নিয়ে আসরে এসে শিবপুরের গণশা অ্যাণ্ড কোংকে নিয়ে নির্মল হাসির ডালা সাজালেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। এক ঝলক আলোর মতো দেখা দিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী, তাঁর রশ্মিতে দীপ্ত হলেন রূপদর্শী, নীলকণ্ঠ। কথার কারুশিল্পে আর রঙ্গসৃষ্টির বৈচিত্র্যে শিবরাম চক্রবর্তী একক মহিমায় বিরাজ করতে লাগলেন।"১১

সাহিত্য হাস্যরস সৃষ্টি করা চাট্টিখানি কথা নয়। অথচ হাস্যরসাত্মক সাহিত্যকে অনেকেই প্রথম শ্রেণির সাহিত্য মানতে নারাজ। এই বিষয়ে সম্পাদকের অভিমান আছে। তাই এই সংকলনে সম্পাদকের লক্ষ্য স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, সরস গল্প পরিবেশন করাই গ্রন্থটির মূল লক্ষ্য। গল্পের কোনোটিতে তীব্র ব্যঙ্গ কিংবা কঠিন শ্লেষ আছে কিন্তু গল্পটি আগাগোড়া শ্লেষমূলক এমনটা নয়। আঘাতের মধ্যেও যাতে মধুর প্রলেপ থাকে, জ্বালা থাকলেও তার মধ্যে যাতে রসিকতার স্নিগ্ধতা থাকে সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। গল্পগুলির মধ্যে বিশুদ্ধ আনন্দ আছে রঙ্গ আছে উইটও আছে। হাসির উপাচার নিয়ে গল্পগুলি পাঠকের মনোবাঞ্ছা পূরণে সার্থক হয়েছে।

বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে গল্পের বাছবিচারে তিনি কতটা নিখুঁত, সম্পাদকের এই মন্তব্য থেকেই তা স্পষ্ট হয়। গল্প সংকলন করতে গেলে সম্পাদককে অনেক নিয়মকানুন মানতে হয় সংকলকের সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার "রবীন্দ্রনাথের গল্পটিকে এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তা ছাড়া যে-সব লেখক ও প্রকাশক তঁদের রচনা মুদ্রণের সম্মতি জানিয়েছেন, তাঁদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"১২

৫.

'অর্ধশতাব্দী' 'কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশপূর্তিতে স্মারকগ্রন্থ।' যৌথভাবে সম্পাদনা করেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শুদ্ধসত্ত্ব বসু। প্রকাশনা—বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৭, ৮মে, ১৯৬০। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়। মূল্য চার টাকা। তবে উল্লেখযোগ্য বিবৃতি হল—

'এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ চিকিৎসাপথ্যের জন্য কবিকে দেওয়া হবে।'১৩

'অর্ধশতাব্দী' গ্রন্থের ভূমিকা এবং সূচীপত্রের আগেই ছাপা হয়েছে বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতা—'রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত'। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে কবিতাটি নিবেদন করেছেন এইভাবে—'শতাব্দীকে অর্ধশতাব্দী'। কবিতার শেষে আছে কবির হস্তাক্ষর। রাবীন্দ্রিক হাতের লেখার স্টাইলে কবিতাটি ছাপা হয়েছে। তারিখ, ১১ মার্চ, ১৯৬০, স্থান কলকাতা।

এরপর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সুন্দর ভূমিকা ছাপা হয়েছে

"কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশ পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের সাহিত্যিকবৃন্দ, সাহিত্যানুরাগীসমাজ এবং অগণিত গুণমুগ্ধ পাঠক-পাঠিকা কবিকে মহাবোধি সোসাইটি হলে সম্বর্ধনা জানান। "

'অর্ধশতাব্দী' এই সম্বর্ধনা-উৎসবেরেই স্মারক। সাতচল্লিশজন প্রবীণ ও নবীন কবি (এঁদের মধ্যে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের দু'জন হিন্দী কবিও আছেন) এই উপলক্ষে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতার মাধ্যমে বিমলচন্দ্রের উদ্দেশ্যে তাঁদের অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। বিমলচন্দ্রের কাব্য-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের কয়েকটি নতুন লেখা এই গ্রন্থের মূল্যবান আকর্ষণ। এ ছাড়া বিগত তিরিশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শ্রী অরবিন্দ থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম তরুণ লেখক পর্যন্ত বিমলচন্দ্রের সাহিত্য নিয়ে যে সমস্ত অভিমত ও আলোচনা নানা সময়ে, নানাভাবে করেছেন, সেগুলিও এই স্মারকগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আশা করি, বিমলচন্দ্রের কাব্য-সাধনার স্বরূপ ও সাফল্যের পরিচিতি এই আলোচনাগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে এবং রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলাকাব্যের (১৯৩০ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত) একটি সামগ্রিক রূপও পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।"১৪

ভূমিকার পরে সূচীপত্র ছাপা হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এটি বৈচিত্রপূর্ণ। সূচীপত্রের প্রথম পর্যায়ে নাম 'কবিতা'। এতে আছে ১৮টি কবিতা। এর পরের পর্যায়ের নাম 'প্রবন্ধ'। এতে আছে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে লেখা মোট ১১টি প্রবন্ধ। পরের পর্যায়ে 'কবিতা'য় মোট ২৬টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এরপর স্থান পেয়েছে বিভিন্ন বিষয়সম্ভার—'বিবিধ প্রসঙ্গ'। এই পর্যায়ে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ যেমন আছে, তেমনই আছে মানপত্র, সংস্কৃত প্রশস্তি-কাব্য। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে কবিশেখর কালিদাস রায়ের লেখা কবিতা 'অগ্নিগিরি' দিয়ে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। গ্রন্থটিতে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের মোট তিনটি প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছে।

৬.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশাপূর্ণা দেবীর যৌথ সম্পাদনায় গ্রন্থপ্রকাশ থেকে আশ্বিন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় ২৪টি প্রেমের গল্প সংকলন—'পঞ্চসায়ক' (প্রথম খণ্ড)। সূচীপত্রের নিচে লেখা ছিল—"দ্বিতীয় খণ্ডে পরবর্তী লেখকদের গল্প"। যদিও পরবর্তীকালে 'পঞ্চসায়ক'-এর দ্বিতীয় খণ্ড আর প্রকাশিত হয়নি। 'পঞ্চসায়ক' অর্থে পঞ্চবাণ। কামদেবের বাণ। তাই প্রেমের গল্প সংকলন হিসেবে 'পঞ্চসায়ক' নামটি সার্থক।

একজন ভালো সম্পাদক সিদ্ধান্ত নিজেই নেন একথা সত্য কিন্তু প্রকাশকের সুপরামর্শকে অস্বীকারও করেন না। আসলে সুসম্পাদক যখন প্রেমের আখ্যানের মালা গাঁথেন, তিনি এমনভাবে আখ্যানগুলি সাজান যাতে সেই মালায় বৈচিত্রপূর্ণ গল্পকুসুমের সান্নিধ্যে প্রেমের একটি বিস্তৃত এবং অখণ্ড রূপ ধরা পড়ে। সেই উদ্দেশ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আশাপূর্ণা দেবী প্রেমের গল্পগুলিকে অপূর্ব বিন্যাসে এই সংকলনে চয়ন করেছেন এবং বলেছেন,

"আমাদের প্রকাশক ইচ্ছা করেছিলেন যে বাংলা সাহিত্যের একেবারে আদি পর্যায় থেকে প্রেম-কাহিনীর এই সংকলনটি গ্রথিত করা হোক। সেই উৎস-সন্ধানে অগ্রসর হয়ে আমরা বাংলা আরব্য উপন্যাসের সর্বাদি অনুবাদক কেদারনাথ বসু থেকেই আমাদের সংগ্রহ শুরু করেছি। তারপর এসেছেন পারস্য উপন্যাসের শরৎচন্দ্র দাস, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের পর থেকে প্রবেশ করেছি বাংলা ছোটগল্পের নিয়মিত ধারায়।"১৫

এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, দায়সারা সম্পাদনা নয়, প্রেমের জালে পাঠককে ঠকানোও নয়, গবেষণাধর্মী মনোভাব নিয়ে বাংলা ছোটগল্প থেকে শুরু করে আরব্য, পারস্য গল্পের বিস্তৃত পরিধির মধ্যে প্রেমের বৈচিত্র্যময় দিকটিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরা।

'পঞ্চসায়ক'-এর ভূমিকায় প্রেমের বিচিত্র রূপ ও তার প্রকাশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন সম্পাদক। প্রেম চিরন্তন, অবাধ বিস্তার তার। বিভিন্ন রূপে তার অবস্থান। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়—

"ত্যাগে-ক্ষমায়-বীরত্বে-বিশ্বাসঘাতকতায়-হিংসায়-সংশয়ে চিরকালের প্রেমকথা আকুল, উতরোল। যুদ্ধের বিবরণ, রাজার কাহিনী, দিগবিজয়ের ইতিহাস, সাধু-সন্তের ইতিবৃত্ত সব ছাপিয়ে প্রেম বাজতে থাকে ধ্রুব-সঙ্গীতের মতো। কখনো ক্লান্ত বিষাদে আচ্ছন্ন করে, কখনো রক্তে তুফান তোলে, কখনো স্বপ্ন-কল্পনার ফুল ফোটায়, কখনো আনন্দে উত্তাল করে তোলে। প্রেম চিরনূতন, প্রেমের গল্প চিরকালীন।"১৬ এরপর সম্পাদক বিশ্বসাহিত্যে প্রেম-ভাবনার আলোচনা করেছেন। প্রসপের মেরিমে থেকে শুরু করে এডগার অ্যালান-পো, মোপাসাঁ, চেকভ, আলফঁস দোদে, গোর্কী প্রমুখের সাহিত্যে বৈচিত্রময় প্রেমের তুলনামূলক আলোচনা করে পাঠককে ক্রমশ দীক্ষিত করে তুলেছেন।

শুধু বিশ্বসাহিত্য নয়, বাংলা সাহিত্যে প্রেমের ক্রমবিবর্তনের ছবিটিও সুন্দর করে এঁকেছেন সম্পাদক। এই প্রসঙ্গে সম্পাদকের মন্তব্যটি উল্লেখ করলে 'পঞ্চসায়ক' গ্রন্থের সংকলনের উদ্দেশ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় :

'বৈষ্ণব পদাবলী আমাদের উত্তরাধিকার, ভারতচন্দ্র আমাদের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ, এ-কথাও কি আমরা ভুলতে পারি ? স্বর্ণকুমারী থেকে রবীন্দ্রনাথ; প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্র থেকে উত্তরকালীন বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-বনফুল-শরদিন্দু-প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-মনোজ-বুদ্ধদেব; সুবোধ ঘোষ-নরেন্দ্রনাথ মিত্র থেকে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত (এটি কোনো ধারাবাহিক তালিকা নয় আশা করি, ভুল বুঝবেন না) বাংলা প্রেমের গল্পকে আমরা রূপে রূপে প্রত্যক্ষ করেছি। কখনো রোমান্সের তীব্র নিখাদে তা বেজে উঠেছে, কখনো মনস্তত্ত্বের ব্যঞ্জনায় গভীর হয়েছে, কখনো কৌতুক কোমলতায় স্নিগ্ধ হয়েছে, কখনো দেহের দাবীতে পৃথিবীর মাটি ছুঁয়েছে। বাংলা প্রেম কাহিনীর এই বহুমুখী উদ্ভাসনকে বর্তমান সংকলনে কিছুটা আভাসিত করাই আমাদের সংকল্প ছিল। 'পঞ্চসায়ক' প্রথম খণ্ড সেই সংকল্পেরই রূপায়ণ।"১৭

প্রেমের বিচিত্র রূপ, অনন্ত তার ব্যাপ্তি। রোমান্টিক প্রেম, দাম্পত্য-প্রেম, পরকিয়া। আবার

মিলন নয়, বিরহই মানুষের কাছে হয়ে উঠেছে প্রিয়তর। নবরসের প্রথমেই আছে শৃঙ্গার রস। তাকে কেন্দ্র করেই সম্পাদকের এই গল্পের পসার সাজানো। তিনি জানেন প্রেম কখনো পুরাতন হয় না। চেনা অথচ চির নূতন এই বিষয়কে পছন্দ করে শতকরা আশিজন পাঠক। 'সমুদ্রে সূর্যোদয়ের মতো সে কখনো পুরোনো হল না' বলেই সম্পাদক নিশ্চিত 'পঞ্চসায়ক' সংকলনটির প্রকাশ সফল হবে।

৭.

প্রথমেই বলা হয়েছে 'পঞ্চসায়ক'-এর দ্বিতীয় খণ্ড আর প্রকাশিত হয় নি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর প্রায় আট মাস পর তাঁর এবং আশাপূর্ণা দেবীর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'প্রেমের গল্প' গ্রন্থটি। কিন্তু গ্রন্থটিতে মাত্র ৮টি গল্প স্থান পেয়েছে। এমন হতে পারে এগুলি 'পঞ্চসায়ক'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য রাখা ছিল। কিন্তু প্রথম খণ্ডে যেখানে গল্প সংখ্যা ছিল ২৪, সেখানে ৮টি গল্প সংখ্যায় খুবই কম। তাই হয়তো 'পঞ্চসায়ক' (দ্বিতীয় খণ্ড) না হয়ে গ্রন্থটি 'প্রেমের গল্প' নামে প্রকাশ পেয়েছে।

স্বল্প সম্পাদনার পরিসরেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দায়বদ্ধতা আমাদের মুগ্ধ করে। একদিকে যুগসংকটকে চিহ্নিত করে সমকালীন গল্পগুলিকে (১৩৫১-র সেরা গল্প) সংকলিত করার দায়বদ্ধতা। অন্যদিকে কবির প্রতি আর এক কবির সম্মাননা-জ্ঞাপন (অর্ধশতাব্দী)। সমান্তরালে টেনিদা-সিরিজ-স্রষ্টার হাস্যরসের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ যার অনিবার্য ফলশ্রুতি 'সরস গল্প'। এছাড়াও রসশাস্ত্রের নবরসের প্রথম রসকে গুরুত্ব দিয়ে 'পঞ্চসায়ক' কিংবা 'প্রেমের গল্প' সংকলন—প্রতি ক্ষেত্রেই চোখে পড়েছে সম্পাদকের অপূর্ব নিষ্ঠা, সচেতনতা। সংকলনে গবেষণাধর্মী ভূমিকাগুলি বাংলা সাহিত্যে সম্পদ হয়ে থাকবে। কথসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সাফল্যের কথা আমরা জানি। সম্পাদক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাফল্য তাঁর প্রতিভার অজানা একটি দিককে আলোকিত করল এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সূত্রনির্দেশ :

১. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, সম্পাদক, 'প্রারম্ভে', '১৩৫১-র সেরা গল্প', বেঙ্গল পাবলিশার্স —শ্রী শচীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ঃ, কলকাতা, ১৯৪৫, পৃ: ১।

২. ওই, পৃ: ৩।

৩. ওই, পৃ: ৪।

৪. ওই, পৃ: ৫।

৫. ওই, পৃ: ৬।

৬. দত্ত সরোজ, 'পরিশিষ্ট', 'কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়', রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ: ২২৯।

৭. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'আমার প্রিয় গল্প (সম্পাদিত), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৭১।

৮. ওই।

৯. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'সম্পাদকের কথা', 'সরস গল্প', নতুন সাহিত্য ভবন, প্রথম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৬৬, পৃ: ২১।

১০. ওই, পৃ: ১১।

১১. ওই, পৃ: ১৮।

১২. ওই, পৃ: ২১।

১৩. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, ভূমিকা, 'অর্ধশতাব্দী', যৌথ সম্পাদনা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শুদ্ধসত্ত্ব বসু, প্রকাশনা বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৭, ৮মে, ১৯৬০।

১৪. ওই।

১৫. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, দেবী আশা, 'পঞ্চসায়ক' (প্রথম খণ্ড), সম্পাদনা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশা দেবী, গ্রন্থপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৭৩, পৃ: ২২।

১৬. ওই, পৃ: ১১।

১৭. ওই, পৃ: ২১।

কবিতা : নবীন-স্বর

চিত্রগুপ্তের ডায়েরি থেকে

সুস্মেলী দত্ত

বৃষ্টি বৃষ্টি শ্রাবণ চোদ্দো মাস
ধনিষ্ঠা চাঁদ মেঘলায় উদ্ভাস

কান্না ব্যাপক থৈ থৈ মখমলে
কুম্ভ ও মীন স্বপ্ন সদলবলে

নামল আকাশ পলক ফেলার ক্ষণ
নয় দুই মেঘ রাত্রির আলাপন...

মৃত্যু মৃত্যু কর গোনা দিন দিন
শুধছে সময় গতজন্মের ঋণ

ভূমিকাতো শেষ হল

বেবী সাউ

ভূমিকা তো শেষ হল, এবার প্রত্যক্ষ কথা হোক,—
কত লোক মরে গেছে? কত জল ঢুকেছে বন্যায়?
তোমার আমার প্রেমে নেই চিরন্তন প্রকাশক।
আমাদের লেখা দেখে ভড়কে গেছে তার পিতৃদায়।

বলো তো জীবন খুলে, আমি তাকে এ শরীর দেব।
কেন এত বার তুমি বদলে যাও মোহানার জলে?
এ কবিতা আমি ঠিক দাম দিয়ে আজ কিনে নেব,—
যদি বা আগুন হয় শিশিরের ঠিকানা প্যারোলে।

আমিও তো কেউ নই, তবে কেন বাঁধ ভাঙলে হাওয়া—
গাছের শিকড় ভাঙল, মাটি ফেটে ধ্বসে গেল পাড়
এখন সময় নয় তোমার তীর্থক্ষেত্র যাওয়া
ফেঁসে যাওয়া বাঘ দেখে মনে পড়ে ভোঁতা হল ধার।

ভূমিকা তো শেষ হল, এবার আসল কথা বলো—
পোশাক-আশাক নেই, নেই কোনও মধুর আড়ালও।

প্রেমে প্রতিবাদে

মন্দাক্রান্তা সেন

আমি কি শুধু লড়াই লিখে যাব,
প্রেম কি আমায় ছেড়ে গেছে!

রাত্তিরে রতি নয়,
পাশাপাশি শুয়ে আলোচনা করি
ফুল্লরা মণ্ডল আর কার্নিভাল

কবিতা কি আমায় ছেড়ে গেছে!

কেউ কেউ আমার সব লেখা পড়ে,
এবং গালি দেয়
সেসব বিলকুল হজম করে যাই

সমালোচকের পাতে পড়ে থাকে
ছিবড়ে

আমি
মঞ্জুশ্রী সরকার

"ভালো থেকো তুমি
খুব ভালো থেকো
সুখে থেকো...."
এগুলো তোমার কথা।
অনেক পুরোনো কথা।
বলেছিলে একদিন
চলে যেতে যেতে.....
একবারও পিছু ফিরে না তাকিয়ে।
একবারও না ভেবে।

আজ আমার কথা শুনবে?
নিদ্রাহীন দু চোখে সাহারার শূন্যতা
সুনামির উত্তাল ঢেউ
দুয়ার ছুঁয়েছে।
ছুঁয়েছে উত্তুঙ্গ এভারেস্টের চূড়া।

ভালো আছি আমি
খুব ভালো আছি
তোমার কথা মতো।

ঝরা বকুল
শিবানী বাগচী

জামরঙা বুকে মাথা ঠুকে ঠুকে,
একদিন শ্রাবণের বর্ষা নামাতে পারতাম --
কখনও সাহস হয়নি ছুঁয়ে দেখার !
সহসা কোনো এক জ্যোৎস্নাধোয়া রাতে,
ধরা দিলো সে, বেদনায় নীল হয়ে যেতে যেতে ;
ঘুমন্ত বুকে হাত রাখলাম, ঠোঁটে রাখলাম ঠোঁট,
গায়ে বিছিয়ে দিলাম ঝরা বকুলের চাদরখানা।

সুর
খেয়া সরকার

মৃত্যুদৃশ্যে অভিনয় ছেড়ে
এদিক-ওদিক খুঁজে তুলে আনো
আলো-ছায়া যাপন
রাংতায় মোড়া প্লাস্টিকের জীবনগুলো
দরজার গায়ে জটিল চিহ্নে আটকে থাক
জানি, ডানা পাওয়া সহজ নয়
বিবি খুঁজে নেয় গোলাম আর টেক্কা
তুমি চায়ের কাপে পেখম তুলো
কিংবা গেলাসেই হরিবোল
পোকামাকড় সরিয়ে জমি তৈরি করবো ঠিক
ইঁদুরের দল আসবে আবার
তোমার বাঁশির সুর আমাকে শিখতে দিও

বাইশ গজ
শর্বরী চৌধুরী

বাইশ গজের দূরত্বে দাঁড়িয়ে পরষ্পর
কে এফোঁড় ওফোঁড়।
যুযুধান দুজনের হাতে উচ্চকিত ব্যাট।
নন স্ট্রাইকার এন্ডের খেলোয়াড় ছক
কষে কীভাবে উল্টোদিকে যাওয়া যায়।
এত কিছু ঘটে যাওয়ার পর বিপক্ষের
দুটো বলে দুজনেই আউট পরপর।
শুধু জীবনের বাইশ গজ সাক্ষী থেকে
যায় পুঞ্জীভূত ঘৃণার।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

বিভ্রম
পাপড়ি দাস সরকার

আমার চোখের ধার ধরে একলা হেঁটে গেলে
সমস্ত দরজা একে একে খুলে যায়
মাথার ওপর জমাট বাঁধা ঝড়ের সংকেত
কাঁপতে থাকে চোখের পাতা

সমুদ্রের ফ্যাকাসে ফেনার ওপর জলস্তম্ভের লোভ জেগে ওঠে
পাহাড়ের সমস্ত গুহার ভেতরে হিংস্র রোমশ পেশী থেকে
আর্তনাদ ছড়িয়ে ছড়িয়ে অতলান্তে উপত্যকার
সবুজ ফোয়ারা দাবানল
নদীপথ এঁকেবেঁকে গতি পাল্টালে গিরিখাতে
বন্যা নেমে আসে

হলুদ চ্যাটালো মরুভূমির পিঠের ওপর
উটের গলার পর গলা পেরিয়ে পেরিয়ে
সারিবদ্ধ মরীচিকা পথ আগলে শুয়ে থাকে
আমার চোখের কোল বেয়ে লবণাক্ত জলরাশি
চরাচর ঝাপসা করে দেয়।

অন্ধের মতো আমি দরজা হাতড়াই।

তথাগত মন ও পুনর্বসু কথা
মনোরঞ্জন সরদার

মুখোশগুলো খুলে ফেলতে পারো
মুখের উপর রং মেখো না আর,
তোমার মুখটা আমার মুখের মতো
ফারাক শুধু জীবনদেবতার।

যখন আমাকে খুঁজি
সুচরিতা চক্রবর্তী

তারপর নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েছিলাম
কুকুর তাড়াচ্ছে এলো গায়ের ছেলে
গেঁড়ি গুগলি ভরে নিচ্ছে ফুল তোলা আঁচল
ডাইনে টানো হে কত্তা, লাগাও লাগাও
ভাঁটার সময় এলো বলে.......
সুখি ঘাসের গোছায় জলের ঝাপট
আহা, কি মনোরম শর্তহীন খেলা!
চাঁদ মেখে, জল মেখে আমি গড়াগড়ি দি,
চড়ুই মন দানা খুঁটে খেয়ে দিগন্তে ডানা মেলে
এককণা রোদে বুকে দিও অজস্র আলো।
আমার স্থবির মন খোঁজে আমাকে; আমার আমিকে।

গড়িয়াহাট মোড়, রোববারের সকাল
সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

আমাদের চোখের সামনে দিনের আলো আছে
দিনের আলোয় সে খুন হয়ে যাচ্ছে। তার বুকের হাজার জীবন শেষ
মস্তিষ্কের মৃত্যু হয়েছে, সে তার মুকুট
নামিয়ে রেখেছে, সে চাইছে তুমি তাকে ভালোবাসো
তুমি পুড়ে যাচ্ছ, ইলেকট্রিক চুল্লিতে তোমার সঙ্গে পুড়ছে
সময়। তোমার হাড়ের দামে বিক্রি হচ্ছে পৃথিবীপৃষ্ঠ
এখন উত্তর গোলার্ধে বেজে ওঠা ভায়োলিনে
দক্ষিণ গোলার্ধের শ্যাওলা ও শস্যে
তোমাদের কোনো চিহ্ন নেই। তোমরা ভেঙে যাওয়া কবিতাসমগ্রে
ভালোবাসা গুড়ো করে ছড়িয়ে দিচ্ছ। তাতে যদি
পুরনো আকাশ, তার সোনার নক্ষত্রগুলি ফিরে পাওয়া যায়

মায়া
শিল্পী গঙ্গোপাধ্যায়

ঘুমের ভেতর বিছিয়ে দাও স্মৃতি, শুক্লপক্ষের অষ্টমী চাঁদের মিহিন আলোর মত মায়া হৃদয় ভাসায়
তোমার শর্তহীন চলে যাবার শূন্যতা আমাকে নৈঃশব্দ্যে বাঁধে, কতদিন তেমন করে মেঘ জমেনি
আকাশ ঘিরে, কত বসন্ত গেল পলাশ ফুটল না,
কত শ্রাবণ বৃষ্টিহীন ...
আমি ঠিক চিনতে পারিনা নিজেকে, অতীত বর্তমান কিছু না, শীতের কুয়াশা মেখে নরম শিউলির
মত ঝরে পড়ছি নিয়ত। তোমার শূন্যতা আমাকে পুরনো সাঁকো ধরে অচেনা নদীর কাছে নিয়ে যায়,
মোহাবিষ্ট
অবগাহন করি
নদীর ওপারে দিগন্তরেখা ছুঁয়ে সন্ধ্যা নামে,
চাঁদ জাগে, জল ছেড়ে উঠে এসে দেখি
জ্যোৎস্না মেখে দাঁড়িয়ে আছ তুমি, আমি ফেরার পথ খুঁজি, আকাশ জুড়ে মেঘ ঘনায়, বৃষ্টি নামে
মোহজল ঝেড়ে অঝোর বৃষ্টিতে
পুনরায় স্নান সারি।

আতঙ্ক
ইন্দ্রাণী বিশ্বাস মণ্ডল

ঘুম না আসার ক্লান্তি তোমার চোখে
আমি জানি একদিন স্বাধীনতা আসবে
দিলরুবাতে সুর বাঁধার।
বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে সেদিন ভেসে যাব
তাসখন্দের আঙুরক্ষেতে, পাঠানকোটের
টিউলিপ বাগানে।

এমনই শত ইচ্ছের ঝলকানি
আঁকা থাক তোমার
আয়তকার চোখে, নাকছাবিতে।
যন্ত্রণার অস্থিরতায় ভেজা তোমার দুটি আঁখিপল্লবে
বিভ্রান্ত হবার বাসনা।

সবকিছু থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে রেখেছি
এক দুর্বোধ্য শাসনে,
তবু তোমার শ্বাসাঘাতমিশ্রিত শব্দ
ভরিয়ে দিচ্ছে আমার
লজ্জা ও আতঙ্ক।

দরিদ্র আলো
দিশা চট্টোপাধ্যায়

অন্য কোথাও
উত্তুরে হাওয়া বইছে—
আর শহর কেঁপে উঠছে...
ফোঁটাফোঁটা বিষের মতো
নীল তারা দেখতে পাচ্ছি।
তুমি কি খুব কষ্ট পাচ্ছো ?
কষ্ট আসলে
একটা তেতো ফলের মতো।
লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে
আমি একা জেগে আছি...
একটি মাটির প্রদীপ হাওয়ায় উড়ছে—
কিন্তু নিভছে না, দরিদ্র আলো।

পাঞ্চজন্য
শম্পা হালদার

(১) শুকনো পাতার পরে পা রাখি আজও। তুমি বলো,
রাস্তায় এসো। কেন ! অক্সিজেন তো এখনো এখানেই...
(২) আমি থেমে নেই চলছি তো ! দিন-রাত ঘুমের ভিতরেও
শরীরটাকে শুধু বিশ্রাম দিই। সেই আমি জেগে আছি অনন্তকাল।
(৩) তুমি কে ? আমি কে বলো তো ! কোটি কোটি মানুষের মাঝে
তোমার সাথে কেনো এত ভালোবাসাবাসি !
(৪) যেদিন জানলাম আমি কে আর কী, সেদিন পেয়েছি তোমাকে।
কেউ বলে পরিচয় জন্ম-জন্মান্তরের। কী করে !
(৫) এসেছি যখন তখন যেতেও তো হবেই...।
ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরছি সবাই। তবু কেন হিংসা-দ্বেষ ঢুকাইতে থাকি।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

অতীত

মৌসুমী সাহা

শুরু কবে জানি না
অন্ধকারের ঘ্রাণ
নিতে
নিতে
নৈঃশব্দ এসে
জড়িয়ে ধরে,
বুকের ভিতর কী যে-
'উথাল-পাথাল'
জীবনানন্দীয় ধ্যানে
নিমগ্ন শরীর
যেন সমুদর্গর্ভ থেকে
উঠে আসা
গতজন্মের-কল্পনা
ছড়িয়ে যায়
কোষ থেকে কোষে,
আমার সব গান
তোমার পায়ে ঝরে পড়ে।

ব্যথিত অতীত
ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত
তবুও হৃদয়ে
শান দ্যায় সাধ—
ছলছলে চোখে
চেয়ে দেখি
বদলে গেছে অনেককিছুই,

তবুও
একই আছে আজও।

জানলা খুলে দাও

তনুজা চক্রবর্তী

কোনো শব্দ কোরো না সব জানলা খুলে দাও ,
দেখ বাতাস তোমায় ডাকে আদর মেখে নাও।
রাত ঘুমিয়ে আছে থাক
ওর স্বপ্ন ভেঙো না,
তুমি ঘুমের দেশে আজ
যেন হারিয়ে যেও না।
ও যে পাগল তোমার প্রেমে একটু ছুঁতে চায়,
শোনো উদাস বৈরাগী আজ বেসুর গান গায়।
বড়ো উথালপাথাল মন অবুঝ উচাটন,
ওর গানের বাণীর ধারায় তোমার উপাসন।
হাতে সময় বড় কম
ওকে ফিরিয়ে দিও না
ওই মধুর আহ্বান
বিষে বদলে নিও না।

যাও নদীর মতন বয়ে রেখ না পিছুটান ,
যদি পাথরে আঘাত পাও কোরোনা অভিমান।

আখ্যান

শুভ কুমার পাত্র

যে মৃত স্বপ্নের জন্য অতীন্দ্রিয় প্রহরী
এখনো রাখা আছে , তাকে তুমি হত্যা করো।
না হয় মেঘ ডাকো...ভেসে যাক চারিদিক।

মানুষ কি শুধু মৃত স্বপ্নের স্তূপ ?
যার উপরে উঠে শুধু আদিগন্ত চরাচর দেখে যাবে?
দেখে যাবে মেঘ আর রৌদ্রের কানামাছি খেলা?

মাটির দিকে তাকাও। তোমার পায়ের নিচে
যে ধুলো জমে আছে তাকে মুঠিতে ভরে দেখো
জীবাশ্মেই রাখা থাকে জীবনের ছাপ, গান আর গাথা
এছাড়া তোমাকে বলবার মত আর কোনো আখ্যান নেই।

একদিন তুমিও

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

ঘোড়ার খুরের মতো চলে যাওয়া সময়
খণ্ড খণ্ড মুহূর্তগুলো যেন সমুদ্রঢেউ
এখন দিনযাপন বিষণ্ণ ফুলের মতো
তবুও বৃষ্টিজলে ভেজা বেহাগী দুপুর
পায়ের পাতা বেয়ে গড়িয়ে যায়
রাত্রি নামে, রঙিন হয়ে যায়
লাল উজানি আলো আকাশ জুড়ে
বধিরতার ভেতর তোমার অবস্থান
অসহায় অন্তঃস্থল থেকে দেখতে পাও
গোঁসাই পুকুরে ভাসমান হাঁসের ডানা থেকে
উড়ে যাওয়া কয়েক ফোঁটা জলকণা
বা এক নীল পাখির পাখনা ও উড়ান
একদিন তুমিও উড়তে সকাল থেকে মধ্যরাত
ঐ তুলসীতলা থেকে উঠোন
রান্নাঘর থেকে খাবারঘর
বা বাইরের বারান্দা থেকে বাড়ির ভেতর
এক গতিময় ছন্দের ভেতর বিচরণ
যেন কোন ধ্রুপদী শিল্পের ভেতর...
বা কোন মধ্যগতিময় কোন নদীর মতো

"এখন শুধু এক স্থির ভূমি..."

দু'টি কান্না

স্বপন শর্মা

সময়ের দু'টি কান্না মরলোকে মেশে
চেয়েছি অনন্তে মিশে যাক
তাই স্মৃতি ও বাকের মিলিত কামনা
প্রেমিক যেমন শুধু প্রেমিকাকে।
মহাসময়ের কাছে সময় যেমন
অতি ক্ষুদ্র মুহূর্তের জলবিন্দু,
মরে গিয়ে মিশে যায়,
তেমনি অনন্তে মিশে যাক কান্না দু'টি।

এসো স্মৃতি, সাজো এই মরলোকে
অক্ষরের গয়নায়, ধ্বনির নূপুরে
তোমার শরীরে নীল দারুণ মানাবে
বাকের সঙ্গে মিলন হোক দ্রুত।
তারপর কেঁদে চলো লীন হওয়ার আগে
সসীমের সীমানায়।
অনন্ত যদি হাত বাড়ায়, ছুঁয়ে থেকো।

রাধা

সুদীপ্ত মাজি

খুলে রাখা জড়োয়ায় ভরে থাকা স্মৃতি আর
দিক ভরে দেওয়া দীর্ঘশ্বাস
চোখের ওপর থেকে খুলে রাখা চশমা আর
নির্জন স্টেশন, গান, নিরুপম চৈত্রের বাতাস
দুঃখের তোরঙ্গ থেকে জেগে ওঠা সুর আর
ছেড়ে দেওয়া শেষ ট্রেন, হাসি
কবে ডেকেছিল শ্যাম, অমল দুঃখের দিনে
বেজেছিল সর্বনাশা বাঁশি

এই অস্থিরতা
রাজীব কর

ডুবে দ্যাখো
গভীরে জল কিন্তু শান্ত
ওপর মহলে যত উচ্ছ্বাস উদ্বেলতা
মৃত ফড়িঙের মতো খড়কুটো।
নিবিড়ে শায়িত বুদ্ধোপম প্রশান্তি

অস্থির হয়ো না
কবে ঝড় থামবে, পৃথিবী স্থিতু হবে
তারপর প্রবাল খুঁজতে যাব ?
সে বড়ো অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ
তারচেয়ে বরং শ্বাসে শ্বাস চেপে একবার
তলদেশ ছুঁয়ে আসি চলো

মৃত্যু
জয়ন্ত মিস্ত্রী

দুঃখ শব্দানুসারী নয়,
মর্মের ভিতরে সে বেদনা ছড়ায়।
তিলে তিলে সূচিমুখে
রক্তে বিষ গোপনে মেশায়।
কুরে খায় স্বপ্ন আশা একদিন,
হাসি মুখে চলে যায়
কেউ কি জেনেছে তারে ?
জীবন তো অজানাই হয়!

অবমানবের পটভূমি
সুব্রত মিত্র

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়া পাখিদের কথা জানতে চায়নি কেউ
আমাদের স্মরণ আমাদের মরণ মানতে চায়নি কেউ
আখের গোছানোর দলে ছুটে ছুটে গেছে তারা
ছুটে ছুটে গেছে তারা কুকুরের মত------
রসটুকু চেটেপুটে খাবে যারা।

অভুক্ত পথিকের সাথে থাকো নাই কেহ
কোন রেখা উঠবে জাগি আমারো লাগি
কোন রেখা অস্তমিত হয় হয়ে জাগ্রত মৃতদেহ।
অভিলাষ মৌনতা গ্রাস করে চেতনাকে
চেতনার বিগ্রহে বিনিদ্র নিকেতন প্রাণশূন্য দাবদাহে,
ধুমকেতুর রচনায় আমিও ছিলাম এক সৈনিক
আমিও ছিলাম রুটিন মাফিক তোমাদের শ্রমিক দৈনিক।

ভুলে গেছো সময়টা, ভুলে গেছো; সেই কাল
অবমানবের বিদায় ঘন্টা বাজবে
আসবে গোধূলি লগনের প্রাক্কালের সেই সোনালী বৈকাল,
ভালো থেকো প্রতিপক্ষ; ভালো থেকো প্রতি লক্ষ্য
ভালো থেকো সমকক্ষ; ভালো থেকো ধৃতরাষ্ট্র
তোমাদের শুভ কামনায় আমি আজও বেঁচে আছি, হইনি অভিনষ্ট।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

জেগে আছে ভোর
পার্থ সরকার

জেগে আছে ভোর
সাক্ষাতের পূর্ব মুহূর্তে,
গ্রহণ পর্ব শেষ

চাঁদ অনিকেত

কেটে যায় দাগ সম্ভাবনার ছেঁড়া সুতোয়

জাদুকর নিস্তরঙ্গ

তবু একদিন দিন ভোর হয়
সাফল্য ভেঙে জল দেয় অমৃত
পরিশ্রমের অংকভাঙা সিঁড়ি
দাঁড়িয়ে অস্ফুট দরজায় কোণঠাসা ঘর

গ্রহণ পর্ব শেষ
নেমে আসে ভোর
গর্ভসঞ্চারের পূর্ব মুহূর্তে।

ক্ষত-বিক্ষত
অজিত ভড়

কখন যে আঁচ কেটেছি—বুঝতেই পারিনি
পাতাটা তো সাদাই ছিল
চাঁপা ফুলের গন্ধে ম' ম' করছিল টেবিল
সকাল ছিল—দুপুর ছিল
কখন যে আঁচ কেটেছি—বুঝতেই পারিনি

কিছু অ-আ-ক-খ এলেমেলো বসিয়েছি
আঁচড় কেটেছি তোমার ঊরুতে, নাভিতে বুকে
আর সেই মর্মান্তিক বালুকাবেলায়

তুমি বললে—একেই বলে নক্ষত্র
যতো পাতা ওল্টাবে, ততো জ্বলজ্বল করবে

কলমের ডগেও যে এতো কলমীশাক থাকে
বুঝতে পারিনি—

খাক
ধ্রুব দে

ঠিক ঠিক রেগে উঠতে পারিনি তাই
খাক হয়ে যাই

বাস-ট্রামে বাজার-দোকানে
চিৎকারে ঝালাপালা শাসন করে অবিরত
হেঁটমুণ্ডু
মিশে থাকি নির্বিবাদে

আমারও রাগ হয় ভীষণ
চিত হয়ে পড়ে থাকি মাথায় সূর্য
আরও কিছু আত্মঘাত
আছে প্রবঞ্চনা—

হেরে যাওয়া মানুষ
ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য

ভেজা পাথরের ওপর যেমন শ্যাওলা
পড়ে
ঠিক তেমনি ভেজা কাগজের ওপর
শ্যাওলা পড়েছে

মেঘের কাছে ছায়া চাইতে গিয়েছিলাম
মেঘ ফিরিয়ে দিল
অরণ্যের কাছে আশ্রয় চাইতে
গিয়েছিলাম
অরণ্য ফিরিয়ে দিল
বৃষ্টির কাছে ভিজতে গিয়েছিলাম
বৃষ্টি ফিরিয়ে দিল
নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলাম
নদী ফিরিয়ে দিল।

আর কিছু নয় -
আমি একজন, হেরে যাওয়া মানুষ।

আবার ফুটেছে গোলাপ

নির্মল সামন্ত

মনে নেই কিভাবে ভালোবাসতে হয় ফাগুনের বাতাস ছুঁয়ে ....
মনে নেই।
মনে নেই
কিভাবে পদ্মের পাপড়ি ছোঁয়াবো শরতের ঠোঁটে শিশিরের ফোঁটা দিয়ে।

এতদিন পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছি মাটির পৃথিবীজুড়ে
দুহাতে জড়িয়ে ধরেছি বাসন্তী বাতাস,
কখনো ভাবিনি কোভিডে-পোড়া ছাইয়ের স্তূপে
ধূমায়িত হবে বুকের হৃদয়,
উঁকি দেবে না কোনোদিন আমার অনুজ বংশধর প্রজাপতির অমলিন ডানায় .....
ভাবিনি কোনোদিন।
ভাবিনি কোনোদিন
তুলবে না মুখ ময়ূরের মতো অযুতসংখ্য কিশোরী সূর্যের সকালে।

ক্ষণকালের মৃত্যুছোবল দিয়ে ঝড় তো থামবেই,
মরুভূমিও শীতল হবে গুটিগুটি পায়ে রাত্রিকে দেখা পেলে ....

ভুল করে ভাবিনি অনেককিছুই
শিউলি-ভোর পৃথিবী আবার মেলেছে দেখো চোখ
আবার ফুটেছে দেখো গোলাপের কুঁড়ি উঠোনের চারাগাছে,
আমার বংশধর খেলা করে সেখানে
'উন্ডস অব লাভ'-এর সবুজবার্তা নিয়ে।

অঙ্কুরিত ছোলা

নবকুমার পাড়ুই

অঙ্কুরিত ছোলাগুলোর কলা বেরুবে সেই
মা নেওটা ছালগুলো
বউ ভেড়ুয়া দই।
যতই তুমি রাখবে ঢেকে
পলো চাপা লেটা-শোলকে
মেঘ আড়ালে টুকি খেলে চাঁদ,
চুলকে ছিঁড়ে রক্তপাতে
আরাম খোঁজে দাদ।
যে বয়সে যে ধর্ম
সেই পগারেই জল বাহিত খৈ
ফুল ফোটে, আর সুখ খুঁটে খায়
পাঁচিলের বুকে নই।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

হাঁটতে হাঁটতে

সৌরভ চট্টোপাধ্যায়

হাঁটতে হাঁটতে কত পথ পার হ'লে তুমি
তোমার বাড়ি থেকে হোস্টেল মাঠ কতদূর! ঐখানে
রোদ্দুর ভোর ভোর পরিযায়ী পাখি দেখে
পাখিদের ডানা আছে উড়ে যায় এদেশ ওদেশ
আসলে আকাশ তো একটাই
যেভাবে ভাঙতে পারো তুমি ভূগোল বইখাতায়
হাঁটতে হাঁটতে তুমি হোস্টেল বা রেলগেট পার হও
ক্লান্তিহীন স্বপ্ন ওড়াও, আমাদের চোখে
স্বপ্ন তো একটাই যেভাবে ভাবতে পারো যে
কতপথ পার হলে সম্পর্ক বন্ধুত্বে এসে মেশে
হাঁটতে হাঁটতে কতখানি পথ পার হলে
চেনা লাগে সবকিছু মনে হয় নিজস্ব আকাশ।

আর্শীবাদ

বিমান কুমার দত্ত

সহসা আকাশের পানসী বেয়ে
প্রকৃতির বুকে নামে ধূপছায়া অন্ধকার
মা গরদের শাড়ি পরে
তুলসীতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বেলে দেন
বেজে ওঠে মঙ্গল শঙ্খ।

তারপর ঘরে সুরেলা কণ্ঠে
মা লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠ
এক সময় মা ডেকে বল্লেন, আয় খোকা
মা লক্ষ্মীর চরণ দুটো তোর মাথায়
ছুঁইয়ে দিই।

ঘুমের গভীরে

স্নেহাংশু বিকাশ দাস

ঘুমের গভীরে পুরনো জনপদ আসে
পাখি নেই, অচেনা মাটি
মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে

অন্ধ ভিখারীর গানে বৃষ্টি পড়ে
ক্ষীণকায় নদীটির স্রোত
ঢুকে পড়ে নাভির ভেতরে

এখনও ভোরের শরীরে
কবেকার মলিন কুয়াশা

আশ্চর্য ঝরে পড়ে

পথ নেই
ঘরবাড়ি মুছে গেছে

ঘুমের গভীরে পুরনো জনপদ
জেগে বসে আছে
সে নিজের ভেতরে পাখিদের
ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পায়

গালাগাল

নীহার জয়ধর

চাঁদের সঙ্গে পোদের কুবাদ তুমি তৈরি করে
চালাক হতে পারো
আমি কিন্তু বিয়েবাড়িতে ছবি তুলতে
সেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম
যে, খুব গভীর মনোযোগে মন্ত্র শুনছিল।
অর্ধশিক্ষিত পুরোহিত,
লক্ষ্মীদেবী, সরস্বতীদেবীর সঙ্গে শ্রীদেবীকে চালিয়ে দেয় কিনা
এবং আগুনের সামনে স্বহাঃ বা সাহা.....
সুতরাং আমাকে বাঞ্চোৎ বলে
হেসে গড়িয়ে পড়ার আগে
দেখে নেবে কেউ খেতে বসেনি তো.....
অনেকে এখনও বাসী মুখে চুমু খেতে পছন্দ করেনা।

কবিতার জন্য

নির্মল করণ

কবি হয়ে ওঠার মেধা আছে—
এমন দাবি করতেও কাউকে দেখিনি কখনো।
তবু—
একটি কবিতা সৃষ্টির জন্য আকুতির অন্ত নেই !

ধ্যানমগ্ন নির্জলা পাহাড় কি ভাবে গায়ে তার
লেখা হবে স্রোতস্বিনীর জন্মকথা ?
নীল আকাশ কি কখনো ভাবত —
দুপুরবেলায় নীল উঠোনে বসবে ওই মেঘেদের মেলা ?
বহমান বাতাস কি জানত—
বাঁশি সুর তুলে দেবে পাতায় পাতায় ?

শুভম

তাপস কুমার কোলে

স্কুলে তার দুষ্টুমিটা দেখার মতন,
স্কুলে ঢুকলে সে পায় যেন অন্য ভুবন।
সব সময় সে চলতে চায় নিজের ইচ্ছায়,
চলতে চায় না একদম সে গুরুর কথায়।
টিফিন টাইমে দেখি তার বাজি ধরা,
হেরে গেলেই কান্নাকাটি আর ঝগড়া করা।
খেলাধুলায় সে বরাবরই ভালো,
অনেকবারও স্কুলের হয়ে পুরস্কার পেলো।
বাবা ব'লে বসাতে হয় পড়ার টেবিলে,
না হলে যে দিনরাত যেন অচল ধরাতলে।
ভালো ফল তো আসবে জানি দিনের শেষে,
সত্যিকারের মানুষ হবে ও সময়ে অবশেষে।

নদীর কাছে

স্বপন নন্দী

ক্রমশ রোগা হয়ে যাচ্ছে নদীটা
ক্রমশ হারাচ্ছে যৌবন
আবাল্য প্রণয়ে আমি তার শেষ পাণিপ্রার্থী
তাই তৃষিত বসে থাকা চাপল্যহীন তীরে
আরক্তিম গোধুলি, তোমাকে বলি
আজ আমাদের বিবাহতিথি
এতো যে অথির স্পর্শ-উন্মুখ
নদী বাড়াল না হাত

সহবাসে চেয়েছি মৈথুনে চেয়েছি
এই তার পরবাস তার !

জিজ্ঞাসা ছিল তীরকে, তরীকে, নদী—বালি কাকে
তারা কেউই জানে না অবগাহন আস্বাদ
শুধু শরীর ভিজিয়ে জলে
খুলে রেখেছে নূপুর
নিক্কণের কোনো রাগ কাউকে শোনাবে না

বিষণ্ণ তরী ফিরে যায়
তীর থেকে কোনো সংগীত ভেসে আসে না।

জন্মঋণ

সৌগত প্রধান

সকাল থেকেই ছোট্ট ছোট্ট খুনসুটি আর
মাঝবয়সী জানালায় লুকোচুরি
এ নিয়েই তো উপোসী জীবন।

এই জীবন মানে পাখিডাকা ভোর নয়
জীবন মানে পরিযায়ী নিমন্ত্রণ
এসব দেখে নিজেকে কপিলাবস্তু মনে হয়।

যার বামহাতে ধরা থাকে জন্মঋণ
আর দু'চোখে নগ্ন যতিচিহ্ন এঁকে নিয়ে
সোজা হেঁটে যায় বিষুবরেখায়।

শুধু বৃদ্ধাশ্রমগুলি ঝুলে থাকে পলাশীবারান্দায় ...

চাইনি এমন

তপন কোলে

চাইনি তো এই সহজ উন্মোচন
ধ্বংস-দিনে পদ্য দিয়ে লেখা
চাইনি এমন প্রীতির প্রকাশ
ছড়িয়ে দেবে বিষাদ বলিরেখা।

দাওনি এমন সহজ শর্তখানি
ছুঁয়ে দিলে পাথর হবে জল
চাইনি তো এই সরল সমর্পণ
তারচে ভালো বিষাক্ত ছোবল।

তিনি চৈতন্য -১৭

সুনেন্দু পাত্র

নিম্ন প্রবাহের মতো পড়ে আছে এক দীর্ঘদেহী ছায়া।
হাতে পায়ে মগ্নতার শৃংখল। কিভাবে যন্ত্রণা অতিক্রম করবেন
তিনি কিভাবে ফুটে উঠবেন এই ঘূর্ণীর ওপর!

সমস্ত লোভ নেমে এসেছে রাস্তায় সমাধানের স্রোত গুটিয়ে
নিচ্ছে পুচ্ছ তবুও তিনি হাঁটছেন আমাদের
অনুভূতির ভেতর ইন্দ্রিয়ের ভেতর।

চারিদিকে অগাধ মেঘ, বৃষ্টির কলরব এবার চোখ খুলে দাও
প্রভু ভোর যে বসে আছে রাস্তায়।

ব্রহ্মধ্বনি

তাজিমুর রহমান

যে ছেলেটি প্রতিদিন ঘুমোতে যাবার আগে
অসুস্থ মায়ের পথ্য নিয়ে ভাবতে গিয়ে নিঃস্ব হয়
কিংবা যে অন্ধ যুগল বৃষ্টির গান গাইবেন বলে
মেট্রো শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান নিবিড় ছন্দে
তাদের সকলের জন্য স্বাধীনতার ৭৫ উৎসব হয়ে উঠুক
আর বাকি যেটুকু কথন ক্যাপসন হয়ে ভেসে ওঠে
মনিটরের পর্দায়
তার ভেতরে এখন ঘোলা জলের তান
ওৎ পেতে থাকা রসনা বিলাস, সুশীতল সমাচার

অথচ আমাদের ভেতরে তো নীরবে ঘুমিয়ে রয়েছে মাস্টারদা
আর জুবেদা খাতুনের ভাই,
লালকেল্লা থেকে উড়ন্ত ত্রিনেত্র সে কথা জানে বলে
মধ্যগগনেও তীব্র হয়ে ওঠে উজানভাটির ঢেউ

ঢেউ সরালেই নিবিড় ছাপিয়ে ওঠে সীমানাহীন প্রলয়,
পথে পথে ব্রহ্মধ্বনি...

মেঘদূতের বদলে

অংশুমান কর

মেঘ যে সবসময় থাকবেই তার নিশ্চয়তা কী?
মেঘকে বলে কোনো লাভই নেই।
বালিতে লিখেও হবে না কিছুই।
বালি তো নিজে নিজে যেতে পারবে না কোথাও।
জল থাকে সারা বছর ঠিক
কিন্তু বাধা পেলেই থেমেও যায়;
চঞ্চল, কিন্তু অবাধগতি সে নয়।
কী লাভ জলকে বলে?
বরং
হাওয়াতে আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে লিখি,
মন খারাপ করছে মিমি দিদিমণি।

হাওয়া তোমাকে এই খবর পৌঁছে দেবে ঠিক।

তাই তোমার আনন্দ

শুভম চক্রবর্তী

বৃষ্টির ভেতর কাঁপছে ঝাউগাছ। সবজি
চলে এসেছে বাজারে। হালকা গুঞ্জরন
আসে দূর থেকে ভেসে। এবার কে হারে।
এতই ছড়ালে যদি আরও কিছু নগন্য ছড়াও।
উঞ্ছবৃত্তি করে বাঁচি। এই তো উঠেছে
রোদ পথে। কয়লা ছেঁচার শব্দ। ঝুলকালি
মাখা কত হাত। ধোয়া হয় তারপর
রান্নাঘর ভরে ওঠে পেটভরা সুগন্ধী ধোঁয়ায়।
এবার কে হারে। আর এবার কে
এক হতে চায়। ছ্যাতানো চালের শ্যাওলা,
জলে ভেজা পাখি ডানা ঝাড়ে।
খুশিতে উঠছে কেঁপে ভেতরের পাখি
দিনমানে। আমি না থাকলে নাকি
সব প্রেম মিছে হয়ে যেত, সবাই তা বলে,
আর আমিও কিছুটা বুঝি শুধু অনুমানে।

সম্পৃক্ত

হাসি বসু

একটি ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর পাইনা,
কেনো, কবে, কোথায়, পথ হারাই বুঝিনা,
না বোঝা না জানার দোলাচলে দিন যায়,
অদৃশ্য ঝড়ে সভয়ে পা মেলাতে যাই,
সেই প্রবল হওয়া মন উদাস করে,
শত আলোকবর্ষ দূরে আলোকবিন্দু খুঁজি,
শুকতারা, সন্ধ্যতারা না সপ্তর্ষিমণ্ডল জানিনা।
আকাশে বাতাসে এক বিপুল শূন্যতা,
অজস্র আশা আকাঙ্ক্ষা মাথা নোয়ায়,
একাগ্রতায় জীবনের ছবি আঁকি,
যে কাঠিন্য পদে পদে গাঁথা ছিল,
তাকে বোঝার চেষ্টা অমূলক,
সাধারণ মেয়ের অসাধারণ হওয়া ব্যর্থতায় ঢাকা,
শেষ পর্যায়ে এসে সেই উপলব্ধি সম্পৃক্ত হয়।

গল্প

উন্মুখ

অনিন্দিতা গোস্বামী

মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। লিকপিক করছে দুটি সবুজ পাতা সহ এতোটুকু অংকুর। রমাকান্তের চোখ গেল বাগানের দক্ষিণ কোণে। ঝুঁকে পড়লেন। তাই তো! এ গাছ তো তিনি খেয়াল করেননি আগে। নাহ, চিনতে পারছেন না। অচেনা গাছ, তিনি লাগান নি, তবে কি গজা লাগালো? জিজ্ঞাসা করতে হবে। তার অচেনা গাছ এই অঞ্চলে নেই বিশেষ, তিনি বহু গাছগাছালি চেনেন। এমনকি আগাছাও। কিন্তু এ গাছ আগাছা বলে উপড়ে ফেলার মত নয়, এর বেড়ে ওঠার মধ্যে কেমন যেন একটা স্পর্ধা আছে। সজীব, চকচকে। চিন্তান্বিত হয়ে তিনি বাগানের অন্য কাজে মন দিলেন।

বাগান করা তার নেশা। সকাল-সন্ধে হাজার কাজের মধ্যেও তিনি ঠিক বাগানে নামবেন। মাটি নিড়াবেন, আঙুলের চাপে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবেন মাটির ঢেলা, জল দেবেন, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন সার। দুর্বল গাছের গোড়ায় কাঠি গুঁজে দেবেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখবেন পাতায় পোকা লাগলো কিনা, কুঁড়িতে পিঁপড়ে হলো কিনা। নিজে হাতে চারা কিনে আনেন, ফুল, ফল, সবজী। মালী একজন আছে ঠিকই কিন্তু বেশিরভাগ কাজই করেন নিজে। তাই তিনি একটু বেশি রকমেরই অবাক হলেন। তার বাগানের কোণে কি গাছ গজালো তিনি জানতে পারলেন না! সারাদিনই তাকে আনমনা করে রাখলো ব্যাপারটা। গজার সেদিন ছুটি, তাকে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত শান্তি নেই।

বিকেলের দিকে তিনি একটু বাজারে বেরোলেন। যাবার পথে রাস্তার মোড়ে তার চোখ আটকে গেল। এ পথে নিত্য যাতায়াত। কিন্তু রাস্তার পাশে গজিয়ে ওঠা এই গাছটাকে তো তিনি আগে কখনও খেয়াল করেননি! পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন গাছটার দিকে। তার ভুরু কুঁচকে গেল। একই গাছ কি! হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে! পাতার আকৃতি, গড়ন, রং দেখে যেন তেমনই লাগছে! তবে যেহেতু এখনও অনেক ছোট তাই সঠিক করে অত বোঝা যাচ্ছে না। অচেনা কিছু মানেই উদ্বেগের কারণ, রমাকান্তও তার থেকে বেরোতে পারলেন না। তবে অদ্ভুতভাবে একটা আকর্ষণও বোধ করলেন। তার মনে হলো চারাগাছটিকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। তার বাগানে চারাটিতো সুরক্ষিত কিন্তু এই রাস্তার পাশের চারাটিকে রক্ষা করা দরকার, না হলে ছাগল-গরু মুড়িয়ে ফেলতে পারে। এমনকি মানুষের পায়ের তলায় চাপা পড়ে যেতে পারে।

পরদিন গজা বাগানের কাজ করতে এলে প্রথমেই তিনি শুধালেন গাছটির কথা। মাথা নাড়লো গজা, বলল এতদিন মালীর কাজ করছি কিন্তু এ গাছ তো দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না বাবু। এ ভিনদেশী গাছ। কত পাখি মুখে করে কত কিছু এনে ফেলে। বাড়ছে যখন থাক, দেখাই যাক না কেমন ধারা ডালপালা ছড়ায়।

রমাকান্ত বললেন, বেশ, তুই এক কাজ কর, রাস্তার পাশে গাছটাকে একটু ঘিরে দিয়ে আয়।

গজা বলল যে গাছ রাস্তার পাশে গজিয়েছে তা ওমনিই টিকে যাবে, আপনারে ঘিরতে হবে না।

রমাকান্ত বললেন, না থাক তাও তুই যা।

ঘরে ফিরে তিনি একটা ইমেইল করতে বসলেন। কম্পিউটারের তিনি বিশেষ কিছু জানেন না তবে হাতে লিখে চিঠি স্ক্যান করে মেইল করতে পারেন। তিনি চিঠি লিখলেন তার এক পুরনো ছাত্রকে। যে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা করছে উদ্ভিদবিদ্যার ওপরে। লিখলেন, এক অদ্ভুত গাছের সন্ধান পেয়েছি তুমি চাইলে এসে দেখে যেতে পারো। আর গাছটার নামও যদি বলতে পারো খুব ভালো হয়, চাইলে আমি গাছটার ছবি তুলেও তোমাকে পাঠাতে পারি। তবে সে ক্ষেত্রে তোমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এখনো গাছটা খুবই ছোট। অনেক সময় অনেক চেনা গাছও ছোটবেলায় অচেনা লাগে। তার ব্যস্ত ছাত্র কবে সে চিঠির উত্তর দেবে তার ঠিক নেই তবে তিনি মনে মনে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন এই ভেবে যে খুব শিগগিরই তিনি গাছটার পরিচয় বের করে ফেলতে পারবেন।

কিছুদিন হলো এলাকা ফের উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। বাতাসে উড়ছিল কানাঘুষো নানা খবর। ফলে গাছের চিন্তাটা ধামাচাপা পড়ে গেল। তার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তা হচ্ছিল রমাকান্তর স্থানীয় মানুষজনদের নিয়ে। তিনি ঘরপোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরান। শুধু তিনি কেন, এলাকার প্রায় সকলেই। রমাকান্ত ভেবে উঠতে পারছিলেন না ঠিক কোন ভূমিকাটা এখন নেয়া উচিত তার। না, পূর্বের মত ভুল আর তিনি করতে চান না। যদিও তিনি এক সময় ভাবতেন আর কখনো কোনো কিছুর মধ্যে থাকবেন না। মন যেন সন্ন্যাস চাইতো। এক স্থায়ী অবসাদ গ্রাস করে রেখেছিল তাকে। তবুও ওই স্বভাব যায় না মলে। মানুষ বিপদে পড়লে পাশে না দাঁড়িয়ে তিনি পারেন না। দীনবন্ধু এসে যখন বলল মাস্টার আপনারে খুব দরকার এখন আমাদের তখন তাকে ফিরিয়ে দিতে পারেননি তিনি। খুব মন দিয়েই শুনেছিলেন তাদের সমস্যা আর পূর্ববৎ উতলা হয়ে উঠেছিলেন। যাবো না, যাবো না, করেও ফের গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মাঠের মাঝখানে। বিপদ হতে পারে জেনেও দুই হাত চেপে ধরেছিলেন দীনবন্ধুর। বলেছিলেন ধৈর্য রাখ। খুব মেপে পা ফেলতে হবে আমাদের এবার। রমাকান্তর কথায় সকলে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের চোখে-মুখে ছিল প্রত্যয় মাস্টারই আমাদের সঠিক পথ দেখাবে। এই অসহায় মানুষগুলোর বিশ্বাসের ভার অনেক। সেই ভার বহন করার মতো শক্তি ও বুঝি আর নেই তার। তবু তিনি ফেলতে পারেননি এদের।

আজ থেকে নয় রমাকান্তকে এই গাঁয়ের মানুষ শ্রদ্ধা ভক্তি করে প্রায় ঐ হাইস্কুলের জন্ম লগ্ন থেকেই। তখন নতুন ইস্কুল সবে তৈরি হয়েছে। ওই ইস্কুলের হেডমাস্টার হয়ে এই গ্রামে এসেছিলেন তিনি। স্কুলের পাশেই জমি কিনে বাড়ি করেছিলেন তারপর সারাটা জীবনই তার কেটে গেল এই ইস্কুল আর এলাকার মানুষজনকে নিয়ে। কতো ছাত্রকে মানুষ করেছেন! শুধু তাই নয় তাদের সুখে-দুখে পাশে থেকেছেন, পরিবারের খোঁজখবর নিয়েছেন, এখানে

বেশিরভাগই দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান সব। কারো নিজের একখণ্ড জমি আছে তো কেউ ভাগ চাষ করেন। বেশিরভাগই প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ বাস করেন। আধুনিক চাষবাসের হাল-হকিকতও জানা নেই কারো। উন্নত ধানবীজ, সার ইত্যাদি কেনার মত সামর্থ্যও নেই সবার। আর ট্র্যাক্টর,স্যালো, সেসব তো আরো চাপের। কিভাবে লোন তোলা যায়, কিভাবে মাঠে জল আনা যায়, এসব পরামর্শ নিতেই তারা ছুটতেন মাস্টারবাবুর কাছে। রমাকান্ত সাধ্যমত বাতলে দিতেন পথ। তার একটাই স্বপ্ন এলাকার উন্নতি। বাচ্চাগুলোর যেন অর্থের অভাবে পড়াশোনা বন্ধ না হয়।

তারপর কি থেকে কি হয়ে গেল। সেসব বহুযুগ আগের কথা। এলাকার বিধায়ক ননী বিশ্বাস সেদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন রমাকান্ত কে। মাস্টারমশাই বসুন, কথা আছে। রমাকান্ত জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো সংস্রব ছিল না।

ননী বললেন, এলাকার মানুষ চাষবাস করে আর কপয়সা পায় বলুন!

রমাকান্ত মাথা নাড়লেন, সেই, তবে এ ছাড়া আর কী বা করতে পারেন তারা।

টেবিলের উল্টো দিকে বসা ননী মাথাটা এগিয়ে এনেছিলেন, পারে মাস্টারমশাই পারে। আর সেই জন্যই তো আপনাকে এখানে ডেকেছি।

রমাকান্ত বললেন, কী রকম?

ননী বললেন, ওপর মহল থেকে খবর এসেছে এ জায়গায় একটা বড় কারখানা তৈরি হতে পারে। ভাবতে পারছেন মাস্টারমশায় একটা কারখানা তৈরি হলে জায়গাটা কোথায় চলে যাবে! কোনো মানুষের আর কোনো কষ্ট থাকবে না। ঘরে ঘরে চাকরি।

বিস্ফারিত চোখে ননী বিশ্বাসের কথাগুলো শুনছিলেন তিনি। এও কি সত্যি! রমাকান্ত যে কী দুঃখ পেতেন তার মেধাবী ছাত্রগুলো কাজের অভাবে, রুজি-রোজগারের অভাবে ওই চাষের জমিতেই হাল ধরত, উপায়ন্তর না দেখে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতো। একটা কারখানা মানে তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা আরো নানান আয়োজন। সত্যিই তো বেঁচে যাবে পরিবারগুলো। তিনি বললেন, বেশ তো, সে তো খুব ভালো কথা।

ননী বিশ্বাস বললেন, ভালো তো বটেই মাস্টারমশাই কিন্তু মানুষগুলো বুঝলে হয়। আমি টুকটাক কথা বলে যা বুঝেছি এরা খুব একটা রাজি নয়। আপনার কথা গাঁয়ের লোক খুব মানে। আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন সবাইকে বুঝাতে।

ঘাড় নাড়লেন রমাকান্ত, বেশ আমি বুঝাবো। তবে গরিব মানুষগুলো জমির দাম পাবে তো? সরকার তার দায়িত্ব না নিলে পুঁজিপতিদের আচরণের ওপর আমার ভরসা নেই। আর আমার আদর্শেরও তা পরিপন্থী।

ননী বিশ্বাস বললেন, না না মাস্টারমশাই, সরকার মধ্যস্থতা করবে বলেই তো বড় মুখ করে আপনাকে দায়িত্ব দিচ্ছি।

সেদিন দায়িত্বে সম্মত হয়ে ফিরে এসেছিলেন রমাকান্ত। তারপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে লেগে পড়েছিলেন জনসমর্থন আদায়ের কাজে। সকলকে বোঝাতে শুরু করেছিলেন শিল্প-কারখানার

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

কতখানি প্রয়োজনীয়তা এ অঞ্চলে। সফল হয়েছিলেন তিনি। বেশিরভাগ মানুষকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছিলেন প্রয়োজনে জমি ছেড়ে দিতে। সরকারের সঙ্গে লগ্নিকারী সংস্থার কথাবার্তাও অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। কিছু অংশে কাজ শুরুই হয়ে গিয়েছিল এক প্রকারে। সরকারের কাছে আস্থা বেড়েছিল রমাকান্তর। দলের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের ঘনঘন ডাক পড়ছিল তার। জমির দাম নির্ধারণ, বিলিবন্টন, সব কাজেই সরকারপক্ষ ভরসা করছিলেন রমাকান্তকে।

কিন্তু হঠাৎ করেই রমাকান্ত লক্ষ্য করলেন হিসেব-নিকেশ সব যেন পাল্টে যাচ্ছে। প্রায় রাজি হয়ে যাওয়া চাষীরাও জমির দাম হাঁকছে বেশি করে। রমাকান্তের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে তাদের উষ্মা। রমাকান্ত যেন ইচ্ছে করে বুঝিয়ে বাজিয়ে তাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিচ্ছেন। তিনি টের পেলেন একজন একজন করে বেশিরভাগ চাষীরাই বেঁকে বসছে জমি দিতে। স্থানীয় মানুষজনদের রাতারাতি এমন ভোলবদল বিস্মিত করছিল তাকে।

সরকারপক্ষ ডেকে পাঠালেন রমাকান্তকে। জিজ্ঞাসা করলেন কেন এমন ঘোরালো হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। রমাকান্ত সঠিক করে কিছুই বলতে পারলেন না। তারা দু দিক থেকে চাপ দিতে লাগলেন রমাকান্তকে। কাজ এতদূর এগিয়ে গিয়েছে, ইট কাঠ, চুন-সুরকি, বালি, কংক্রিটের স্ল্যাব সবকিছু ফেলা হয়ে গিয়েছে, দিশাহারা অবস্থা তখন সরকার এবং মালিকপক্ষ সবার। ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়ে উঠল জনতার রোষ। রমাকান্ত অবাক হয়ে দেখলেন সেই আন্দোলনরত জনতার পুরোভাগে ননী বিশ্বাস!

রমাকান্ত পাগলের মত বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন এমন সর্বনাশা খেলায় তোমরা মেতো না। যাদের জমিতে ইতিমধ্যে কারখানা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে তারা যে পথে বসবে! এই এলাকাটাও ডুবে যাবে চির অন্ধকারে। কিন্তু সে কথা কেউ শুনল না। সরকার বিরোধী শক্তি এসে যোগ দিলো আন্দোলনে। দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল সেই আন্দোলনের কথা। রমাকান্ত প্রতিপন্ন হলেন একজন কৃষক বিরোধী নেতা হিসেবে। যিনি গরিবের অন্ন কেড়ে খাওয়ার চক্রান্তে শামিল! হায়রে অদৃষ্ট, এও দেখবার জন্য বেঁচে ছিলেন তিনি! অবসর গ্রহণের পরে ছেলেরা ডাকলেও এই গাঁ জমি ছেড়ে কোনদিন শহরে যাবার কথা ভাবেন নি। এই সব তাঁর প্রাণের প্রিয় মানুষগুলোর কাছ থেকে এই প্রতিদান পাবেন বলে!

এরপরই ঘটল চূড়ান্ত ঘটনা। একদিন কারখানার লোহালক্কর বোঝাই দুটো গাড়িকে আটকে যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছে কিছু মানুষ তখন কোথা থেকে এক ভ্যান পুলিশ এসে বাতাসে কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে আবার মিলিয়ে গেল কোথায়। বাতাস থেকে আর মানুষের বুকের দূরত্ব কতটুকু! দেখা গেল মারা গিয়েছেন দুজন কৃষক। ব্যাস, হু হু করে আগুন ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। রমাকান্ত লক্ষ্য করলেন সাধারণ গরিবগুর্বো মানুষগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ালেন বিশ্বের বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তি। বড় বিপন্ন বোধ করছিলেন রমাকান্ত। ক্ষমতা বদল আসন্ন বুঝতে পারছিলেন। সেদিন একমাত্র কৃষক নেতা দীনবন্ধু এসে দাঁড়িয়েছিল রমাকান্তর পাশে, বলেছিল মাস্টারমশাই আপনি এসবের মধ্যে থেকে সরে যান নাহলে ওরা আপনাকে মেরে দেবে। এখন আমাদের দলের বেশির ভাগ মানুষই যে ওদের দলে। কে যে কাকে তাক করে গুলি ছুঁড়ছে আপনি ধরতে পারবেন না।

সত্যিই বদল হলো সরকারের। ননী বিশ্বাস অধিক ক্ষমতা পেয়ে চলে গেলেন শহরে। যে সব চাষের জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তারা সরকার থেকে পেল সামান্য ভাতা। এলাকার কোনো বদল হলো না, না হল সেখানে কারখানা না তারা পেল কোন উন্নততর জীবনের সুযোগ। রমাকান্ত সবরকম সামাজিক কাজকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে ছাত্র পড়ানো আর বাগান করা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন। বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত কষ্ট রয়ে গেল শুধু। তিনি বুঝে পেলেন না সরকারের পুলিশ সেদিন খামোখা কেন মারতে গেল দুজন কৃষককে। তখন তো তারা বুঝে গিয়েছিল ওই অঞ্চলে কারখানা স্থাপন আর সম্ভব না।

কেটে গেলো দু দুটো দশক। সেদিনের ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো বড় হয়েছে আজ। একদিন তারা এসে ছেঁকে ধরল রমাকান্তকে। মাস্টারদাদু আমরা আজ সব বুঝতে পেরেছি। আমাদের মা-বাবারা সেদিন ভুল করেছিলো। ওরা তো অতো লেখাপড়া জানতো না তাই ওদের ভুল বোঝানো হয়েছিল। আসলে বিশ্বব্যাপী দুই শক্তিধর দেশের মধ্যে নীতির লড়াই। আমাদের এই গ্রামটুকু তার মধ্যে পড়ে গেছিল। কৃষক মজুর নওজোয়ান চল রে চল রে চল। তাদের কি কখনো দমিয়ে রাখা যায় বল মাস্টারদাদু? আমরা আবার লড়াই করব। কারখানাকে আমরা ফিরিয়ে আনব আমাদের মাটিতে। চকচক করে উঠল রমাকান্তের চোখ, বললেন তোদের দেখে আমার এই প্রত্যয় হচ্ছে তোরা পারবি। আমার আশীর্বাদ রইল তোদের সঙ্গে।

তারা বলল, না দাদু শুধু আশীর্বাদ দিলে হবে না তোমাকে থাকতে হবে আমাদের সঙ্গে।

রমাকান্ত হেসে বললেন, আমার কি আর সেই শক্তি আছে!

তারা বলল, তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না তুমি শুধু আমাদের মিছিলের আগে আগে হাঁটবে।

বেশ-বেশ আমি ভেবে দেখব, বলে আপাতত ছেলেমেয়েগুলোকে আশ্বস্ত করে বিদায় দিলেন রমাকান্ত।

আর তার ঠিক দু'দিন বাদেই বাগানের কোণে তার চোখে পড়ল নতুন চারা গাছটিকে।

একদিন রাতের অন্ধকারে দীনবন্ধু এলো। বললো আমাদের পুরনো নেতারা আবার যাতায়াত শুরু করেছে গ্রামে। আমাদের ছেলেমেয়েগুলোকে আবার খেপাচ্ছে। আমরা ওদের বিশ্বাস করিনা। ওরা কে কখন কোন দিকে পাল্টি খাবে। বন্দুকের নল যাদের ক্ষমতার উৎস তাদের কি কখনো বিশ্বাস করা যায়! ওরা পয়সার জন্য যখন তখন নীতি-আদর্শ বিক্রি করে দেয়। সেদিন পার্টির ওপরমহলে আপনার কদর বাড়ছিলো বলে ননী বিশ্বাস তলে তলে অন্যদের সঙ্গে হাত মিলালো, আমাদের ভুল বুঝালো, আজ আপনার কাছে এসব কথা স্বীকার করতে কোনো লজ্জা নেই আমার। মাঝখান থেকে দু দুটো প্রাণ চলে গেল। আমার ধারণা ননী বিশ্বাসই সেদিন গুলি চালানোর ব্যবস্থা করেছিল। আমাদের ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে যেন এই অন্যায় না হয়, আপনি এদের বোঝান মাস্টারমশাই।

গভীর চিন্তায় মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলেন রমাকান্ত।

ই-মেইলের উত্তর এসেছে রমাকান্তর কাছে। তার উদ্ভিদবিজ্ঞানী ছাত্রটি লিখেছে, মাস্টারমশাই

আপনার চিঠি পেয়ে ভালো লাগলো। গাছটি সম্পর্কে আমি খুবই আগ্রহ বোধ করছি। অনেকদিন দেশে ফেরা হয় না। ভাবছি একবার দেশ থেকেও ঘুরে আসব আর নিজে গিয়ে দেখে আসব আপনার গাছটিকে।

রমাকান্ত লিখলেন বেশ এসো। এর মধ্যে আরো কিছু গাছ এদিকে ওদিকে বেড়ে উঠেছে। এ গাছের বৃদ্ধি ও বেশ দ্রুত, ছড়িয়ে ও যাচ্ছে বেশ দ্রুত। এইভাবে কচুরিপানা ও একদিন ছড়িয়ে গিয়েছিল। পার্থেনিয়াম ও। গাছগুলো রাখব কি উপড়ে ফেলব এই দ্বন্দ্বে আছি। তোমার মতামত পেলে সিদ্ধান্ত নেব।

গাছগুলো ইতিমধ্যে বেশ ডালপালা মেলছে, সবুজ পাতায় ছেয়েছে। রমাকান্তর উদ্ভিদবিজ্ঞানী ছাত্র এলেন রমাকান্তের বাড়ির সেই গাছ দেখতে। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন গাছের ত্বক, ডালপালা, পাতা। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নীচে ফেলে পরীক্ষা করলেন পত্ররন্ধ্র থেকে কোষকলা, তারপর মাথা উঁচু করে বললেন চিনতে পেরেছি মাস্টারমশাই। সুদূর ভিয়েতনাম থেকে উড়তে উড়তে এসেছে এ গাছের বীজ। সেই ষাটের দশকে উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট গরিলা সেনারা বিরাট বনাঞ্চলে লুকিয়ে থেকে লড়াই করতেন প্রতিবেশী দেশ তথা ধনতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে। আপনার তো কিছুই অজানা নয় মাস্টারমশাই। সেসময় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী অপারেশন র‍্যাঞ্চ হ্যান্ড নামে এক অভিযান চালায়, আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই। যেখানে তারা বিমান থেকে ৪৫ লাখ একর জমিতে এজেন্ট অরেঞ্জ নামে এক বিষাক্ত রাসায়নিক ছড়িয়ে গেরিলাদের লুকিয়ে থাকার শেষ আশ্রয় সেই বনাঞ্চল নষ্ট করে দেয় ! প্রথমে গাছগুলোর পাতা ঝরে যায়, তারপর গাছগুলো মরে যায়। তাতে বাহিনীর উপর থেকে বোমাবর্ষণের আরও সুবিধা হয়ে যায়। এই সেই গাছ মাস্টারমশাই আবার এতদিন পরে নতুন করে বেঁচে উঠেছে আমাদের আশ্রয় দেবে বলে। আর কিছুদিন গেলে এরা আরো সংখ্যায় বাড়বে, তৈরি করবে ক্যানোপি, পাতার আচ্ছাদন।

আবেগে রমাকান্তের চোখের কোণে জল টলটল করে ওঠে, ছাত্রের দিকে ফিরে বলেন, সত্যি বলছো? কি নাম এই গাছের?

ছাত্রটি বলে সে যে নামই হোক মাস্টারমশাই গাছের নাম তো—হয় স্থানীয় মানুষজন দেয়, নয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী। আমি না হয় আজ এই গাছের নতুন একটা নাম দিলাম। গাছটার নাম দিলাম সত্য। সত্য মাটি ফুঁড়ে উঠেছে।

ছাত্রের হাত দুটো নিজের দুই হাত দিয়ে চেপে ধরলেন রমাকান্ত।

খাদির চাদর

রবীন বসু

‘কী মজা ! কী মজা ! আমরা কাল নতুন ফ্ল্যাটে যাব। নতুন ফ্ল্যাটে!’ ছোট তাতাই নাচতে নাচতে হাততালি দিয়ে ঘর বারান্দা করছে। ওর মা দৌড়ে গেল পিছন পিছন। ’ওরে, দাঁড়া। সবে ঘরমোছা হয়েছে, পড়ে যাবি।’

চা-টা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় রজত। আর বসে থাকলে চলবে না। কালই শিফট। বাঁধাছাঁদা শুরু করতে হবে। গতকাল ফাইনাল রেজিস্ট্রি হয়ে যাওয়ার পর ফ্ল্যাটের চাবি পায় সে। থ্রি বিএইচকে রেডি ফ্ল্যাট। প্রি-বুকিংয়ের ঝামেলায় যায়নি। ওতে অনেক হ্যাপা। সে সময়ও তার হাতে নেই। এদিকে ভাড়াবাড়ির মালিক বলে দিয়েছেন, এগ্রিমেন্ট আর বাড়াবেন না। সুদীপাও দৃঢ় অবিচল গলায় বলেছে, ‘তাতাইয়ের নতুন স্কুল শুরু হবে। আমার এবার ভাড়া নয়, নিজের ফ্ল্যাট চাই।’

অগত্যা সঞ্চয়ের কিছু আর ব্যাঙ্কলোন নিয়ে এই ফ্ল্যাটটা কিনেছে রজত। আগে থেকে অর্ডার করা দেয়াল জোড়া বড় সেগুন কাঠের ওয়ার্ডরোব, দুটো বক্স খাট, ডিভান, ড্রয়িংয়ের জন্য বড় সোফা গতকাল রেখে এসেছে। এখানে যে ফার্নিচার আছে, বইপত্র জামাকাপড় শীতের পোষাক ডাইনিং সেট রান্নাঘরের বাসন, বেশির ভাগটাই আজ বেঁধে ফেলতে হবে। একটু পরেই সেন্টার থেকে লোক আসবে। তারাই সব বাঁধাছাঁদা করবে। মা স্নান সেরে বের হতেই রজত বলল, ’তোমার ঠাকুর ঘরের সব জিনিস গুছিয়ে নিও। কারো তো হাত দিতে দেবে না। বিছানাপত্তর কাল সকালে লোক এসে বেঁধে লরিতে তুলবে। তুমি খেয়াল করে সব নিও। পরে আমায় দোষ দেবে না।’

‘না রে বাবা। দোষ দেব কেন। আমি খেয়াল করে সব গুছিয়ে নেব।’ সুধারানী ছেলেকে আশ্বস্ত করেন।

রজত এবার কিচেনে গিয়ে স্ত্রী সুদীপাকে বলে, ‘তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট করে ঘরে এসো। আলমারি খুলে জামাকাপড় জিনিসপত্র সব বের করতে হবে। সেন্টার থেকে ছেলেরা আসবে।’

‘তুমি ঘরে যাও, আমি আসছি।’ সুদীপা নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রজত বেরিয়ে আসে।

বড় একান্নবর্তী পরিবার ছিল তাদের মজিলপুরে। এই মজিলপুর মানে জয়নগর-মজিলপুর। মজে যাওয়া আদিগঙ্গার বুকে গড়ে ওঠা দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক বর্ধিষ্ণু জনপদ। শুধু মোয়ার জন্য বিখ্যাত নয়। সমাজ সংস্কারক আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর পৈত্রিক নিবাস। বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের জন্মস্থান। বাবা প্রমথনাথ ইরিগেশনে চাকরি করতেন। ঠাকুর্দা শ্যামাচরণের হাতে তৈরি চকমিলানো বড় বাড়ি। ঠাকুরদালানে দুর্গাপুজো হত। নিজেদের পুকুর উঠোন খামারবাড়ি। লাট থেকে ভাগের ধান দিয়ে যেত চাষীরা। সারি সারি গোলা ছিল। সারা বছর অন্নের সংস্থান। পুকুরের চারপাশ ঘিরে বাগান। সবুজ সবজি হত কত। মধ্যদুপুরে ছিল তাদের অবাধ সাঁতার। কাকারা পাড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করত, ‘এবার উঠে আয় সবাই। ভাত খাবি আয়।’ শেষে বাবা লাঠি হাতে পাড়ে এসে দাঁড়াতে সবাই সুড়সুড় করে জল থেকে উঠে আসত। মাঝেমধ্যে পিঠে

লাঠিও পড়ত। সে শৈশব-কৈশোর এখন ফেলে এসেছে রজত। বড় হয়ে চাকরি জীবনে ভাইয়েরা সব ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দিকে। রজত চলে এসেছে এই কলকাতা। বড়দা চলে গেছে চিত্তরঞ্জন। শরিকি গণ্ডগোল শুরু হতেই প্রমথনাথ ভাইয়েদের সংসার পৃথক করে দেয়। একমাত্র ছোট ছেলে প্রশান্তকে নিয়ে তিনি থেকে গেলেন মজিলপুরে। চাকরি থেকে অবসর নিতে রজত বলেছিল, ‘বাবা, এবার মাকে নিয়ে চল আমার কলকাতার বাসায়। ওখানে থাকবে। বয়স হচ্ছে। শরীরও আর আগের মত নেই। আমার দুশ্চিন্তা হয়।’

প্রমথনাথ বলেছিলেন, ‘না, আমি নিজের পৈত্রিক ভিটে জন্মস্থান ছেড়ে কোথাও যাব না। তাছাড়া তুমি এখন ভাড়া বাড়িতে থাকো। আগে তো নিজে বাড়ি কর। তখন না হয় দু’ একদিন তোমার মাকে নিয়ে ঘুরে আসব।’ তারপর একটু থেমে, ‘তোমার ছোটভাই প্রশান্ত একা হয়ে যাবে। ওকে একটা ব্যবসায় দাঁড় করাতে চাই। তোমরা বরং মাঝেমধ্যে এসো। তবে দুর্গাপুজো আর পয়লা বৈশাখ যেন অন্যথা না হয়।’

রজত কথা রেখেছিল। কর্পোরেট অফিসে কাজ সামলে অন্য সময় না হলেও দুর্গাপুজো আর পয়লা বৈশাখে ঠিক বাড়ি যেত। খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠতেন প্রমথনাথ। সূর্য প্রণাম সেরেই সবাইকে ডেকে তুলতেন। উঠোন বাগান, সদর খিড়কি সব নিজের হাতে ঝাঁট দিতেন। সেই শুকনো পাতা আর্বজনা সব জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিয়ে রবি ঠাকুরের গান গাইতেন উদাত্ত কণ্ঠে। “ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো”। সাথে সাথে ছেলেমেয়েদেরও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গাইতে হত। পুরনোকে বিদায় দিয়ে নতুনের আহ্বান। পোষ্য গরু ছাগল তাদের গায়ে নিমপাতা-হলুদ বাটা মাখিয়ে পুকুরে নিয়ে চান করানো হত। বাড়ির ছেলেমেয়েরাও সবাই সেদিন নিম-হলুদ বাটা মেখে চান করত। পুকুরে জাল ফেলা হতো। বড় বড় রুই কাতলা মৌরলা পুঁটি ধরা হতো। তারপর দুপুরে ভুরিভোজ। বেগুন নিমপাতা ভাজা, শুক্তো, আমডাল, মৌরলা মাছের ঝাল, পুঁটিমাছ ভাজা। রুই-কাতলার ঝোল। ঘরে পাতা দই, মিষ্টি।

আর দুর্গাপুজো কটা দিন তো হই হই করে কেটে যেত। বাড়ির ঠাকুর দালানে সদাশিব কুমোর আর তার ছেলে এসে ঠাকুর গড়ত। কাঠামো গড়া, খড় চাপিয়ে মাটি চাপানো। এক মেটে, দো মেটের পর খড়ি করা। শুকিয়ে গেলে রঙ। তার্পিন তেল ঘষলে প্রতিমার দেহ চকচক করে উঠত। এরপর চোখ আঁকা। ডাকের সাজ পরানো। সব শেষে পিছনে চালচিত্র লাগানো। ওরা সব ভাইবোনেরা অবাক চোখ নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। তারপর আসত বোধন, মহাষষ্ঠী। প্রতিমার আড়াল খুলে দেওয়া হতো। বেজে উঠতো শাঁখ। তাদের বুকের মধ্যেও বাজতো উৎসবের বাঁশি। সে ছিল এক মায়াজড়ানো কৈশোরস্মৃতি।

বাবা প্রমথনাথের মৃত্যুর পর রজত তার ছোট ভাই প্রশান্তর বিয়ে দেয়। ভাইকে বলে, ‘মায়ের বয়স হয়েছে, শরীরে নানা সমস্যা। আমার পক্ষে সব সময় এখানে আসাও সম্ভব না। মাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই।’

প্রশান্ত মায়ের শরীরের আর নিজের অনিশ্চিত রোজগারের কথা ভেবে রাজি হয়ে যায়। সুধারানী ছোট ছেলেকে একটু বেশি ভালোবাসতেন। তবুও তিনি কলকাতায় যেতে রাজি

হলেন। তবে একটা শর্ত রেখে। বছরে একবার তাঁকে স্বামী-শ্বশুরের ভিটেতে আনতে হবে।

সেন্টার থেকে লোকজন এসে গেল। ওরা ট্রেনিং প্রাপ্ত। গুছিয়ে সব জিনিসপত্র প্যাকেজিং শুরু করল। রজত দাঁড়িয়ে বলে বলে দিচ্ছিল। দেয়ালে ঝোলানো বাবার বড় ছবিটা খুব সাবধানে নামাতে বলল। নামানোর পর দেখে বেশ ধুলো জমেছে। পরম যত্নে নিজের হাতে কাপড় দিয়ে সে ধুলো মুছে ফেলল রজত। বাবার ছবির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। কেমন উজ্জ্বল আর স্পষ্ট দেখাচ্ছে বাবাকে। ছবিটা কবে উঠেছিল রজতের এখনো মনে আছে। বাবা রিটায়ার করার পর হাতে টাকা পেতে ছোট ছেলেকে একটা দামী DSLR ক্যামেরা কিনে দেন। বাবাকে বারান্দায় চেয়ারে বসিয়ে প্রশান্ত প্রথম সেই ক্যামেরায় এই ছবিটা তোলে। পরে বাঁধানো হয়। আজ কতদিন হয়ে গেল বাবা নেই। বাইরে থেকে খুব আদর্শবাদী কঠিন মনে হলেও বাবার মনটা ছিল নরম। সে বছর হায়ার সেকেন্ডারি ফাইনাল পরীক্ষা দেবে রজত। তখন শীতকালে পরীক্ষা হত। প্রমথনাথ ভোরে উঠে ছেলেকে তুলে দিতেন। রজত পড়তে বসত। অসময়ে বৃষ্টি হল। ভোরে ওঠার জন্য ঠাণ্ডা লেগে কাশি হল। প্রমথনাথ নিজের গায়ের খাদির মোটা চাদরটা ছেলের গায়ে ভালো করে জড়িয়ে দিলেন। পরীক্ষার পর পাশ করে কলেজে ভর্তি হতে পরের শীতে মা চাদরটা দিয়ে বলল, ‘এই খাদির চাদর বাবা তোকে দিয়েছে। বেশ গরম হয়। তোর তো আবার ঠাণ্ডার ধাত। তুই নে।’

সেই থেকে পুরো কলেজ লাইফ, তারপরও পুরো শীতকাল রজতের সঙ্গী ছিল ওই খাদির চাদরটা। গায়ে জড়িয়ে শুতো। লেপ কম্বল তার সহ্য হতো না। কলকাতা আসার পরও ওটাই ওর সম্বল। চাদরটা গায়ে দিলে কেমন বাবা বাবা ভাব হয় তার মধ্যে। শরীরের মধ্যে একটা শিকড় চাড়িয়ে যায়। উত্তরাধিকার। বাবা নেই। কিন্তু সেই খাদির চাদরটা আজও আছে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। সব বাঁধাছাঁধা করে সেন্টারের ছেলেরা আজকের মত চলে গেছে। রজত স্নান সেরে বেরিয়ে ঘরে এসে তাতাইয়ের খোঁজ করে। তাকে দেখতে পায় না। সুদীপা বলে, ‘হয়তো, ওর ঠাকুমার কাছে আছে। ডাকছি।’’

ডাকতে হল না। তাতাই নিজে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকল। পিছন পিছন তার ঠাকুমা।

‘মজা! কী মজা! আমি চাদর গায়ে দিয়েছি। বাবার চাদর! আমি এটা নেব। নেব।’

রজত দেখল, ছোট তাতাই তার বাবার দেয়া সেই খাদির চাদরটা গায়ে জড়িয়েছে। দু'হাত জড়ো করে ধরে আছে। যেন ওর চাদর। আর ছাড়বে না। রজতের চোখে জল এল। মৃত বাবার মুখ ভেসে উঠল চোখে। পরম স্নেহে ছেলেকে কাছে টেনে নিলেন। তারপর গালে টিপে দিয়ে বলল, ‘বেশ। তোকে দিয়ে দিলাম চাদরটা। বাবা আমাকে দিয়েছিল, আমি তোকে দিলাম। খুশি তো!’

ছোট তাতাই খুব খুশি হল। বাবাকে একটা হামি দিয়ে সে মায়ের কাছে ছুটে গেল। ‘আমার চাদর, মা আমার চাদর।’

ঠাকুমা সুধারানীর চোখ সজল হল। তিনিও খুব খুশি হলেন এই উত্তরাধিকার বদলে।

সেম সাইড

জয়গোপাল মন্ডল

দ্বিতীয় ঢেউ থপ থপ করে এপাড়া ওপাড়া ঘোরে। অমাবস্যায় জ্যোৎস্না দেখা বারণ। ওদের ধাত্রীগ্রামে তালা পড়েছে। এক কিশোরী নিত্যদিন ভোরবেলা গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। অভ্যন্তরে সংকলিত ময়ূরপালকে সাজানো পালংক। আকাশের রৌদ্র আস্তে আস্তে সবাইকে জাগিয়ে তোলে। আজ ভোরের পাহাড়তলি সব অলংকার খসিয়ে গভীর অরণ্যে নিয়ে গেছে। হোস্টেলে তখনও পাখিরা কিচির মিচির শুরু করেনি। মাছরাঙা ঝুপ করে একটা পুঁটিমাছ মেরে বসন্তবাহারে মঞ্জরিত। পানকৌড়ি খালি ডুব দেয়। প্রতিদিন এভাবে চলে। আকাশ নির্মেঘ। ময়ূর শরীর ঢেকে রেখেছে। এ সবের মধ্যে সব ঘরের ভিতরে বাইরে অন্ধকার। অথচ এমন স্নিগ্ধ ভোরবেলাতে কুয়াশামাখা ধ্রুপদী জিজ্ঞাসা থাকার কথা না। অখিল মানবসিন্ধু চলমান স্টুডিও হয়ে যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটোছুটি। সন্ধেবেলা কালবৈশাখী দাপটে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়ানো। হাতের তালুতে ফেসবুক আর হোয়াটস এ্যাপের টুং টাং শব্দ। কখনো কৌতূহল, কখনো কৌতুকের দাওয়াত। ফাঁকা রেল লাইনের মাঝে দুরন্ত মহিষ।

নিখিলের ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট। বাহ খুব ভালো তো। লাল মেহেদী। গর্ভমোচা খোলা অঙ্গন। দুধেআলতা সোনা রঙ। শৈব সন্ন্যাসীর বুকে সাপের বিষ। সঙ্গে সঙ্গে কনফার্ম। গ্রহণ লেগেছে একসঙ্গে চন্দ্র সূর্যে। আততায়ীরাও বুঝতে পারেনি কে কার সাথে প্রেম প্রেম খেলা উস্কে দেয়। নামটা কী সুন্দর! দীপান্বিতা! পেঁচার জন্য পেঁচামুখী জোটে। এত ভালো ভাগ্য? যাক সত্যিকারের নাই বা হলো। দুধের স্বাদ তো ঘোলে মেটে। এই প্রৌঢ় বয়সে আর কী জুটবে? বউটা তো বুড়িয়ে গেছে। খালি নিজের ধান্দা। একটু দাগা দিতে হবে। গরম গরম কার না ভালো লাগে! এক বন্ধু তো লিখেই ফেলল, আজকাল সতীন নেই বলে স্ত্রীরা পতিব্রতা হয় না, চলুন দ্বিতীয় বিবাহ করা যাক। কিন্তু পায়ে যে সরকারি শেকল বাঁধা। যাক এর থেকে অনলাইনেই মজা করা যাক। বেশ কিছুদিন চলছে—রাত হলেই ঘন্টা বেজে ওঠে। তারপর বলে, বাথরুমে যান। আদিম উন্মাদনায় কণ্ঠের সুর বদল করে চলছে উদ্দাম বাথরুম খেলা।

গত রাতে কেউ কেউ হল্লা করে, প্রস্তুতি চলছে। কেউ কেউ বলে, ওসব ভেবে কী লাভ! অতিমারির দাপটে পরীক্ষা ভুণ্ডুল। এখন একটাই রাস্তা নেটদুনিয়া, খাও দাও রসেবশে প্রেম প্রেম। কেউ কেউ একাধিক বেনামে ফেসবুক এ্যাকাউন্ট খুলে নানা মজায় মজেছে।

দীপান্বিতা ফ্লোরেন্স জারা জর্জ, ম্যাঞ্চেস্টার। কাকলি চৌধুরী খুলেছে তানা জেমস, ফ্লোরিডা, সোমা ঘোষ ডুবতে ডুবতে শ্রাবন্তী মজুমদার। দীপান্বিতাও ভাবতে ভাবতে টের পায় অনলাইনে টোপ খায় রামধনু। এক একদিন এক জনের কাছে পাঠায় বন্ধুত্বের হাত। ভারতীয় নায়কের নামে মেঘমেঘালির চালচিত্রে নতুন বন্ধু নিখিল। বেশ কয়েকদিন চ্যাটিং। তারপর স্বত্ববিহীন গৃধ্নু।

দীপান্বিতা ঠিক করে আজ সে শেষ পাথর সরিয়ে জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। আজ সে দাবি করে কথা বলবে। সুস্পষ্ট উচ্চারণে সে নিসর্গের মাঝে হারিয়ে যেতে চায়। প্রত্যুত্তরে

মজবুত সেতু, মসৃণ। সামরিক অভিযান হবে। তখন সবাই ব্যস্ত। রাত দুটো। বাথরুমে দেখতে চায় ব্রহ্মদারু গাছ। কখনো দেখেনি জল্লাদের মুখ। নিজেকে প্রলুব্ধ করে সাজিয়ে নেয় তারপর বলে, গুণ্ঠন খোলো দেখি তব মুখ। দীঘার সৈকতে যেন নতুন প্রেমিকের সাথে দেখা।

কী যে হলো, নির্বাক, নিস্পন্দ দীপান্বিতা। পট করে কেটে দিলো লাইন। প্রলয় ঘটে গেছে। বার বার প্রশ্ন করে, ওর মুখটা বাবা- কাকার.. মতো লাগলো কেন ? প্রশ্নটা ঘুরতে ঘুরতে মেয়েটিকে নিয়ে যায় জাহাজজেটির কিনারায়, কুয়াশামাখা রাত আর কাটে না। তখন থেকেই কনকরেখাবৃত্ত কাচের মতো টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মৌরলা খাওয়ার এত্তো লোভ? শরীর জুড়ে শুধু ঘৃণা। সত্যি কি সব নারী-পুরুষ এতটা আ-নগ্ন? লাল গোলাপের মধ্যে এতটা নীল? ভিড়ের মধ্যে কিশোরীনিরঞ্জন? কেউ টের পেল না? হে ঈশ্বর, ঘুমের মধ্যে লেখা হয়ে গেল মৃত্যুসমাচার?

২

তারপর নিস্তব্ধ রাত্রি, নিখিলের জীবনময় একটা অন্ধকার প্রেত ঘুরে বেড়ায় চারপাশে। বারবার চেষ্টা করে ভুলে যেতে। ক্লাসে কিছুতেই মেলাতেই পারছে না অঙ্ক, $(a+b)^2$ —এই সাধারণ সূত্রগুলিয়ে যাচ্ছে—রিং টোন আবার বেজে ওঠে, হ্যালো,—

—বলছি—

—নিখিল রায় বলছেন? গলাটা খুব গম্ভীর, ভরাট, যেন গমগম করছে? দিল্লি থেকে ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে বলছি... —বলুন, —আপনার নামে সেক্স কমপ্লেন আছে, ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে।
—কেন?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েও নিজেকে সামলে নেয়, তারপর কেটে দেয়। —বিনিদ্র রাত্রি....ক্রমশ রোগা হয়ে যায় জীবন, কেবলই ফ্যাকাশে—

তখন ভোর ৪টে। হঠাৎ মনে পড়লো, ছাত্রী রীতার স্বামী তো জামতাড়া থানায় কাজ করে। একেবারে স্কুলের কাছেই। ছটপট করছে একটা লক্ষ্মী পেঁচা, কী হলো? সকাল হলেই ওরা তো ঢুকে যায় অন্ধকার কোটরে। কয়েকটা কাক তাড়া করেছে.....।

—হ্যালো, রীতা, তোমার বর আছে? —হ্যাঁ স্যার। —একটু দাও তো। —হ্যালো স্যার, বলুন। —বীরেন, আমি একটু বিপদে পড়েছি। তুমি একটু সাহায্য করবে? —বলুন না স্যার।

—না, আমার বাসায় একটু এসো না — ঠিক আছে স্যার।

পাহাড়ের কোলে মেঘ না কি কালো কয়লা! বিস্ময়ে দেখে নিখিল। লাল টকটক করছে পুবদিকটা। বীরেন সব জেনেশুনে থানায় কী লিখতে হবে ব'লে চলে গেল, তবে সাইবার থানায়। কাছেই।—আইয়ে স্যার, আইয়ে, বীরেন আপ কে বারে মে হামকো সব বোলা। ঘাম ঝরছে এই ঠাণ্ডায়। ধুকপুক করছে। সব জলাঞ্জলি গেলো।

—আরে স্যার, কুল, বি কুলড। আবেদন দে কে যাইয়ে।

— ও সিংজি, ইয়ে বীরেন কা স্যার, বহুত মজা লিয়ে না?

রাস্তাটা বড্ড টলমলে। কুকুরগুলো আজ বড্ডো বেশি ডাকছে। সব কেমন হচপচ হয়ে গেল। আকাশে শকুনি চক্কর মারছে, না কি পুকুর কাটছে! পৃথিবীর আবর্তন যেন বেড়ে গেল।

একটা কঠিন অঙ্ক

অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

সবিতা অনেকদিন ধরেই বলছিল একটু মায়াপুর যাব। মায়াপুর যাব আপনার সাথে। আপনার বাইকে। কখনও বলেছিল একদিন জলেশ্বর মন্দিরে যাব তারপর লোকনাথের মন্দিরে। অনেকটা দূরের পথে বাইকে ঘুরতে যেতে খুব মজা লাগে। এই সব মজা-টজা'র ব্যাপারটা শুনি আমাদের কলেজের সুমির কাছে। ও প্রায়ই ঘুরতে যায়। ঘোরবার অনুভূতির কথা বলে ও। আমার ইচ্ছা করে। কিন্তু কার সাথে যে ঘুরি! তাই ঘরে ফিরে আপনার কথা ভীষণ মনে পড়ে। চলুন না একদিন নীলকুঠি যাই।

অমরেশ কোনওদিন কোথাও নিয়ে যায়নি। নিয়ে যাব, এ কথাও সে কোনওদিন বলেনি। অমরেশ তো আর পাঁচজনকার মতো নয়। সে সর্বত্র পরিচিত বাবাজি বলে। ইয়ং বাবাজি। কেউ বলে, সাধু বাবা। সে গাঁ-গ্রামে পাঠ-কীর্তন করে। মাঝে মধ্যে কলকাতা, উত্তরবঙ্গ, নদিয়াতেও সে যায়। উদাসপুরে এসেছে কয়েক বছর। এই কয়েক বছরেই অমরেশ সকলের মন জয় করে ফেলেছে। বাচ্চা থেকে বুড়ো। পাঠ প্রবচনে চোস্ত। কয়েকটি গ্রন্থও তিনি বার করেছেন। সবগুলোই গোগ্রাসে সবিতা পড়ে ফেলেছে। আরো অন্যান্য ভক্তরাও পড়ে কিন্তু কোনও সাড়া মেলে না তাদের থেকে। সবিতা একদিন বলেছিল, পাঠের আসরে আপনাকে একরকম লাগে আর আপনার গ্রন্থে আপনাকে অন্য রকম লাগে। একটা আলাদা মিশ্রণ আপনার মধ্যে আছে। পাশে তার মা বিমলাদেবী বলেছিলেন, সবিতা ভেবে-চিন্তে কথা বল। কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলছিস! উনি আমাদের কাছে মহারাজ।

অমরেশ ভাবে- মহারাজ, সাধু এসব তো আমার পরিচয় না! অনেক জায়গায় পাঠ করে এলাম, অনেক জায়গায় খুব সাধারণভাবে মিশলাম কিন্তু সবিতা এই বয়সে যতটা বুঝেছে অন্য কেউ এতটা বুঝেছে কিনা সন্দেহ আছে। সে সময় ও ক্লাস নাইনে পড়ে। বিকাল বেলায় অমরেশ সবিতা'র বাবা-মায়ের ডাকে তাদের বাড়ি যায়। ওদের বাড়িটা বেশ। চারদিকে ঘর। মাঝে উঠোন। নারকেল গাছের গোড়ায় একটা চালা করা ছোটো ঘর। খরগোশ থাকে। ঘরের কার্নিশে চারটি খোপ। তাতে লক্কা পায়রা, সারটিং, মাক্সি রেসার, সিরাজি পায়রা উঁকি মারছে। গেটে ঢোকবার পর ডানহাতে কতকগুলো বড় বড় টব। একটাতে তুলসী, একটাতে মানিপ্ল্যান্ট, তিনটি টবে অ্যালোভেরা আর বাকিগুলোতে নানান ধরনের পাতা বাহারি। অমরেশ অবাক হয়ে দেখে। বার কতক বিমলাদেবী বললেন, মহারাজ বসুন। কিন্তু মহারাজ তো মহারাজে নেই। সবিতা লক্ষ্য করে, তার মায়ের মহারাজের মধ্যে ভার-ভারিক্য ভাব নেই। যদিও কোনও সময় থাকে না কিন্তু ভক্ত সান্নিধ্যে মহারাজের যে এক ঔদার্য, ইচ্ছে না থাকলেও এক জায়গায় বসে থাকার এক ঠাকুর ঠাকুর ভাব তা এখন নেই। সবিতা বলে, এই তুলসী গাছের বাতাস মানুষের অনেকরকম রোগ দূর করে, এই মানিপ্ল্যান্ট গাছ শুনেছি বাড়িতে থাকলে অভাব থাকে না। আর এই অ্যালোভেরা অনেকরকম উপকার দেয়। এর রস মাখলে শীতকালে গা ফাটে না। মুখ খুব উজ্জ্বল থাকে। বাইরের ক্রিমের প্রয়োজন হয় না। অমরেশ চুপ করে শোনে। একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলে। বিমলাদেবী বলেন, সবিতা তোকে এত পাকামো করতে হবে না। মহারাজ সব জানেন। তার আশ্রমে গিয়ে দেখে আয়, এই সকল গাছ তার মন্দিরেও আছে। তুলসী গাছের মহিমা তুই কতটুকু জানিস! কি বলেন মহারাজ!

- শুনতে তো হবে ও কতটা জানে। হয়ত এমন কিছু আছে যা আমার জানা নেই। সেটা ওর কথাতে জানা হয়ে যাবে।

সবিতা হাসতে হাসতে বলে, এই জন্যেই বলি তোমাদের মহারাজ কিন্তু একেবারেই অন্যরকম একটা মানুষ। তোমরা একটা জিনিস দেখ! মহারাজের মনটা কিন্তু এখন একেবারেই ছেলেমানুষ হয়ে গেছে।

বিমলাদেবী সবিতাকে বকলেন। বললেন, একি বলছিস তুই! তোর কোনও সম্ভ্রম নেই দেখছি। মহারাজের সাথে এইভাবে কথা বলে! সবিতা বলল, তোমাদের মহারাজকে জিজ্ঞাসা করে দেখ না, আমি ভুল বলেছি কিনা! আমাদের রন্তু এই রকমভাবেই পায়রা দেখে, খরগোশ দেখে।

অমরেশ বসে। চেয়ারে। সবিতা'র কাকিমা এসে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে। লাইন দেয় বিমলাদেবী, পরিতোষবাবু, রন্তুও... অমরেশ বলে, আমি কিন্তু এবার চলে যাব। প্রণাম-টনাম আমার ভালো লাগে না। আমি আমার ভাইএর, বোনের প্রণামও কখনও নিইনি। আমি বলি, আমার আদর্শ, আমার চিন্তা-ভাবনা যদি কেউ গ্রহণ করে তবে সেটাই তো মান্যতা দেওয়া। শ্রদ্ধা করা। প্রণাম করা। তবুও কেউ কথা শোনে না। প্রণাম করবেই। অমরেশ বলে, আসলে আমি কিন্তু সাধু হতে আসিনি। আমি প্রণাম পেতে আসিনি। আমি ভবঘুরে। ঐ যে সবিতা বলল না, একেবারে ছেলেমানুষ লাগছে। একেবারেই তাই। আমারও পায়রা ছিল। আমারও খরগোশ ছিল। আমি পড়াশুনা করতাম, হাসতাম, খেলতাম, পায়রা ওড়াতাম। ঘুড়ি ওড়াতাম। ঝগড়া করতাম। আবার বসে বসে দাদুর মুখে রামায়ণ, মহাভারত শুনতাম। কিন্তু ভক্ত হতে গেলে এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, তিলক পরতে হবে। মালা গলায় রাখতে হবে —এইসব বাধ্যতা কোনোদিনই মানতে পারিনি। কিন্তু সেই আমিই কি করে যে, এইসব গোঁড়ামিতে বেঁধে গেলাম, বুঝতে পারি না! একটা সাধারণ ব্যক্তি কি ইচ্ছে থাকলে সাধু সাজতে পারে না! একটা সাধুর ইচ্ছে হলে সেকি ঘুড়ি ওড়াতে পারে না! পোশাকের সাথে সাথে পরিবেশের সাথে সাথে ইচ্ছে করে এতটাই কঠিন হয়ে উঠতে হবে!

সেদিন সকলেই কিছুক্ষণ চুপ ছিল। সবিতার বাবা পরিতোষবাবু বললেন, আসলে আমরা তো বদ্ধ পরিবেশে মানুষ, এই সকল পরিবেশের একটা সমাজ আছে। হিংসে আছে। দোষ ধরবার প্রবণতা আছে। ভালো মানুষের ভালোভাবটাকে মনের ভিতরে পূজা করে কিন্তু বাইরে তাকে বিভিন্ন অ্যাংগেলে পর্য্যুদস্ত করে, মজা নেয়। আপনি আমাকে ভালো দেখছেন, আপনার ভালো আলোতে। আমার মধ্যে অতোটা ভালো হয়ত নেই। আপনার সুখ্যাতিতে আমি নিজেকে বিরাট কিছু মনে করে আপনাকেই টেক্কা দিতে গেলাম। এটাই এখন সমাজ।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল অমরেশ। সেই থেকে সবিতাও একটু সহজ হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে সবিতা ইলেভেনের গণ্ডি পার করে টুয়েলভে উঠল। অমরেশের আশ্রমের উৎসব অনুষ্ঠানে সকলেই উপস্থিত থাকত কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে সবিতা কোনোদিনও আসেনি। এসেছে অনুষ্ঠানের পরে। সন্ধ্যায়। কোনও সময় কাকাতো ভাই, মামাতো বোন কিম্বা মামারবাড়ির কাউকে নিয়ে। যা ছিল তাই সকলে ভাগ করে খেয়েছে। অমরেশ এক সময় বলেছিল, কি ব্যাপার এখন আসার সময় হল! সবিতা বলেছিল, আসলে এদের জোগাড় করে আনতেই দেরি। এরাও আসতে চায়, তাই.....

অমরেশের ঘরের আলমারিটা ও ঘাটত। দুএকটা বই কোনও কোনও সময় পড়বার জন্য নিয়েও গেছে। এই সব বইয়ের মধ্যে একদিন দু-তিনটে ডায়রি সে দেখেছিল। পাতা ওল্টাতেই আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, আপনি কবিতা লেখেন ?

- কবিতা লেখা কি কোনও দোষের !

- ঈশ্বরের থেকে তো প্রেম এবং হতাশার কবিতা বেশি।... আপনারা এইসব কবিতা লিখতে পারেন !

- আমি পারি

- কিন্তু আপনি! যাইহোক, একটা ডায়রি আমি নিয়ে যাব। পড়ে দিয়ে যাব।

- আমার ঈশ্বরকে তোমার হাতে তুলে দিতে পারব কিন্তু আমার ডায়রি নয়।

- এই প্রথম আপনাকে এত সিরিয়াস এবং গম্ভীর দেখলাম। যাক আমি এসে এসেই পড়ব। যে ক'টা কবিতা দেখলাম, তাতে করে কল্পনার ছবি অনেক। হরিনাম ছাড়া আপনি অন্য চিন্তা করতে পারেন!

- যদি আমি নির্দিষ্ট সময়ে অন্য জায়গায় পাঠ করতে যেতে পারি। কাউকে কথা দিলে সেইখানে যেতে পারি, আজ রাত পার হলে আগামিকাল কোথায় যাব, কি খাব, কোন পোশাক পড়ব, কাদের সাথে যাব, কাদের সাথে যাওয়া উচিত হবে না এত সব কল্পনা করতে পারি তবে কল্পনা করে লিখতে ক্ষতি কী! ঐ ছেলেটাকে দেখতে ভালো, এই ছেলেটাকে খারাপ আবার ঐ মেয়েটাকে দেখতে খারাপ আর এই মেয়েটা ভালো এসব যদি চোখের স্পর্শে মনে ভালোমন্দের গন্ধ থাকে, সেটাকে খাতায় তুলে ধরাটাই বেমানান!

- বিগত দিনগুলির থেকেও আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব! খুব জানবার ইচ্ছা তাই

- বলো

- বলছি, এক সময় তো আপনি বলেছিলেন- এই সব নিয়ম-বিধান কিচ্ছুটি ভালো লাগে না, আমি সাধু হতে আসিনি অথচ কি করে যেন সব দিক পরিবর্তন হয়ে গেল। আপনার এইসব ভালো না লাগলে আপনি তো বাড়িও চলে যেতে পারতেন!

-সে কি আর আমি যাইনি! মনে করেছিলাম অনেক দিন পর বাড়ি যাচ্ছি সকলে হয়ত ভালো বলবে। বন্ধুরা হয়ত আরো কাছে টেনে নেবে। আভিভাবকেরা হয়ত কাছে টেনে নিয়ে নানান রকম গল্প বলবে, শুনবে কিন্তু দেখলাম, মা-দাদারা বলল- আবার কখন যাবি আশ্রমে!

আমরা তো পাকে ডুবে হাবুডুবু খাচ্ছি, তুই ভালো আছিস চলে গিয়ে। পাড়া-প্রতিবেশি অভিভাবকেরা বলল, কি ব্যাপার! গোপাল, পুজো হয়ে গেল! মিশনের লোক এখন কি তাড়িয়ে দিল! বন্ধুরা বলল, ভাই খুব ভালো আছিস যেখানে আছিস। আমাদের জন্যও একটা জায়গা রাখিস।

- আপনার কি ইচ্ছে করে না, আমিষ খেতে?

- ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে কিছু নেই। খাবার জিনিস চাইব না। ইচ্ছে করে নিমন্ত্রণের বাড়ি যাব না। এটা খাব আর ওটা খাব না, তাও বলব না। এসবের উপরে উঠে কেউ যদি জিজ্ঞাসা না করে খাবার এনে দেয় তবে কি দিচ্ছে দেখব না। যিনি আমাকে খাবার পরিবেশন করবে তারও তো বুকের পাটাটা তেমন হতে হবে!

- হাঁসের ডিম খেতে খুব ভালো লাগে। আমি যদি আপনাকে দিই খাবেন!

- এটাই তো ব্যাপার। একটা হাঁসের ডিম খেতে গেলে তো আমি বাইরে থেকেও কিনে খেতে পারি। তোমার থেকে চেয়ে নেব কেন!

- আমি সেটা বলিনি। ঠিক আছে একদিন আমি খিচুরি আর হাঁসের ডিম খাওয়াব।

তারপর অনেক কটা চৈত্র-বৈশাখ পার হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন সবিতা সামনা-সামনি। বলল, আসলে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতে করতে আর আসা হয়নি। শুনলাম আপনি বাইক কিনেছেন। বাইক নিয়ে খুব এদিক ওদিক যাচ্ছেন। মায়াপুর- নবদ্বীপ যান!

- যাই তো

- একদিন চলুন আপনার সঙ্গে যাই

- আমার সঙ্গে! আর কে!

- আপনি আর আমি। খুব সকালে যাব আবার রাত্রে ফিরব। আপনি রেলক্রসিং পার করে দাঁড়াবেন। আমি ওখান থেকে উঠব। তারপর একদিন লোকনাথ বাবার মন্দিরে যাব। নীলকুঠিতে যাব। আপনার বাইকে। আপনার সাথে। অনেক কথা জমে আছে, জানেন! বলব এক এক করে। একদিনে শেষ হবার নয়।

সবিতার কথায় অমরেশ মনে মনে হাসে। ভাবে, ও কি বলে! একদিন নয়, এইভাবে সবিতা অনেকগুলো দিন যেতে চেয়েছে। অবশেষে একদিন বিমলাদেবী বললেন, মহারাজ একটু পাঁজিটা দেখে দেবেন তো। সবিতার তো অনেক বয়স হল। এবারে বিয়ের ব্যবস্থা করব। ছেলেটা চাকরি করে। মেয়েরই পছন্দের। রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। অমরেশ পাঁজি দেখে দিলেন। আগামি সাড়ে ছয় মাসের আগে কোনও ভালো সময় নেই। বিমলাদেবী দেখা করে বিয়ের কথা জানিয়েছেন মহারাজকে। এটা জেনেই সবিতা চলে এল অমরেশের কাছে। হাসি মুখে বসল। তারপর বলল,

- মা এসেছিল

- হুঁ এসেছিল তো! সম্বন্ধ দেখলে রেজিস্ট্রি করলে এতদিনে তো কিছুই জানালে না।

- জানতে চেয়েছেন? কোনওদিন! কেন আমি আপনার সাথে আলাদা ঘুরতে চেয়েছি তা

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

একবারও জানতে চেয়েছেন! একটা মেয়ে কেন এতবার ঘুরতে যাওয়ার কথা বলছে তা আপনি জানতে চাননি তো!

- আমার জানতে চাওয়া-না চাওয়াতে কী যায় আসে! বড় হয়েছ, বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে, এটাই তো সামাজিক রীতি।

- আপনিও তো বড় হয়েছেন। আপনি কেন বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন না ?

- আমার কপালে তো বিয়ে নেই

- কপালে যদি থাকত তবে বিয়ে করতেন

- বিয়ে কি কেউ করতে পারে কপালে থাকলে এমনিই হয়ে যায়।

- আপনার সাথে আমার পরিচয় কতদিনের বলুন তো!

- তখন তুমি ক্লাস এইট এ পড়।

- আপনি কি আমায় দেখে কিছুই বুঝতে পারেননি! আপনার সমস্ত বই একমাত্র আমিই সব পড়তাম এবং তা বলতেও পারতাম। আপনি এরকমভাবে আমাকে কোনওদিন পড়তে পারেননি। আমি ঠিক কতটা আপনাকে ভালোবাসি।

- রাগ কোরো না! ভালোবাসার এই জায়গাটায় আমার সেন্সটা নেই। মানে ঠিক কাজ করে না। ভালোবাসাটা কতটা, কীরকম, কোন পর্যায়ে এই বোঝাটা কি খুব সহজ! যদি সহজ হত তবে বিয়ের পর ছাড়াছাড়ি কেন! প্রেমের বিয়েতেও ছেদ কেন!

- আপনি তো বারবার প্রথা ভাঙতে চেয়েছেন, পারবেন একটা প্রথা ভাঙতে!

- কী রকম

- যার সাথে রেজিস্ট্রি হয়েছে তাকে আমি বিয়ে না করে আপনাকে...

- প্রথমতঃ এতটা আমি ভাবিনি। কারণ তোমার বয়সটা অনেকটাই কম। ভালোবাসা আর একমনের দিক থেকে বয়সটা মাধ্যম নয় তাও আমি জানি কিন্তু কোথায় যেন একটু হচপচ হয়ে রয়েছে।

- হচপচ?

- তুমি তো আমাকে আগে জানাতে পারতে!

- কেন একটা মেয়ে আপনার প্রতি এতটা ভরসা করে তা আপনি বুঝতে পারলেন না এতোদিনে! কেন একটা মেয়ে তার ভাল-মন্দের ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে তাও আপনি বুঝতে পারেননি! যেখানে সকলে আপনাকে এত এত শ্রদ্ধা করে, সেখানে আমি কেন আপনার সাথে এত নর্মাল আচরণ করি, আপনি বুঝতে পারেননি!

- সবিতা! তুমি যদি এতটাই বোঝো তবে প্রেমে জড়ালে কীভাবে! যদি তুমি এতটাই বোঝো তবে কীভাবে তা রেজিস্ট্রিতে এগোল! কোন উচ্ছ্বাসে দুই থেকে আড়াই বছর অনেকটাই গা-ছাড়া ভাব ছিল, কেন! যাক ছাড়ো এসব কথা। এখন তুমি কি চাইছ!

- আমি ঐ ছেলেকে বিয়ে করতে পারব না। আপনি মাকে জানিয়ে দিন। আমি যতবার জানিয়েছি, ততবার মা খুব খারাপ ব্যাবহার করেছে। ঐ ছেলেকেই যদি বিয়ে করতে হয়, তবে

বিয়ের পিঁড়িতে নয় আমি শ্মশানে যাব। আপনি আমায় বাঁচান। ঐ ছেলে প্রকৃতই ভালো নয়। প্রথম প্রথম আমি বুঝিনি। ও একটি মেয়ের সাথে প্রেম করত। সেই মেয়েটি বাবা-মায়ের পছন্দ করা ছেলেকে বিয়ে করে। সেই থেকে এই ছেলেটি কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমি প্রতিদিন সাহস জোগাতে জোগাতে একসময় যে কীসের থেকে কী হয়ে গেল তা ইতিহাস। এখন ও আমার সব কিছুতেই বাধা দেয়। আমি যেমন মুক্ত মনের মেয়ে সেখানে ওর কাছে থাকলে আমি শেষ হয়ে যাব। একটা ভুল করবার পর আপনাকে আমার খুব মনে পড়ছে।

- কিন্তু তুমি জানো কী! ভুলের পিঠে কেবল ভুলই দাঁড়িয়ে থাকে। জলের গায় জল না থাকতে পারলে জায়গাটা শুকিয়ে যায়। শুকনোর উপর মানুষ চলতে থাকে আনন্দে। আর জলের উপর জলা জলা মন নিয়েই চলতে হয়।

- তার মানে বলছেন এর থেকে বেরনোর কোনও উপায় নেই !

- কী উপায়ের কথা তোমায় বলব বলো তো! তোমাকে তো একটা পথ দেখাতে হবে। সেই পথ যদি আমি না জানি। বাড়ি যাও। মাথা ঠান্ডা করো। মরে যাওয়াটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

- আমি কিছু ভাবতেই পারছি না। আপনি আর একবার আমার কথা ভাবুন। আমার মত অসহায় মেয়েদের জন্য কিছুই কি করবার নেই।

- এখন তো আর একটা বিবেকানন্দ নেই আবার নিবেদিতাও নেই। তাহলে না হয় কিছু একটা করা যেত। বিয়ের অনীহা থেকে বাঁচতে তুমি যেখানে যাবে সেখানের কেউ না কেউ তো আবার বিবাহের প্রস্তাব দেবে। এই জগত তো কেবল খাও আর সংসার করো। হৈ হৈ রৈ রৈ করে সময় পার করার নামই জীবন। বিবেকানন্দ অবশ্য একটু আলাদাভাবে বলেছেন, এসেছিস যখন তখন একটা দাগ টেনে যা। আর আমরা যারা আছি তাদের তো সাধ আছে সাধ্য নেই। আমার সামনে তো অনেকেই এসেছিল নিবেদিতা হতে কিন্তু আমি বলেছি, আমি তো বিবেকানন্দ নই। আনন্দ আছে তাও ক্ষণিক আর বিবেক তো নেইই।

এইদিন চলে গিয়েছিল সবিতা। আশ্রমের বুড়িমা আর একটু বসতে বলেছিল, কিছু খেয়ে যেতে বলেছিল কিন্তু সে বসেনি। চলে গিয়েছিল বাড়িতে। বাড়িতেও খায়নি সে। অতীতের দিনগুলির কথা তার খুব মনে পড়ছে। অমরেশ বলেছিল, 'সংসার করা ভালো। সংসার করতে হয় সকলকেই। সংসার, জীবনের একমাত্র উন্নতির পথ। তবে সংসারটা করতে হবে। সং সেজে ঢং করবার জন্য নয়। সার বস্তুটার কথা মাথায় রেখে সঙ সাজো, সঙ সাজাও। আসলে আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি সংসার করতে। সংসারটা একটা অঙ্ক। একটা কঠিন অঙ্ক। সূত্রটা মনে করে ঠিকঠাক প্রয়োগ করতে পারলেই সংসার করাটা সার্থক। আমরা বলি না, দুই হাত এক হল। আসলে তাতো নয়। ঠিকঠাক ভাবে দেখ, চার হাত এক করা। নিজেকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারি না অথচ চার হাতকে বিশ্বাস করি কীভাবে! এই ভয়টাই আমাকে তাড়া করে বেরিয়েছে। উল্টোদিকের মানুষটি কেমন হবে। সব জীবনেই স্ফূর্তি আছে। জীবন পেয়েছি বলেই শুধু স্ফূর্তি করব, এটা ঠিক নয়। আমি ভয় পেয়েছি বলে অন্য কেউ ভয় পাক তা চাই না। কেবল বলতে চাই সংসারটা করবার সময় সামনে একটা দাড়ি-পাল্লা রেখ। ব্যালেন্স ঠিক না থাকলেই

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

বিপদ। এই ভয়টা না পেলে আমি আজ কারও স্বামী, কারও বাবা, কারও জামাই হয়ে যেতাম। সংসারটাকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি যদি তা সংসার হয়।' অথচ রেজিস্ট্রি করা প্রেমিক যার সাথে দুদিন পর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে, তার কথা, 'জীবন দুদিনের। খাও আর মজা নাও। ভালোমন্দ ভাবতে গেলে বর্তমান হারিয়ে যাবে।' মৃত্যুর আগে মানুষ যেমন বাঁচতে চায় সবিতার পরিস্থিতি এখন তাই। সে কাউকে কিছু বলতে পারে না। চমকে ওঠে থেকে থেকে। কখনও অস্থির হয়ে যায়, মনে মনে।

এরপর কয়েকদিন পার হল। বিমলাদেবী আশ্রমে এলেন, বললেন- মহারাজ, আপনি মেয়েটাকে একটু বোঝান। ও দুই দিন না খেয়ে আছে। অমরেশ বলল, আমি কী বলি বলুন তো! ও জেদ ধরেছে, ঐ ছেলেকে বিয়ে করবে না, প্রয়োজনে সে চিতায় উঠবে তবু ভালো। আমি ত বোঝালাম। কয়েকবার ফোন করেছি তাও ধরেনি। আপনি বাড়ি যান। ওকে ক'দিন চোখে চোখে রাখবেন। বিমলাদেবী চলে গেলেন। এদিনই সন্ধ্যেবেলায় সবিতা এল।

আশ্রমের শান্ত পরিবেশে সে বসে থাকে চুপ করে। আশ্রমের বুড়িমা বলেন, কখন এলি!

- এই তো এখন!

- চুপ করে কেন! শরীরটা কি খুব খারাপ!

- শরীর খারাপ নয় গো, মন মানসিকতা খারাপ। আমি পরে তোমার সাথে কথা বলব।

- মহারাজ ঘরে আছে তো! যদি দেখা করিস তো ঘরে যা।

- যাব একটু বসে নিই।

বুড়িমা চলে গেল। সবিতাও বসে থাকে। কিছুক্ষণ পরে অমরেশ বলে,

- কী ব্যাপার! না বললে ঘরে আসা যাবে না, এ রকম কোনও ব্যাপার আছে কি!

- সে রকম ব্যাপার নেই তবে অনেক অনেক কথা তো তাই থমকে যাচ্ছি।

- বলতে থাক। এক কথা দু-বার তিনবার হতে হতে একসময় সব কথাই বলা হয়ে যাবে।

- কথা বলতে কী আপনার প্রতি আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে।

- কারণ কি!

- একটা সামান্য ব্যাপার, যেটা সহজ করা আপনার কাছে খুবই সামান্য ব্যাপার! সেটাই ঝুলিয়ে রেখেছেন।

- কী সেই সামান্য ব্যাপারটা!

- বলছি আপনার পক্ষে প্রথা ভাঙাটা তো কোনও ব্যাপার নয় তবে কেন আপনি....

- শোনো প্রথা ভাঙা ব্যক্তি তার বিপরীতে যাকে পেতে চাইবেন তাকেও তো প্রথা ভাঙা হতে হবে।

- আমি কি তা হতে পারব না!

- যে একটা হাঁসের ডিম খাওয়াতে এত কটা বছর পার করে দিতে পারে, যে কোথাও ঘুরতে যেতে নিজের বাড়ির সামনে দিয়ে বাইকে উঠতে পারে না, ছলনা'র আশ্রয় নিয়ে রেলক্রসিং পার করে দাঁড়ানোর প্রস্তাব রাখে তাকে আমি কী করে ভাবতে পারি প্রথা ভাঙা

ব্যক্তি! আচ্ছা সবিতা একটা কথা বলি, দেখ তো তুমি পারো কি না! আমি বলছি, তুমি তোমার প্রেমিকের সাথেই বিয়ে করো কিন্তু প্রথম সন্তানটি হবে আমার।

- আপনি! মানে আপনারা একথা বলতে পারেন !

- আপনারা নয় বলো আপনি। হ্যাঁ আমি একথা বলতে পারি। কারণ আসন্ন ঝড়কে কেউ রুখতে চাইলে, পারে না। এখন তুমি তাকে বিয়ে না করলে আবার আমায় বিয়ে করলে চতুর্দিকে বিরাট নিন্দে মন্দের ঝড় বয়ে যাবে। তার থেকে বিয়ের পর ঝগড়া হলে সেখান থেকে বেরিয়ে এলে। ডিভোর্স করে দিলে। আমরা আমাদের মত জীবনটাকে সাজিয়ে নিলাম।

- আমরা আপনার মত মহারাজ নই তবে এতটা ছলনা করতে পারব না।

- তার মানে তোমার কথা, প্রথা আমি ভাঙব না তুমি ভাঙতে পারো তো ভাঙো।

- আমি ভাবতেও পারছি না এই কথা কী করে বলতে পারলেন। ছিঃ ছিঃ। আপনাকে আমার ভীষণ ঘৃণা হচ্ছে। রাগ হচ্ছে। আজ প্রথম মনে হচ্ছে আপনার মত বাজে চরিত্রহীন নির্লজ্জ মানুষ মনে হয় আগে দেখিনি। এত কিছুর পরও আপনার প্রতি কী যেন একটা টান, একটা মায়া কাজ করে তা জানি না।

- সবিতা! আমি জানি আমার মুখের এই কথা তুমি কাউকে বলতে পারবে না আবার এটাও বলি একদিন তুমিই আমাকে খুঁজে নেবে। সেদিনেও তুমি এই প্রসঙ্গ ঘুণাক্ষরেও তুলতে পারবে না। আমি জানি চিরন্তন সত্যকে মানুষ ঠেলে দেয় কিন্তু তা বার বার সামনে চলে আসে...

- সেই পরিস্থিতিতে যেন কোনও দিন পড়তে না হয়! বলে, সবিতা বেরিয়ে গেল।

অমরেশ জানে সবিতা কথাগুলো হজম করতে পারবে না। না পারাটাই স্বাভাবিক। তবে এটাও তো ঠিক স্বাভাবিক ছন্দে চলা ব্যক্তি কোনও আঘাতে সেন্স হারা হলে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় আর একটি আঘাত দিয়ে। এরপর আশ্রমে আর আসেনি সবিতা। দিন দুয়েক পরে ফোন করেছিল সবিতা। কথা প্রসঙ্গে বলেছিল, অমন কথা আর কতজন মেয়েকে বলেছেন ! উত্তরে অমরেশ বলেছিল, তোমার মত কঠিন মেয়ে জগতে নেই সবিতা। আমার এই কথাটি তুমি অন্য কাউকে বলতে পারবে না। পাষাণের মত বুকে চাপিয়ে নিয়েই তুমি পথ চলবে। অন্য কোনও মেয়ের প্রসঙ্গে এমন কথা উঠত বলে মনে হয় না। উঠলে হয়ত এতদিনের সাধনা আমার বিফলে চলে যেত। তোমার পক্ষে হজম করা যতটা সহজ অন্যের ক্ষেত্রে এতটা সহজ ছিল না।

কয়েকদিন পরে বিমলাদেবী এলেন আশ্রমে। হাতে বিয়ের কার্ড। বললেন, মহারাজ মেয়ে এখন ঠিক আছে। সামনে বিয়ে। আপনারা তো বিয়ে বাড়ি যান না। তবে আশির্বাদের দিন যাবেন, মেয়েকে আশির্বাদ করে আসবেন। বলে, বিয়ের কার্ডের সাথে আঠা সাঁটানো একটা চিঠিও দিলেন। বললেন, মেয়ে এটা দিয়েছে। বিমলাদেবী চলে গেলে অমরেশ চিঠিটি খোলে। তাতে লেখা, "মায়ের ডাকা সম্মানেই বলি, মহারাজ। মহারাজ, মা হাজার বিনয় করে বললেও আপনি আমার এই বৈবাহিক অনুষ্ঠানে, আশির্বাদের অনুষ্ঠানে আসবেন না। হাত জোড় করে নিবেদন করছি, আপনি আসবেন না। আপনি নিজেও হয়ত জানেন না আপনার মধ্যে কী আছে।

আমি বলছি, আপনার মধ্যে সর্বনাশা এক আগুন আছে। আপনার থেকে মানুষ আঘাত খেয়েও, আপনার থেকে মানুষ অপমানিত হয়েও, আপনার জন্য সংসারগুলো নষ্ট হলেও আপনাকে কেউই কিছু বলতে পারে না। চোখ মেলে দেখুন না আপনি যে যে সংসারের সাথে ওতোপ্রতো ভাবে যুক্ত আছেন, সেই সেই সংসারগুলো জ্বলছে। আপনাকে এতোটা তীব্র ভাষায় উপেক্ষা করলেও আপনার সামনা-সামনি আমি কিছুই করতে পারব না। আপনি এলে আমি হয়ত আর এই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারব না। সেই কোন ছোটবেলার সাজানো পুতুলের বিয়েটা আজ আমার মধ্যে দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে তাই বলছি, আপনি আসবেন না।

ইতি ভাগ্যবতী

বিয়ে হয়েছিল সবিতার। ধূমধাম করে। অমরেশ যায়নি তার বিয়েতে। কয়েক বছর কেটেও গেল। এদিকে মহারাজ অমরেশও গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে কলকাতামুখী হতে চাইছিলেন। দীর্ঘদিনের বাসনা। আশ্রম মিশনের আবদ্ধ নীতি, গোঁড়ামি কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। তাই তিনি বেরবে বেরবে মনস্থ করছিলেন। ঠিকও হয়ে গেছে কবে বেরবেন।

তিনি বেরিয়ে এসেছেন। একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নির্মাণও করেছেন। প্রথম প্রথম আশ্রমিক পোশাক-আশাক থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কারণ পূর্বের কিছু পরিচিতদের ডাকে যেতে হয়েছে আশ্রমিক পোশাকেই। বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণই মুক্ত। যখন তার যেমন পোশাক পরতে ইচ্ছে হয় তখন তিনি তেমনই পোশাক পরেন। যখন যা খেতে ইচ্ছে হয় তখন তিনি তাই খান। একটা সময় তিনি সম্পূর্ণই স্মৃতির দিকে মুখ করে আপন মনেই হাসেন। মন যখন মনকে বলে, পিছনের কথা কি কিছু মনে পড়ে না ! মনই তার উত্তর দিয়ে বলে যায়, মনে তো পড়ে। সকলেরই পড়ে। আমি তো প্রকৃতির দাস মাত্র। আজ যে মিলিটারী চাকরী করছে, তাঁর পোশাক তো সেনাবাহিনীর মতোই হবে, কিন্তু রিটায়ার্ডের পর ইচ্ছে খুশি। এমনই ধরো না। চাকরী তো অনেক বছর করলাম এখন আমি আমার মতো। এই বেশ ভালো আছি।

পার হয়ে গেল কত বছর। হঠাৎ একদিন রাতে ফোন এল অমরেশের ফোনে। হ্যালো করতেই ওপার থেকে এক মহিলার কণ্ঠ ভেসে এলো। কেমন আছেন। চিনতে পারছেন!

- কে বলছেন?

- গলার আওয়াজ শুনেও চিনতে পারছেন না! আমি আপনার পূর্ব পরিচিত

- ভণিতা করবার সময় নেই। ঠিক করে বলুন কে বলছেন?

- ও বাবা আপনি ত দেখছি খুব রেগে গেছেন। ঠিক আছে কালকে ফোন করব। বলে, ফোনটা রেখে দিল।

অমরেশ ভেবেও পেল না, কে করতে পারে! পূর্ব পরিচিত কারো সাথেই আর কথা বলতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই।

পরদিন সকাল।

দশটা নাগাদ পুনরায় ফোনটা বেজে উঠল। ফোনের কলারে ভেসে উঠল সবিতা গাঙ্গুলি। চিনতে অসুবিধা হল না অমরেশের। ফোনটা ধরে কথা বললেন। অনেক কথা। কথার মাঝে

সবিতা বলল, আমি ভালো আছি। বাড়িতে আছি। মায়ের কাছে আছি। মা আপনার সাথে অনেকদিন থেকে কথা বলতে চাইছিল। অন্য একদিন কথা বলিয়ে দেব। মায়ের কাছেই তো থাকি। আপনি ফোনের নাম্বার পাল্টানোর জন্য আপনার সাথে কন্ট্রাক্ট করতে পারিনি এতদিন। আপনার অনেক কথাই সত্য। অনেক আগে থেকে এত সত্য কথা বলবার জন্য সময়ে সময়ে আপনার উপর ভীষণ রাগ হতো।

- রাগটা ঠিক কীসের মতো !

- অনেকটা সিংহাসনে বসানো ঠাকুরের প্রতি যে রাগ তার মতো। রাগ করা যাবে, যা ইচ্ছা বলা যাবে আবার ঘুরে শ্রদ্ধা করতে হবে কারণ যার প্রতি রাগ তার তো সে ব্যাপারে কোনও সেন্স নেই। তাঁর কিচ্ছু যায় আসে না।

- এখন আছেন কোথায়?

- কলকাতার কোনও এক পাড়ার মাঝে।

- একদিন দেখা করব ভাবছিলাম। কীভাবে এবং কোথায় দেখা করা যায় বলতে পারেন?

- আশ্রমে থেকে যে পরিমাণ সময় ছিল প্রেম করবার, প্রেমের অভিনয় করবার সেই সময় এখন আর নেই।

- সেটা তো ভালোই বুঝেছি আপনি অভিনয়ে মাষ্টারপিস। এই সব অভিনয় তো না করলেও হতো। আসলে আপনি তো ঠিকঠাক কাউকেই প্রেম করেননি, কিন্তু অনেক মেয়েই আপনাকে প্রেমিক ভেবে ব্যালেন্স হারিয়েছে।

- ব্যালেন্স কি আমার কাছে হারিয়েছে?

- এই জায়গাটাতেই আপনি এগিয়ে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট যখন তারা দেখেছে আপনি তো ওয়ান পারসেন্টও এগোননি তখনই তারা জীবনের ব্যালেন্স হারিয়েছে। তখনই তাদের মধ্যে জেদ এসেছে, আপনাকে দেখিয়ে দেবে তারা আপনার প্রতি পরে নেই। তাদের অন্য সম্বন্ধ আছে। আর এই দেখাতে গিয়েই অধিকাংশ মেয়ে দিক ভুল করেছে। ব্যালান্স হারিয়েছে।

- এর সব দায় কি আমার! জীবনে কোনও মেয়ে বলতে পারবে না অমরেশ কারও গায়ে হাত দিয়ে কথা বলেছে, সামান্য ইয়ার্কিটুকুও না।

- এইটাই তো কথা, যে গায়ে হাত দিয়ে ইয়ার্কি করে সে এক রকম আর যে ব্যক্তি মুখে আর ইশারাতেই একটা জীবন খেয়ে ফেলতে পারে সে তো মহা মহা ধুরন্ধর। জলে নামব, জলে খেলব অথচ কাপড় ভেজাব না।

- শোনো সবিতা, শাস্ত্রে আছে কাঠের নারী মূর্তি মুনির মন হরণ করে। সেখানে আমি তো সামান্য। আমি তো মানুষ। আমি তো একটা জলজ্যান্ত পুরুষ। একটা স্বাভাবিক পুরুষের যে যে সত্ত্বাগুলি আছে, আমার মধ্যেও তার কম কিছু নেই। কিন্তু আমি যে জায়গায় বিচরণ করেছিলাম সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার পক্ষে যা যা করার দরকার আমি তা করেছি। অন্ততঃ নিজের বুকে হাত রেখে বলতে পারি, আমি নিজেকে বাঁচাতে এবং সেইস্থানের সম্ভ্রম রক্ষা করতে যা যা

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

করেছি ঠিক করেছি। একটা বাড়ির মা-ঠাকুমা শ্রদ্ধা করছে আর তাদের মেয়ে বা উপযুক্ত নাতনি, আমায় প্রেমের চোখে দেখছে। আমি কি করতে পারি! মেয়ে বা নাতনির জন্য আমি কী সেখানে সম্পূর্ণ যাওয়া বন্ধ করব নাকি আমার আশ্রমিক অনুষ্ঠানে আসতে তাদের নিষেধ করব! প্রবাদে আছে না, যে আমায় যেভাবে দেখে আমি তাকে সেইভাবে দেখতে সহায়তা করি। নিজে ডুবে নয়। ডুবিয়েও নয়। সবটাই থাকবে, ভাসিয়ে।

- জানি তো! এই জন্যই আপনাকে খুব মিস করি।

- মিস করা ভালো। কল্পনা বর্তমানকে মধুর করে কিন্তু বাস্তব বর্তমানকে সামান্য সুখ দিয়ে ঘৃণা করে, উপেক্ষা করে, হিংসা-প্রতিহিংসা করে। এইজন্যই ঈশ্বর ব'লে কিছু না থাকলেও কল্পনাশক্তির উজ্জ্বল মূর্তি ভগবান, বিজ্ঞানের যুগেও এতবেশি প্রাধান্য পায়।

- আপনাকে সামান্য রাগালে অনেক কিছু জানা যায়।

- আমি কিন্তু রাগিনি। এটা আমার স্বাভাবিকতা।

- জানি। আমি জানি। তবুও বলছিলাম, অনেক কথা ছিল আপনার সাথে। দু-একদিনে হবে না।

- কোথায় যেতে হবে মায়াপুরে না লোকনাথ মন্দিরে?

- আপনার তো বেশ মনে আছে। সব কথাই আপনার মনে থাকে, তাই না! আপনি যা যা বলেছিলেন তাই তাই ঘটেছে। সেই সকল কথাই একটু শেয়ার করব ভেবেছিলাম। কোথাও যাব না। খালি ভাবি যে, কী করে আপনি সামনের দিনের কথাগুলো বলতে পারেন!

- শেয়ার করতে গেলে তোমাকে তো তোমাদের মহারাজকেই খুঁজে নিতে হবে। আমি তো মহারাজ নই।

- আমি বা আমরা তো মনে করি আপনিই আমাদের মহারাজ।

- ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির সম্পর্কে অনেক কিছু মনে করতে পারে। মনে করাতে দোষ নেই তো। দোষ তার উল্টো প্রয়োগ। আমায় যারা মহারাজ ভেবেছে, একটু প্রথম সম্পর্কের দিন ক্ষণ স্মরণ কোরো। দেখতো তোমাদের বাড়ির সকলে মহারাজ ভাবলেও তুমি কি ভাবতে পেরেছিলে! পারমিতা কি ভাবতে পেরেছিল! টুম্পা, শেলী, ললিতা কি ভেবেছিল! আমি সেসব তুলে সমাজটাকে এমন কি কারও ভাবনা-কল্পনাকে উলঙ্গ করতে চাইনি। কখনও চাইবও না।

- দেখেছেন আপনি কেমন রিয়্যাক্ট করলেন! আমি কি আপনার জন্য আমার ঠাকুমাকে, মাসিকে শিষ্য করে দিইনি!

- দেখেছ! আমরা হলাম স্নো-পাউডারের মতো। যার যখন প্রয়োজন সে তখন গায়ে-মুখে মেখে নেবে। রিয়্যাকশন করলেই এই স্নো-পাউডারটা ভালো নয়। শিষ্য করতে তো আমি চাইনি! গুরু হতেও আমি চাইনি। প্রথম থেকেই আমি বলে এসেছি। আমি সবাইকে কাছে

রাখতে চেয়েছি, একটা সুন্দর সংগঠন করবার লক্ষ্যে। যেখান থেকে সমাজের আরও পীড়িত মানুষের কিছু সেবা করা যায়। তার জন্য বেঁধে বেঁধে থাকতে চেয়েছি। আর সকলে আমাকে সংসারে বেঁধে রাখতে চেয়েছে।

- অন্যায় হয়ে গেছে। আর বলছি না সেসব কথা। শুধু বলছি যে, আমাদের এখানে একটা আশ্রমিক পরিবেশ পাওয়া গেছে। তিন বিঘা জমিও দান করতে চাইছে। আমি আপনার নাম করেছি। আপনি যদি একদিন আসতেন.....

- বলেছ ভালো করেছ। এখন বলে দিও, যে মহারাজের কথা বলেছিলাম তিনি মারা গেছেন। সবাই তো বিবেকানন্দ নয়। তাই অনেকের স্বপ্ন ভোর হওয়ার আগেই মুছে যায়।

- সবিতা আর কোনও কথা বলেনি। অমরেশও না। ফোনও কাটেনি কেউ অনেকক্ষণ। দু-প্রান্ত থেকে শুধু চাপা দীর্ঘশ্বাস...

সুফিয়া বলেছিল

বিশ্বজিৎ সরদার

সুফিয়া আমাকে বলেছিল যে সে বাঁচতে চায়। আর বলেছিল যে আমি কোনো সাহায্য করতে পারি কিনা। আমার লোভ হয়েছিল কারণ সুফিয়া বলেছিল সে কৃতজ্ঞ থাকবে।

সুফিয়া আমাকে বলেছিল। কিন্তু সুফিয়া আমাকে বলেনি সে কি চায়। কি সাহায্য চায় সে আমার কাছে? কিম্বা আমি বাকি কথাটুকু না শুনে হা করে ওর মুখের দিকে চেয়েছিলুম। তারপর দেখলুম ও পিছন ফিরেছে। আমাদের গলিমুখ থেকে ওর পিঠ ছোট হয়ে হয়ে সামনের বাঁকে ঢুকে গেছে। তখনও আমি ওরকম দাঁড়িয়ে ছিলুম। কতক্ষণ আমি জানি না। একটা ঝপ করে আওয়াজ হল। আর লোকজন বাইরে বেরিয়ে এসে গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি ভয় কেটে কেটে ভীড়ের অনেক কাছে চলে এসেছি। হাত দিয়ে মানুষের শরীরগুলো ঠেলে ঠেলে ফাঁক তৈরী করে এগিয়ে আসার পর আমি দেখতে পেলুম সুফিয়াকে।

সুফিয়ার পিঠ তখনও চকচক করছে। ওরকম চকচকে পিঠ এ তল্লাটে শুধু সুফিয়ারই আছে। আমাদের কালী বামনী শ্যামলীদের পিঠ কী রকম একটা ঘসটানো মত তামাটে রং। আর সুফিয়ার গা থেকে যে একটা সুন্দর গন্ধ বের হয় সেটা কী জাতের সেন্টের গন্ধ সেটা এ পাড়ার বাকি মেয়েরা জানেনা। ওদের গা থেকে গুমো গন্ধ বের হয়। ঘাম চেটচেটে গা থেকে রগরানো ময়লা লেগে থাকে বুকে পিঠে।

অনেক কথা মনে হয় সুফিয়াকে দেখলে। ওরকম গন্ধ ওর কী করে হয়েছে? কোথা থেকে ও হঠাৎ এখানে এল? এর আগে কোথায় থাকত? ওর আর কেউ কোথাও আছে কিনা জানতে ইচ্ছে করে। শ্যামলীরা বলে সুফিয়া মোসলমান। আমি বলি রেল লাইনের ওধারের বস্তিতে যে সব মোসলমান আছে তাদের মেয়েরা কি সুফিয়ার মত? কই নাতো। কালী শ্যামলীদের মত ওদেরও গায়ে গুমো গন্ধ। সুফিয়ার তবে কি অন্য জাত?

ওর কাকাকে দেখলে রাশভারী মনে হয়। কারো সাথে মেশে না ওরা। সারাক্ষণ ঘরেই থাকে। সুফিয়া দোকানে যায়। বাজার করে। ওর কাকা হাঁক দিয়ে ডাকে সুফিয়া...। সুফিয়ার সাথে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে। কেমন একটা সুরেলা কণ্ঠ যেন। আর মনে হয় এক্ষুনি কাঁদছিল মেয়েটা। আমার দিকে চেয়ে হেসেছিল সুফিয়া। সেই একবার যখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল আর সুফিয়া গিয়ে দাঁড়াল জাফরের পুরোনো দোকানের চালাটার তলায়। তখন ওর গায়ে ছাঁট এসে লাগছিল। আমি উল্টোদিকের একটা বড় প্লাস্টিকের ঝাঁপ পড়ে ছিল দেখে সেটা টাঙিয়ে দিলুম। আর সুফিয়া আমার দিকে চেয়ে হাসল। তারপর থেকে বারবার আমি সুফিয়ার কাছে কাছে গিছি কিন্তু ও তাড়াতাড়ি চলে গেছে। আমার দিকে চায়নি।

আমি চুপিচুপি সেদিন সিঁড়ি বেয়ে ওদের ঘরের কাছটায় দাঁড়িয়ে কান পেতেছিলুম। কিন্তু কিছু বুঝতে পারিনি। শুধু মনে হল ওর কাকা ওকে যেন খুব বকছে। বিরাট চেহারা লোকটার। আর কাটখোট্টা। চোখগুলো লাল টকটকে। দেখলেই বুকের ভেতরটা মোচড় দে ওঠে। আমি চলে এলুম।

৫রাস্তায় সুফিয়াকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম "তোমার কাকা তোমাকে বকছিল?" কিছু বলেনি সুফিয়া। আমার দিকে তাকিয়েছিল খানিকক্ষণ তারপর চলে গেল। আমার মনে হল সুফিয়া আমাকে কিছু বলতে চাইছে। ওর চোখের দিকে চেয়ে আমার একটা অদ্ভুত ভাব হয়ে গেছিল। আমি খানিক দাঁড়িয়ে থেকে চলে এসেছি।

হঠাৎ সুফিয়া কেন যে বলল আমাকে সাহায্য করতে আমি বুঝতে পারছিনা। কিসের বিপদ ওর। ও বাঁচতে চায় বলল কেন? বেশ কয়েকদিন ধরে সুফিয়া বাইরে বের হয়নি। মনটা আনচান করছিল। সেদিন ও মাথা ঘুরে পড়ে গেল। আমাকে বলল বাঁচতে চায়, আর তারপর মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। সেই থেকে আমি কেমন একটু অস্থির হয়ে উঠেছিলুম। চুপিচুপি আমি ওদের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। দরজায় চোখ রাখলেও কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বা কিছু শোনাও যাচ্ছেনা। এই বাড়িটার নাড়ি নক্ষত্র আমি জানি। পিছন দিকে আর একটা জানালা আছে। সেই জানালার ফাঁকে চোখ রেখেই আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলুম। ওরকম দৃশ্য আমি কোনোদিন দেখিনি। সুফিয়ার ওরকম রূপ আমি কল্পনা করতে পারিনা। বিছানার উপর ওর কাকা পড়ে আছে। গোটা বিছানাটা রক্তে লাল হয়ে আছে আর সেইদিকে একটা পিস্তল তাক করে সুফিয়া তখনও ধরে আছে।

হাঁটতে হাঁটতে আমার টিনের চালের খুপড়ির দিকে এগোচ্ছি। আমার চারপাশটা কেমন যেন শুনশান। থমথমে। আশপাশের শহরটা যেন শব্দহীন। গলির ভিতর সরু পথটা জমাট শূণ্যতায় দম বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। সুফিয়া ফেরার। সুফিয়া ওর কাকা... না কাকা নয়, পুলিশের কাছে শুনলুম ওর স্বামীকে খুন করে পালিয়েছে। আমার পা খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আমার ভাঙা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই বিদ্যুৎ খেলে গেল। কোনোকিছু বোঝবার আগেই সুফিয়া আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার মুখে ওর টকটকে লাল ঠোঁট দুটো রাখল। সুফিয়া আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। আমি আমার দুহাত দিয়ে সুফিয়াকে জড়িয়ে ধরলাম আর সঙ্গে সঙ্গে আমার দুহাত রক্তে লাল হয়ে গেল। সুফিয়া ওর শেষ কথাটা বলে গেল-"আমার নিজের পাপে আমি মরে গেলুম। আমার জন্যে ও ওর বউটারে মেরে দেলে। এবার একটা সিরিয়ালের মেয়ের সঙ্গে জুটেছে। আমায় মেরে দাবার প্ল্যান করছিল। বেঁচে থাকলি তোর সঙ্গে অনেকদূর...।"

সুফিয়া মরে গেল। সুফিয়া ওর শেষ কথাটা শেষ না করেই মরে গেল। বেঁচে থাকলি আমার সঙ্গে কোথায় যেত ও? আমি জানিনা। পিঠে পুলিশের গুলি খেয়ে সুফিয়া আমার বুকের উপর মুখ রেখে চলে গেল। আমার ঘরের ভেতর এখনও সুফিয়ার গায়ের সেই গন্ধটা ছড়িয়ে রয়েছে। এরকম গন্ধ এ তল্লাটে শুধু সুফিয়ারই ছিল।

সুইচ অফ
দীপঙ্কর আরশ

ঘটনা সামান্য, প্রতিফল মারাত্মক রকমের। এমন অনেক সামান্য ঘটনা বড়ো ক্যানভাসে জায়গা করে নেয় কখনো কখনো। বোঝা মুশকিল ওই সামান্য ঘটনার পরিণাম মারাত্মক হওয়ার কী আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল? তেমনই একটি সামান্য ঘটনার পাত্র-পাত্রী আকাশ ও লীনা। আকাশ একজন প্রাইভেট টিউটর। চাকরির আশা ছেড়ে প্রাইভেট টিউশনিকেই জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে সে। মেধাবী হওয়ার সত্ত্বেও এই বাজারে চাকরির প্রত্যাশা করেনি। প্রাইভেট কোম্পানি বা রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে উপার্জনের চেয়ে টিউশনকেই তার সঙ্গে মানানসই বিবেচনা করেছে। পসার মোটামুটি মন্দ নয়।

লীনা তার চেয়ে দু'বছরের ছোটো। বাংলায় মাস্টার ডিগ্রি পাস করার বছর দুই পর সে কাজ খুঁজে নিয়েছে একটি প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। প্রায় তিন বছর সে সেখানেই পড়াচ্ছে। তাদের প্রেমের বয়সও তিন বছর। একই কোচিং মাস্টারের কাছে কোচিং সুবাদে বছর চারেক আগে পরিচয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বন্ধুত্ব গিয়ে থেমেছে প্রেমে। তাদের গাঢ় প্রেম বন্ধুমহলে চর্চার বিষয়, মজারও। আপাতত বছরখানেক হলো তারা কোচিং ছেড়ে নিজ নিজ পেশায় মন দিয়েছে।

দুপুর দুটোর সময় ছুটি হয় লীনার। সেই সময় আকাশ একেবারেই নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে বিছানায় পিঠ ঠেকায়। ফোনে থাকে লীনা। কোনোদিন আবার ঝিমুনির টানে কথা বলতে চায় না। লীনারও সয়ে গেছে। কথা বলতে না চাইলেও সে জোর করে না। দিনরাত টিউশন করার ধকল সে জানে। তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরে ফোন করে। তেমনটাই ঘটলো আজ। লীনা বাড়ি ফিরে আকাশকে ফোন করলো। ফোনে উৎসাহিত গলায় লীনা বলে ওঠে জানো বাবু, কী হয়েছে আজ!

কী?

আজ ওলা, র‍্যাপিডো দুটোর ড্রাইভার একসাথে এসে হাজির!

দুটোই একসাথে বুক করেছিলে নাকি!

হ্যাঁ তো!

র‍্যাপিডো কী লেট করছিল আসতে?

আরে, তা নয়। আমি স্কুলবাসে বসে দুটোই বুক করে দিয়েছিলাম। আগে র‍্যাপিডো, তারপর ওলা।

ওলা বুক করতে গেলে কেন আবার?

তিন টাকা কম দেখালো রে পাগলু! র‍্যাপিডো সাতাশ, ওলা চব্বিশ।

মানে তিন টাকার জন্যে! গির্জা মোড় থেকে পূর্ণিয়াতলা সাতাশ টাকাটা কমই।

লীনার গলায় বিদ্রোহের স্বর তিন টাকাই বা বেশি কেন দেবো? আমি তো রোজই ফিরি। তাই না!

তা ঠিক। ভালোই করেছো। কিন্তু র‍্যাপিডোকে তার মানে ক্যানসেল করোনি! সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাপিডো ক্যানসেল করতে হতো। বেচারা অহেতুক তেল নষ্ট করে সময় নষ্ট করে এলো।

তাতে আমার কী! ওরা ঠিক লাভ করে নেয়। র‍্যাপিডো ওদের পুষিয়ে দেয়।

কী করে পোষাবে? ওলার বা র‍্যাপিডোর লাভ, তেল খরচ সব তো কাস্টমারের টাকা থেকেই! তুমি যেমনটা ভাবছো তেমনটা নয় কিন্তু। খুব বেশি কিছু পায় না ওরা।

আমি ওতো শত ভাবতে পারছি না। শোনো না কী হয়েছে। বলে হেসে গড়িয়ে পড়ল লীনা।

অতো হাসলে বলবে কী করে? না হেসে বলো কী হয়েছে?

শোনো না, আমি যখন গির্জা মোড়ে বাস থেকে নামলাম একসাথে দুজনের ফোন। একজনকে কাটতেই আর একজনের ফোন ঢুকে গেলো।

ইস বাজে ব্যাপার গো! একজনকে ক্যানসেল করলে এটা হতো না। আগেভাগে ক্যানসেল করতে হতো তো।

আবারও হেসে গড়িয়ে পড়ল লীনা। হাসির দমকের সঙ্গে সঙ্গে বেশ উচ্চস্বরে বলতে লাগলো আরে মজাটা তো ওইখানেই মশাই... দুজনকেই তো আমি আসতে বলে দিয়েছিলাম। কী করে জানবো একসাথে এসে হাজির হবে! দিলাম ভাগিয়ে র‍্যাপিডোকে। কেন তিন টাকা বেশি দেবো!

এতক্ষণ খুব শান্তভাবেই কথা বলছিলো আকাশ। সাধারণত সে শান্তভাবেই কথা বলে। দুঃখ, আনন্দ, রাগ, উৎসাহ—এগুলোর প্রকাশ তার বরাবরই কম। এ জন্য লীনার অভিযোগও কম নয় তার উপর। সেই আকাশের গলায় হঠাৎ ভর করলো উত্তেজনার পারদ। উত্তেজিত গলায় সে বলে উঠল ফোন রাখছি।

এ মা! কেন? ফোন রাখবে কেন?

আমার বিরক্ত লাগছে।

এতে বিরক্তির কী হল?

আমি তোমার বিহেভ মেনে নিতে পারছি না।

কীসের বিহেভ! ক্যানসেল করিনি বলে?

তার চেয়েও বড় কথা, তুমি দুজনকেই আসতে বলে দিয়েছো বলে। তাহলে আমার গুলি যে নেই, কী করে বুঝব?

ভুল কী করেছি? যদি একজন লেট করতো আমার আর একটা অপশন তো থাকতো! তাই না! সুবিধা যখন আছে, আমি সারাদিন স্কুলে খেটে এসে কেন অকারণ হয়রান হওয়ার চান্স রাখবো!

লেট করলেও কত লেট করতো? খুব বেশি দুই কী তিন মিনিট! তার জন্যে একজনকে ফালতু হয়রান করলে! ক'পয়সা পায় তার ঠিক নেই, তেলটাও তো গেল। মিনিমাম ভাবার চেষ্টা করো, ওরা কিন্তু আমারই মতো অভাগ। তাই....

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

শোনো বাবু। এখানে ভাবাভাবির কিচ্ছু নেই। আমি আমারটাই তো ভাববো! বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবলে ভাবনাগুলো মহান হয় বুঝলে? এই ভাবনাটা যদি আমার জন্যে করতে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করতাম। একটা আদরের নাম ধরে ডাকার পর্যন্ত...

হঠাৎ করে ফোনটা কেটে দিলো আকাশ। ঝাঁঝালো বক্তব্য শুনতে একেবারেই পছন্দ করে না সে। তাতে যে লাভ কিছু হয় এমনটা নয়। বরং কপালে আরো বেশিই ভোগান্তি জোটে। লীনাও যতক্ষণ না ঝাঁঝটা মেটাতে পারছে ততক্ষণ মুক্তি থাকে না তার। তবু ফোন কেটে দেয়। লীনার মুহুর্মুহু ফোনে আবারও ফোন ধ'রে ঝাঁঝ হজম করে। সকালের ঝাঁঝ দুপুরে, দুপুরের ঝাঁঝ বিকালে তরল হয়ে মধুকুণ্ড হয়ে যায়। দেখে মনে হবে যেন কোনোদিন ঝগড়া হতেই পারে না তাদের। আর যাই হোক লীনার মতো তাকে কেউ ভালবাসতে পারবে না এটা জানে আকাশ।

তীব্র তীক্ষ্ণ গলা মারমার করে উঠলো ওপার থেকে—ফোন কেটে দিলে যে? র‍্যাপিডোর ড্রাইভার কী তোমার ভাই না দাদা? এতো দরদ কীসের? তুমি এই দুনিয়ায় আসলে অচল। এই কারণেই তোমাকে কেউ পাত্তা দেয় না। নেহাৎ আমার জন্যে বর্তে গেছো। কতবার বলেছি টিউশন ছেড়ে একটা মান্থলি ইনকামের চাকরি করো। মুরোদ আছে নাকি তোমার? সুখের প্রাইভেট টিউশন। সময়ে খাওয়া ঘুম। লেকচার দেওয়ার ডিপো।

লীনার এসব কথা গায়ে মাখে না আকাশ। জানে, এগুলো তার মনের কথা নয়, রাগের কথা। তার কথা গায়ে না মেখে অতি ধীর শান্ত গলায় লীনাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি শুধু জানতে চাই তুমি যা করেছো, ঠিক করেছো?

হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক করেছি। সুবিধার জন্যে আবারও করবো। এর আগেও করেছি।--সুর চড়িয়ে জানালো লীনা।

এর আগেও করেছো! আমি জানি না তো।

হ্যাঁ, মিস্টার সাধু। তবে দুজনে একসঙ্গে হাজির হয়নি। বুঝলেন? একজন আসার পর অন্যজনকে ক্যানসেল করেছি। এবং এমনটাই করবো। আপনার আদর্শ আপনার কাছে রাখুন, কেমন!

হ্যাঁ, সেটাই রাখবো। এটাই তোমার সঙ্গে আমার শেষ কথা। তোমায় আমায় মিলবে না। মেলাতেও চাই না। অনেক ঝগড়া অশান্তি হয়েছে, কখনো মনে হয়নি তোমাকে ত্যাগ করা যায়। ত্যাগ করে বাঁচতে পারবো না ভেবেছিলাম।

আরে করো ত্যাগ। কে বারণ করেছে!

হ্যাঁ, সেটাই করবো।

র‍্যাপিডোর লোকটার জন্যে আমাকে ত্যাগ করবে, তাই তো? করো করো। এখনই করো... এখনই করো।

কারণ সেটা নয় লীনা!

তবে কী কারণ! শুনি শুনি। অন্য কোনো পাখি ছুটেছে, তাই তো?

কারণ তোমার নীচতা। এই নীচ মানসিকতা সংসার জীবনে ধ্বংসাত্মক। ধীর স্থির শান্ত সংযত গলায় জানায় আকাশ।

আমি ধ্বংসাত্মক! আমি নীচ! বেশ বেশ। গঠন করো। গঠন করো। অনেক ঠিকা নেওয়া আছে তোমার।

ফট করে ফোনটা কেটে দেয় লীনা। সুইচ অফ করে দেয় আকাশকে শায়েস্তা করতে। রাতে অন করে দেখে মিসকল এলার্ট আছে কিনা। না। আকাশের কোনো মিসকল এলার্ট নেই। উতলা হয়। হোয়াটস অ্যাপেও নেই কোনো বার্তা। অবাক হয়ে দেখে আকাশ তাকে ব্লক করেছে। বহুকিছু ঘটে গেলেও কোনোদিন ব্লক করেনি। সিঁদুরে মেঘ দেখতে থাকে লীনা। আকাশকে সে ভালোমতো চেনে। আকাশের ফোন নাম্বারে ফোন করে দেখে সুইচ অফ।

আজ দুবছর হয়ে গেল আকাশকে ফোনে ধরতে পারেনি লীনা। যতবারই ফোন করেছে, সুইচ অফ। আকাশ ফিরে গেছে তার গ্রামে। সেখানে টিউশনের তেমন সম্ভবনা নেই। তার গ্রাম আসানসোল নয় যে টিউশন করে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সহজেই মিলতে পারে। জানে লীনা। জানে বলেই আকাশের জন্যে মনটা আরো ডুকরে কেঁদে ওঠে।

তার গ্রামে লীনার যাওয়ার কথা হয়েছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু কোনোদিন ভাবেনি ঠিকানাটা নিয়ে রাখার কথা। আসলে এতো সেঁটে সেঁটে থেকেছে দুজনে, নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি কখনো। একমাত্র উপায় ছিল মেস মালিক। মেস মালিক তার পরিচিত। আকাশকে সে-ই মেসটি ঠিক করে দিয়েছিল। সেই মালিকের কাছেও অনেকবার খবর নিয়েছে। মেলেনি। বারবার ভাঙা মন নিয়ে ফিরে এসেছে।

এই দু'বছরে কল্পনায় কতবার ভেবেছে লীনা আকাশকে একটিবার পেলে সে তার ভুল স্বীকার করে নেবে। আকাশ যাতে খুশি থাকে তা-ই করবে। আর অভিমান করে বুকে মাথা রেখে বলবে "সেদিনে রাগের মাথায় যা বলেছি সেটা সত্য ধরে তুমি আমাকে বিচার করে নিলে! এতদিনের সম্পর্ক। তুমি কি আমাকে চেনো না! সত্যিই কি আমি ধ্বংসাত্মক? সত্যিই কি আমি নীচ? একটা সামান্য ঘটনাই কী তোমার কাছে বড় হয়ে গেলো! আমি কী তোমার কথা বুঝতাম না, বলো! বুঝিয়ে বললে কি বুঝতাম না? কী করে পারলে তুমি, এতগুলো দিন ফোন সুইচ অফ রাখতে। কষ্ট হয়নি তোমার!" ভাবতে ভাবতে প্রতিবারই দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে লীনার। বুকের ভিতরটা উথাল-পাথাল করে ওঠে। শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।

লীনা এখনো বিশ্বাস করে না আকাশ তার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। বিশ্বাস হয় না। হয় না। হতে চায় না। সে এখনো ভাবতে পারে না আকাশ তাকে ছাড়া থাকতে পারবে। কোনোদিন হয়তো ফিরে আসবে। কোনোদিন হয়তো দেখবে তার ফোন সুইচ অফ নেই। এই বিশ্বাসেই সে ফিরিয়ে দিয়েছে একের পর এক সম্বন্ধ।

মোহনা

সন্ধ্যা দাস

'ম্যাডাম, কার রেডি'?

'ও কে, আই অ্যাম কামিং'— রূপাঞ্জনা উত্তর দিল। আজ ওকে একবার সাইটে যেতে হবে প্রোজেক্টের কাজে। পথেই পড়বে তাঞ্জাভুর এর বিখ্যাত বৃহদেশ্বর মন্দির। ড্রাইভারই ওকে বলেছিলো, 'ম্যাডাম আমাদের মন্দিরটা একদিন দেখুন'। ছেলেটি খুব সরল। ও আজ যাবে বলেছে সাইটে।

রূপাঞ্জনা নেমে এলো। নীল জিন্সের ওপর সাদা শার্ট। বব চুল। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। সানগ্লাস চোখে। কে বলবে এ সেই রূপাঞ্জনা ! কলেজে ওড়না যার সেফটিপিন দিয়ে ঠিকঠাক আটকানো থাকতো। যেন কোনোভাবেই এধার ওধার না হয়।

ও এখন কাবেরী রিভার প্রোজেক্টের চিফ অফিসার। নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা ওদের কাজ। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা পৌঁছে গেল মন্দিরে। সকালের ঠান্ডা আমেজ। এখনও তেমনভাবে ভিড় নেই। দু'চারজন মহিলা এসেছে। মাথায় লম্বা চুলের বেণী। তার উপর সাদা আর কমলা রঙের ফুলের মালা প্রত্যেকের। ওদের এই ফুল লাগানো কালচারটা খুব ভালোবাসে ও। কলেজ-ট্যুরে যখন ওরা সাউথ ইন্ডিয়া এসেছিলো তখন প্রতিদিনই ও এভাবে ফুল লাগাতো। ওরও তখন লম্বা চুল। মাঝে মাঝে শাড়িও পরতো। অলক পছন্দ করতো। বলতো 'কালো রাধে।'

মন্দিরের চওড়া সিঁড়িতে বসে পুরোনো দিনগুলো মনে পড়ছিলো রূপাঞ্জনার।

নদী নিয়ে ছোটোবেলা থেকে রূপাঞ্জনা অনেক গল্প শুনেছে। কেননা তার দাদু ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টে চাকরি করত। অনেক নদীর নাম ও জেনেছে। ওরও খুব ইচ্ছা হতো সরকারি লঞ্চে একেবারে নদীর মোহনায় যেতে। জানতে ইচ্ছে করতো নদী কিভাবে সাগরে মেশে।

স্কুলে পড়তো যখন একবার ক্লাসে ওর বান্ধবী অনুস্কাকে বলেছিল, 'আমি আজকাল একটা স্বপ্ন প্রায় দেখি, নদীতে স্নান করতে নেমেছি, অথচ জল পাচ্ছি না। জল নেই নদীতে।'

অনুস্কা হেসেছিল খুব— 'তাই আবার হয় নাকি। তুই ক্ষেপি।'

এ গল্প বলা প্রায় বাইশ বছর হয়ে গেল। কর্ণাটকী রাগ বাজছে মন্দিরে। ঠিক দেবতা আবেগ নয়, ও এসেছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে দেখতে। তবুও এ সুর চিরে চিরে যাচ্ছে রূপাঞ্জনাকে। মনে পড়ছে প্রথম যৌবনের একটা নিতান্ত সাদামাটা কথা।

কলেজ থেকে ফিরতে গিয়ে এক বর্ষায় ধর্মতলায় বাস থেকে নেমে দেখেছিলো সারা কলকাতা জলডুবি। কচ্ছপের পিঠের মতো জেগে আছে শুধু এসপ্লানেড চত্বর। ও জল ঠেলে হেঁটে আসছিলো পাম অ্যাভিনিউতে, ওদের বাড়ি।

ফিরছে খড়্গপুর আই আই টি থেকে। আই আই টি-তে চান্স পেয়ে ও বেছে নিয়েছে রিভার ইঞ্জিনিয়ারিং। ভবানীপুরের কাছে জলের লেভেল অনেক বেশি। মজা করে ফোন করল অলককে। অলক ওর জীবনের স্পেশাল পার্সন। ওই ট্যুরে গিয়েই সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল। রূপাঞ্জনা বললো, 'অলক শোন্, আমি ভেসে যাচ্ছি তোর অজয় নদীর বানে।'

ওপার থেকে উত্তর এলো—'আমি তো কবে ভেসে মোহনায় অপেক্ষা করছি।'

বীরভূমের ছেলে অলক ব্যানার্জী। সেমিস্টারে আর ক্লাসের চাপে দেখা বেশি হতো না। কিন্তু ফোনে যোগাযোগ হতো। সিভিল ডিপার্টমেন্টে ছিল অলক। ওর ঐ আশ্বাস সেদিন রূপাঞ্জনাকে জল ঠেলতে অনেক শক্তি দিয়েছিলো।

সময়টা কিসের আবর্তনে দ্রুত যেন বদলে গেল। লাস্ট সেমিস্টারের আগেই সার্টেন এ্যাটাকে বাবাকে হারালো। দোমড়ানো মোচড়ানো জীবনটাকে দাঁড় করিয়েছে ঋজুতায় রূপাঞ্জনা নিজের চেষ্টায়। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রিভার ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে। প্রথম পোস্টিং ছিল দিল্লীতে। যমুনা নদীর ডেভেলপমেন্টের কাজে। ওর কালো রাধা নামটাই সার্থক।

অলক জার্মানি চলে গেছে। রিসার্চ করতে। রূপাঞ্জনা ইন্ডিয়া ছাড়েনি। মা আছে কলকাতায়। বাবার স্মৃতি ছেড়ে আসেনি। ওর এখন পোস্টিং এই তাঞ্জিভোরে।

কাবেরী ডেল্টায় কাজ ওদের। তাঞ্জিভোরে সরকারি ফ্লাটে থাকে। কাজটা সেই ছোটবেলার স্বপ্নের কাজ। কাবেরীর জল শুকিয়ে যাচ্ছে। গ্রাউন্ড ওয়াটার অ্যানালিসিস।

রূপাঞ্জনাদের কাজের সাইট কাবেরী নদীর মোহনায়। ওর কষ্ট হয় নদীগুলো কেমন শুকিয়ে আসছে দেখে। তবে কি ওর স্বপ্নটা মিলে যাবে! কিন্তু ওর যে বড়ো সাধ সেই মোহনায় নিয়ে যাওয়া নদীকে.... ওকে পারতেই হবে।

দু'বছর হলো এখানে। দক্ষিণের তিনটে বড়ো নদীরই জল কমছে।

কাজও চলছে জোর কদমে। নদীর বেসটাকে গভীর করাতে হবে। বন্যা কমাতে হবে চ্যানেলাইজেশানের মাধ্যমে।

এবার ওর ট্রান্সফার অর্ডার এসেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল। মায়ের কাছে থাকতে পারবে। ও জানে ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর অনেক নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গা প্রোজেক্টে কাজ ওর। রূপাঞ্জনা অনেককাল আগের সে অজয় নদীর স্বপ্নটা ভোলেনি। যদিও অলক যোগাযোগ রাখেনি।

কর্ণাটকী রাগটা বেজেই চলেছে। আজ বহুদিন পরে মনটাও যেন কেমন হু হু করছে।

রূপাঞ্জনা ভাবছে ও কোনো মেয়ের নদীভাসা সাধ মুছতে দেবে না। সব নদীতেই জল চাই, যাতে সব মেয়েরা স্বপ্ন দেখতে পারে মোহনায় যাওয়ার। আর মোহনায় যেন কেউ থাকে।

একটা কল এলো। রূপাঞ্জনা ফোনটা ধরলো।

তার প্রোজেক্টের যিনি সেকেন্ড অফিসার সন্দীপ মেহেতার গলা।

'ম্যাডাম, আসুন আমি অপেক্ষা করছি।' ও জানে এই ছেলেটি কিছু বলতে চায়।

একঝলক ঠান্ডা হাওয়ায় সাথে মোহনার ডাক কানে আসলো রূপাঞ্জনার।

একটি পুস্তক সমালোচনা

'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' : সোনার জলে আঁকা জল-জঙ্গলের জীবন

উজ্জ্বল প্রামাণিক

Title : 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা'

Auther : নলিনী বেরা

ISBN : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৮, কলকাতা-৭৩

Price : ৩০০ টাকা

Size of Binding : ডবল ডিমাই, বোর্ড বাইন্ডিং ফোল্ডার বই , পৃষ্ঠা-২৮০, ২১ ফর্মার বই

Cover desing : দেবাশিস সাহা

উপন্যাসটির শিরোনাম সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা। কারণ নদীর নামটি যে সুবর্ণরেখা। ঐতিহ্যবাহী হিমালয়ের কোনও তুষারশৃঙ্গের আশীর্বাদ বহন করে না সে। প্রত্যন্ত ছোটনাগপুর মালভূমির আঁকেবাঁকে যার জন্ম। মাত্র চারটি রাজ্য—বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশার গা বেয়ে যার স্রোতধারা। তার চলমান প্রবাহস্রোতের দুপারে কত মানুষজন, কত জনপদ, ফুল-ফল-পাখপাখালি-জন্তু জানোয়ার। নদীর বুকে হীরা, জহরত, স্বর্ণরেণু হয়তো নেই কিন্তু তার দুপাশে যে মানুষজন, তাদের বিচিত্র সংস্কৃতি তা সত্যিকারের সোনার জলে আঁকা। সুবর্ণরেখা আসলে বহুসংস্কৃতির সুবর্ণরেণুর ধারায় পুষ্ট। হাফ ওড়িয়া, হাফ বাংলার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা বিচিত্রভূমির কথা বলা হয়েছে এখানে। উপন্যাসের ছোট্ট নায়ক নলিন গ্রামের মাঝি হংসী নাউড়িয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিল- 'মাথায় জল ছিটিয়ে ওঁ গঙ্গা ওঁ গঙ্গা বললেন। ওঁ সুবর্ণরেখা তো বললেন না'। পড়াশুনা না জানা মাঝি সেদিন সগর্বে বলেছিল- 'সবু নদী গঙ্গা, সবু নদীর জল গঙ্গাজল'। অর্থাৎ সুবর্ণরেখা নদী গঙ্গার মতোই পূণ্যতোয়া, পবিত্র। এই স্থিরবিশ্বাসের কাছে মাথা নত করতে হয় লেখক সহ সমগ্র পাঠককে। সুবর্ণরেখার আশীর্বাদধন্য বিস্তৃত জনপদ অনাদিকাল থেকে এগিয়ে চলেছে। সুবর্ণরেখা তীরবর্তী বাঁছুর খোয়াড় গ্রামের এক পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আশ্চর্য আখ্যান শুনিয়েছেন লেখক নলিনী বেরা, নদীছন্দিত উপন্যাস 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখায়'।

প্রস্তাবনা বা ভূমিকা : গ্রন্থটির মুখবন্ধে আনন্দ পুরস্কারের সাম্মানিক ভাষণে নলিনী বেরা এতটাই অকপট এবং এতই ঋজু, সরল এবং অকৃতঘ্ন, যে তার সাহিত্যকৃতির উৎস-সন্ধানে ঋণ স্বীকারের তালিকায় **P. K. Dey Sarkar** এর ইংরেজি গ্রামারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন গ্রামের পটভূমিকায় 'বাৎস্যায়নের কামসূত্র' বা 'জীবন যৌবনে'র কথা। অন্ত্যজ, অপাংক্তেয় ও 'সাব-অলটার্ন' মানুষদের তিনি এ উপন্যাসে উৎসর্গ করেছেন। তিনি সগর্বে ঘোষণা করেন—

"এই পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে আমারই চর্চিত সেই সমস্ত অন্ত্যজ, অপাঙক্তেয় ও

তথাকথিত "সাবলর্টান" মানুষদেরই যেন জয়যুক্ত করা হল।...এই জয় আমার নয়, এ জয় তাদেরই।"

সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন সাঁওতাল দিদির কথা- যা মর্মগ্রাহী ও হৃদয়স্পর্শী।

উপন্যাসটির শ্রেণিবিচার : উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে মনে হয় লেখকতো নিজের কথায় বলছেন। একটা আত্মজৈবনিক গন্ধ তো পাই যখন উপন্যাসের নলিন বলে- 'মনে মনে কত কী হতে চেয়েছিলাম মেজো কাকার মতো কোবরেজ, নাটুয়াদলে নবীনের মতো; নাচুয়া শেষমেশ কি না নদীনালায় খালে মাছ মারা? মাছধরা? এরপরেও উপন্যাসটিকে শুধুই আত্মজৈবনিক তকমা দেওয়া যায় না। ঔপন্যাসিক নতুন কথা বলেছেন। পরিচিত জীবনের বাইরে প্রান্তিক মানুষের আলোকিত অধ্যায় রচনা করতে পেরেছেন। নদীকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস নেহাতই কম নয়- ইচ্ছামতী (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়), পদ্মানদীর মাঝি (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়), হাঁসুলি বাঁকের উপকথা (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়), তিতাস একটি নদীর নাম (অদ্বৈত মল্লবর্মন), তিস্তা পারের বৃত্তান্ত (দেবেশ রায়)। এদের পাশে 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। উপন্যাসের ধারায় এ এক নতুনতর সংযোজন, একটি নির্দিষ্ট এলাকার মাটি সম্পৃক্ত মানুষের জীবনভাষ্য। তাদের সংস্কার-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-চেতনা, পালা-পার্বণ, কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক জীবন সবই চিত্রিত হয়েছে নিটোল ভাবে।

পুরাণ ইতিহাসের মেলবন্ধন- সুবর্ণরেখা শুধু আজকের নদী নয়, মহাভারতের কালের কথা বহন করে চলেছে আজও। যুধিষ্ঠির পিতৃ উদ্দেশ্যে তর্পণ করেছিলেন বলে এখনও বাংলা-বিহার-ওড়িশার মানুষ নদীজলে তর্পন করে 'বালিজাত উৎসব' পালন করে। সুবর্ণরেখার বুকে পুরাণের ঘটনা সংঘটিত আর সুবর্ণরেখার পারের মানুষ পুরাণবেত্তা হবে না তা কখনও হয়! উপন্যাসে 'কোদপাল', বৈশাখীপাল' রচনা করতে গিয়ে লেখক বারবার পুরাণপ্রসঙ্গ এনেছেন। ঐতিহাসিক কাহিনিকেও লেখক সুবর্ণরেখার ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। ঝাড়খণ্ডের এই প্রান্তসীমায় রাজত্ব করে গেছে মহাভারতের জরাসন্ধ, মগধের উগ্রসেন, সম্রাট অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, শেরশাহের মতো রাজারা। ইরেজ আমলেও এখানে লাটের পর লাট নীল বোনা হত। এইসব কারণেই হয়ত 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসটি পুরাণ ও ইতিহাসের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসটির বিষয়, বিন্যাস আঠাশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত পত্র উপন্যাসের কথক একজন কিশোর। অনেক্ষেত্রে উত্তমপুরুষের কথনে উপন্যাসটি এগিয়ে চলেছে। দীর্ঘ অংশ জুড়ে ললিন নিজের কথায় বলেন- মেজোকাকার মতো সেও একজন নামজাদা কবরেজ হতে চায়। মেজকাকা তাকে সাপের বিষঝাড়ার দু'চারটে মন্ত্র, ওষধিও শেখায়। তল্লাটের নামকরা নাচুয়া অনন্ত দত্তও চেয়েছিল তাকে যাত্রা দলে নিতে। বাছুরখোঁয়ার গ্রামের এই ছোট্ট নলিনীর নানান সখ মনে জেগে উঠত। বাড়ির মেজকাকা কবিরাজ বলে নিজেকে জাহির করত। সেই থেকে লেখক নলিনী বেরা ও কবিরাজ হওয়ার শখ হয়েছিল প্রবল। তাদের ঘরের গরু, মোষ চরাত ভজু আর ডিবরা সাঁওতাল। তার বাবা বালকা সাঁওতাল নাকি এলকার মস্ত বড় গুনিন। সে ভূতেদের বশ

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XVI

করে রাখে। তাদের দিয়ে নানা কাজ করায়। সেই থেকে লেখকেরও খুব ইচ্ছা ভূত পুষবে। কিন্তু এর জন্য বালকার মতো নামকরা গুনিন হতে হবে। সেই থেকে নলিনী ভজু আর ডিবরা সাঁওতালের সঙ্গে মাঝে মাঝেই তাদের বাড়ি চলে যেতেন। বালকাকে গিয়ে বলতেন এইসব তুক তাক শিখিয়ে দেওয়ার জন্য। লেখক সেই সব ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন

'... বালকার কাছে হাজির হয়ে হাতে-পায়ে ধরে বললাম, "অন্তত চিড়িকিনীকে ঘরে আনার মন্তরটা শিখিয়ে পড়িয়ে দাও গুণিন!"

বালকাগুণিন মিটি মিটি হাসে, মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, "নিতঃ দ ইস্কুল চালাও মে! এখন তো স্কুলে যা! পড়াশুনা কোর!"

'তা তো করছি, তব'

'তোর নিষ্ঠা আছে, লেগে থাকলে হবে।'

জানতে চাই, 'অই যে বউটা —চিড়িকিনি ভূত কী করে ধরলে?'

বালকা হাসে।

—'খুব কঠিন কাজ!'

'তবু আমি শিখব।'

ফের হাসে বালকা।

বেশি ধরাধরি করলে কেবলই দিন ফেলে।

'আজ নয়, কাল'৩

এরপর আরও কতবার বালকার কাছে গিয়েছেন কিন্তু বালকা সাঁওতাল গুনিন হওয়ার মন্ত্রখানি শেখায়নি। আর লেখকেরও গুনিন হওয়া হয়ে উঠেনি।

কিশোরকে যেতে হয়েছিল 'রুক্মিণী দেবী রোহিনী দেবী চৌধুরানী' স্কুলে। তার স্কুল জীবনের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের কাহিনির বিস্তার। এরপর রোহিনী স্কুল থেকে কিশোরের জীবনকথা এগিয়ে চলে সুবর্ণরেখার তীর ঘেঁষে।

নদী, মানুষের কথা 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' একটি নির্দিষ্ট এলাকার মাটি সংপৃক্ত মানুষের জীবনভাষ্য। এদের সংস্কার—সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-চেতনা, পালা-পার্বণ, কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক জীবন সবই চিত্রিত নিটোল ভাবে। এখানে সুবর্ণরেখা নদী, ললিন ও তার চারিপাশ কোনো অপ্রধান চরিত্র, ঐতিহাসিক-পৌরাণিক কিংবা একালের কোনো সদুর প্রসারী ঘটনা প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, লক্ষ্য নয় সকলেই উপলক্ষ্য মাত্র। বিন্দু বিন্দু বারি যেমন সিন্ধুকে গড়ে তোলে তেমনি কতকগুলি ঘটনা বহমান সুবর্ণরেখাকে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করে। উপন্যাসটি আদতে একটি আঞ্চলিক উপন্যাস বলেই মনে হয়। কিন্তু তার শিল্পমূল্য আঞ্চলিকতার সীমানা ছাড়িয়ে পাঠকের রসবোধে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে।

বিচিত্র জীবনানুসন্ধান উপন্যাসটি লেখকের গবেষণামূলক রচনা এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। উপন্যাসটি লেখার আগে তিনি বিহার-ওড়িশার অজানা ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। হংসী নাউড়ীয়া, সন্তোষ দাস, প্রজ্ঞা, সত্যরঞ্জন, গুনিন বালকা এরা কেউ কল্পনার রাজ্যের

বাসিন্দা নয়, প্রত্যেকটি চরিত্রই লেখকের জীবনসম্পৃক্ত, বাস্তব চরিত্র। লেখক বারবার ছুটে গেছেন বিচিত্র মানুষের সন্ধানে। তাদের বহুবিচিত্র জীবন যাপনকে পাঠকের সামনে সমহিমায় আলোকিত করে তুলেছেন। সৃষ্টিধরের মতো মানুষেরা যখন সুনিপুণ হাতে বাঁশের ছিলকায় পাঠা ছাগলের অণ্ডকোষ কেটে নরম মাংসপিণ্ড বার করে পাঠাকে খাসিতে পরিণত করে তখন মনে হয় জীবনের কত বিচিত্র রঙ।

লেখক চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন তাদের মুখের ভাষার অবিকল ব্যবহারে। সে ভাষা কখনও বাংলা -কখনও হিন্দি- কখনও বহড়াগোড়িয়ে- কখনও ন্যাঙটা-ভুটুঙদের হাটুয়া ভাষা। বিবাহসূত্রে নদী এপারের মানুষ ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলাতে বৈবাহিক সম্পর্কের আদানপ্রদান ফলে উৎকল প্রদেশীয় ভাষাকেও আপন করে নিয়েছেন। উপন্যাসের মধ্যে সে ভাষার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, লেখক আবেগে নাউড়ীয়ার নৌকাকে জলে ঠেলে নামাতে গেলে নাউড়ীয়া বলেছে- "করো কী, করো কী বেহেরার পো, এ কী তুমার তালডোঙা যে কাঁধে করি বহিনেও ঘাড়ে মুড়ে লাগবে নি?" হারিয়ে যাওয়া দিনের স্মৃতিচারণে হংসীকে বলতে শুনি 'অখন ত বাটা-খয়রা, আখু তঙু কুদ মারি উঠয়ায় অই সুবর্ণরেখায়'। সাপের কামড় থেকে বাঁচতে নলিন মেজোকাকার কাছে মন্ত্র শিখেছে "ইন্দুর ইন্দুর সাপ। জলের কুমির বনের বাঘ। হাঁস খাস মোকো। দেবী দুর্গার দোহাই তোকো"।

চালচুরির ঘটনাটি লোমহর্ষক, রোমাঞ্চকর। নলিন সেবার স্কুলের হোস্টেলের মনিটর সে মাসেই শুরু হল ভাঁড়ার ঘরের চালচুরি। হোস্টেল সুপার সুধীর বাবুর নজরে এল ছাত্রদের আনা চাল যা সারা মাসের হোস্টেল চালানোর সম্বল তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। মনিটর হিসাবে পাঁচ সেলে টর্চের অধিকারী নলিন, তেমনি চাল চুরির বিহিতের দায়িত্বও তার। এদিকে হোস্টেলের রাঁধুনি টুনি ঠাকুরের প্রতি রাখি পূর্ণিমায় অনার্য সন্তানদের উপবীত দান করে মাত্র পাঁচ টাকায়। চলতে থাকে টুডু-হাঁসদা-সোরেন-বেরা-মাইতি-মাহাতোদের ব্রাহ্মণ হবার ছেলেখেলা। নলিন ধার বাকিতে পৈতা নিয়েছে। জাতে উঠে অনাস্বাদিত গর্ব বোধ করেছে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তাড়াহুড়োয় বস্তা বাঁধার দড়ি না পেয়ে দেড়া পৈতা দিয়ে রাস্তার মুখ বেঁধে। অভাবের তাড়নায় সেদিন তার ব্রাহ্মণত্ব টুকু নষ্ট হয়ে যায়; "...ছেঁড়া পৈতেটি চালের বস্তার মুখ অটুট অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বুঝতে আর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না অন্ধকার ভাঁড়ারঘরে তাড়াহুড়োয় বাঁধবার দড়ি না পেয়ে গলার পৈতে ছিঁড়েই বস্তার মুখে বেঁধেছেন টুনি ঠাকুর!"৭ কী নিদারুণ দারিদ্রের প্রতিচ্ছবি। উচ্চবর্ণ জাতির গৌরব এভাবেই ধুলায় মলিন হয়ে যায় ক্ষুধার যাতনায়। এসব লেখকের জীবনের সঙ্গে ভীষণভাবে মিশে আছে। অসহায়তায় কাছে ক্ষুধা, দরিদ্রের কাছে জাত-পাত ধর্ম-ধর্মী সবই মূল্যহীন। ব্রাত্যজনের কাছে ক্ষুধা নিবারণ হয়ে ওঠে একমাত্র মানবধর্ম।

তথাকথিত উপন্যাসের ধ্যান-ধারণাকে লেখক পাল্টে দিয়েছেন। উপন্যাসের মতো করে এ উপন্যাস তিনি লিখেননি। নির্দিষ্ট গল্পের কোনো থিম নেই। ছোটো বড়ো নানা টুকরো কাহিনি বা কোলাজকে সাজিয়ে তুলেছেন তিনি। সাঁওতাল দিদির গল্প, রোহিণী স্কুল, হোস্টেলের নানা

ঘটনা, বাড়িতে কালপ্যাঁচা এসে বসা, ছোটপিসিমার মস্তিষ্কবিকৃতি ও নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া, বৈশাখী পালের চর সংক্রান্ত ইতিবৃত্ত, বড়দা শ্রীকান্তের বিবাহ এসব টুকরো ছবি দিয়ে তৈরি হয়েছে উপস্যাসের ক্যানভাস।

উপন্যাসের শেষটা বড়ো অদ্ভুত। চিরকালীন মহাজীবনের কথা শোনানোর কোনো দায়িত্বই লেখক 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখায়' রাখলেন না। নলিনীধর জীবনের একঝলক চিত্রে আমরা মোহিত হয়ে রইলাম। সরলার সদ্যজাত যে কবে বড়ো হয়ে উঠল তার কথা ভাববার অবকাশই পেলাম না। তবু উপন্যাসটি শেষপর্যন্ত অন্য এক ভারতবর্ষের সন্ধান দিয়ে যায়। শত অন্ধকারেও কিছুটা আলোর রোশনাই ছিটিয়ে দিয়ে যায়।

মুদ্রণ/ আক্ষর বিন্যাস : সম্ভবত ১২/১৩ সাইজের ফন্টে অক্ষর বিন্যাসের কাজ সম্পাদিত হয়েছে। মুদ্রণ বেশ ঝকঝকে, আকর্ষণীয়। কাগজের মানও যথেষ্ট ভালো।

নির্ঘণ্ট বা index : নেই। শব্দবন্ধের দিকটি মাথায় রেখে পরিভাষার তালিকা তৈরি করা আছে। কিছু আঞ্চলিক শব্দের অর্থ তালিকা বইয়ের শেষ অংশে যুক্ত করা হয়েছে।

প্রচ্ছদ : বইয়ের কভার বা প্রচ্ছদ ভীষণ অর্থবহ। লেখক নলিনী বেরা 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসের ভাবনাকে নতুন ভাবনায় বিস্তারিত করা হয়েছে। সমস্ত পুস্তক রচনায় লেখক নিজস্ব ঘরনার গ্রন্থনা করেছেন। যেহেতু মৌলিক রচনা তাই কোথাও কোন গ্রন্থপঞ্জি বা Bibligraphical detiels দেননি। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় যে সমস্ত উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছে তার উৎস তিনি লিখেছেন। কিছু আদিবাসী শব্দ যা পাঠকের আজানাই থেকেছে।